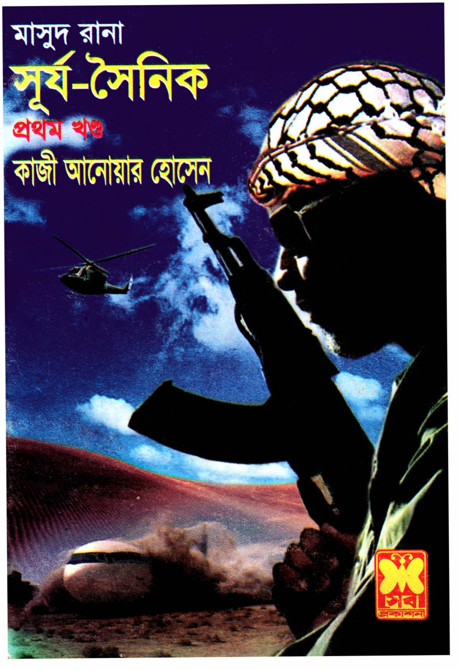
মাসুদ রানা
সূর্য-সৈনিক
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪১৯

সূর্য-সৈনিক

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

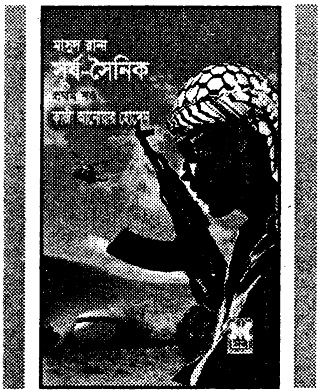

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7419-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২
রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-419
SHURJASHAINIK-
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

সাতষট্টি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ঘিরেছে বারবারি উপকূলের রাজধানী ত্রিপোলিকে। বহু দূর থেকে চোখে পড়ছে দুর্গ-শহর। দেখলে মনে হয় ওখানে বাস করে রূপকথার কোনও দুষ্ট জাদুকর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাথরের বাড়ি, তীরের কাছে বাশাওয়ের প্রকাণ্ড কেল্লা। আশপাশে কোথাও গাছপালা নেই বললেই চলে।

আঠারো শ' তিন সাল। মার্চের প্রথম সপ্তাহ। ত্রিপোলি উপসাগর। বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে দুটি মার্কিন রণতরী।

আমেরিকার স্কোয়াড্রন মাত্র কয়েক শ' গজ যেতে না যেতেই আচমকা শুরু হলো প্রবল সামুদ্রিক ঝড়। মাথার উপর নড়ে উঠল ঘন কালো মেঘ, শুরু হলো একের পর এক বজ্রপাত। চমকে উঠে আঁকাবাঁকা হলুদ রেখায় আকাশ চিরে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে যাচ্ছে সাগরের বুকে। প্রচণ্ড হাওয়া লাগতেই টলমল করে উঠল জাহাজ দুটো, তারপর ছুটল ভীতা হরিণীর মত। কেচ 'অ্যাডভেঞ্চার' ও তার চেয়ে বড় ব্রিগ 'সিগনাল' ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল তীর থেকে অনেক দূরে।

রণতরী সিগনালের ডেকে স্পাইগ্লাসের ভিতর দিয়ে চারপাশ দেখছে লেফটেন্যান্ট জেফ মার্টেল। সিগনালের ফার্স্ট অফিসার সে। বহু দূরে একপলক দেখল ত্রিপোলি বন্দরের কাছে বিশাল মাস্তুল নিয়ে আটকে আছে রণতরী ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া।

এদিকের সাগরে ভয়ানক দাপট আরব জলদস্যুদের.

তারপরও আমেরিকা থেকে দুই রণতরী এসেছে শুধু ওই আটকে পড়া ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার কারণে।

সাত মাস আগে বারবারির এক দস্যু-তরীকে কোণঠাসা করে ফ্রিগেট ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া, কিন্তু নিজেই ফেঁসে যায় ত্রিপোলির কুখ্যাত বন্দরের অগভীর পানিতে। সে সময় জাহাজ রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন ফ্রিগেটের ক্যাপ্টেন, চার্লস হ্যানলি। সাগরে ফেলে দেন পঞ্চাশটা কামান। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, ওজন কমিয়েও ভেসে উঠতে পারেনি ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। জোয়ার আসতে তখনও অনেক দেরি। বারোটা দস্যু গানবোট চারদিক থেকে ঘিরে গোলাবর্ষণ শুরু করে রণতরীর উপর। শেষে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন হ্যানলি। তাঁকে এবং তাঁর সৈনিকদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় বাশাওয়ের রাজ দরবারে। সেই সময়ে ওই শহরে ছিলেন এক ডাচ কনসাল, পরে তাঁর কাছ থেকে জানা গেছে: ক্যাপ্টেন হ্যানলি ও তাঁর পদস্থ অফিসারদের যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। তবে সাধারণ নাবিক ও সৈনিকদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হবে বারবারির জলদস্যুদের কাছে।

এরপর ভূমধ্যসাগরে আমেরিকান ফ্লিট কমাণ্ডাররা অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে নতুন করে দখল করা অসম্ভব। আর দখল করতে পারলেও, ওটা নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় ত্রিপোলির বন্দর থেকে—কাজেই পুড়িয়ে দেয়া হবে জাহাজটাকে। এদিকে কয়েক হাত ঘুরে এল তথ্য: ত্রিপোলি রাজ্যের শাসক বাশাও আমেরিকানদের ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেজন্য তাঁকে উপহার দিতে হবে নগদ পাঁচ লক্ষ ডলার।

শত শত বছর ধরে বারবারি উপকূলের দুঃসাহসী জলদস্যুরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হামলা করে আসছে, জাহাজ নিয়ে চলে

যাচ্ছে সুদূর উত্তরে আয়ারল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে। শহরের পর শহর লুঠ করছে, ওসব দেশ থেকে ধরে আনছে লাখ লাখ মানুষকে। তাদের অনেকে হয়েছে জাহাজের গ্যালির ক্রীতদাস। অন্যদেরকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে উত্তর-আফ্রিকার বাজারে। সুন্দরী, সাদা মেয়েদের স্থান হয়েছে ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদের হারেমে। ধনী বন্দির আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুরা মুক্তিপণ দিলে দেশে ফিরবার সুযোগ পেয়েছে তারা। তবে ক্রীতদাস হিসাবে বাকি জীবন থাকতে হয়েছে সাধারণ মানুষদের, অমানুষিক পরিশ্রম করে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়েছে বিনা চিকিৎসায়।

ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের রয়েছে শক্তিশালী নেভি, তারপরও বাণিজ্য-তরীগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে অস্বাভাবিক হারে নিয়মিত চাঁদা দিতে হচ্ছে তাদেরকে। তাঞ্জিয়ার, তিউনিস এবং ত্রিপোলির প্রধান শাসক বারবারি উপকূলের এই তিন নগর-কর্তা তুলছে এ চাঁদা।

তখন মাত্র ইংল্যাণ্ড থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে শিশু রাষ্ট্র ইউনাইটেড স্টেট্‌স্, প্রাক্তন শাসকের ইউনিয়ন জ্যাকের নীচ থেকে সরে গেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা দেখল দেশের আয়করের দশ ভাগের এক ভাগ তুলে দিতে হচ্ছে জলদস্যুদের হাতে, নইলে লুঠ হচ্ছে জাহাজ। এভাবে চলল বেশ কিছুদিন, তারপর হঠাৎ সব বদলাতে লাগল। তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন টমাস জেফারসন, তিনি ঘোষণা দিলেনঃ এরপর থেকে জলদস্যুদের একটা পয়সাও চাঁদা দেবে না ইউনাইটেড স্টেট্‌স্।

বারবারি উপকূলের নগর-কর্তারা ধারণা করলেন, নতুন ওই দেশের নেতা খামোকা হুমকি দিচ্ছেন। কাজেই তাঁরা তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

জবাবে টমাস জেফারসন মহাসাগরে ভাসালেন জাহাজের এক

মস্ত আর্মাডা।

ওই বিশাল রণতরীর বহর দেখে তাঞ্জিয়ারের সম্রাট বুঝলেন চাঁদা তুলবার দিন শেষ। তিনি দেরি না করে সমস্ত আমেরিকান নাবিকদের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দিলেন, জানিয়ে দিলেন ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌কে এখন থেকে চাঁদা দিতে হবে না। বদলে কমোডোর এডি টিসন আটকে রাখা দুটি বারবারি বাণিজ্য-তরী ফিরিয়ে দিলেন সম্রাটকে।

তবে ঘাবড়ে গেলেন না ত্রিপোলির বাশাও। এর বড় কারণ তাঁর জলদস্যুরা দখল করে নিয়েছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। বিশাল এ জাহাজের নতুন নাম রাখা হলো ইউনূসের তরী। আমেরিকানদের এতবড় জাহাজ দখল করে শক্ত অবস্থান নিলেন বাশাও, চাইলেন না কোনও চুক্তি করতে। আমেরিকান কমাণ্ডাররা জানেন বারবারি উপকূলের জলদস্যুরা দখল করলেও ওই ফ্রিগেটকে দস্যু-তরী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে নিজ দেশের জাহাজের জ্যাক স্টাফ থেকে বিদেশি পতাকা উড়তে দেখে তাঁদের রক্ত গরম হয়ে উঠল, কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারলেন না তাঁরা।

এরপর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে।

আজ পাঁচদিন হলো ত্রিপোলি বন্দরে ক্যালিফোর্নিয়ার উপর চোখ রাখছে আমেরিকান নেভি। জাহাজটা ভাসছে ত্রিপোলির বন্দরের ভিতর অংশে। ওটাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে তীরে বসানো দেড় শ' কামান। আমেরিকান দুই রণতরীর ক্যাপ্টেন ভেবেচিন্তে ক্যালিফোর্নিয়াকে জ্বালিয়ে দেবার উপায় খুঁজে পাওয়ার আগেই উঠল তুমুল ঝড়। এখন একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে চলেছেন ঝড়ের তোড়ে। তুমুল হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাঁদেরকে পুব সাগরে।

ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে হতক্লান্ত হয়ে পড়েছে সিগনালের

সবাই। ফার্স্ট অফিসার জেফ মার্টেল ভাবতে পারছে না কীসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে রণতরী অ্যাডভেঞ্চারের নাবিকরা। ওই জাহাজটা সিগনালের চেয়ে অনেক ছোট, মাত্র চৌষট্টি টনি। আগে ছিল ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজ। তিন মাস আগে ওটা দখল করে নিয়েছে আমেরিকান নেভি। তখন নাম ছিল হালিদা। ওটার হোল্ডে ছিল ঊনষাট জন আফ্রিকান ক্রীতদাস, বেঁধে রাখা হয়েছিল শিকল দিয়ে। ত্রিপোলির বাশাওয়ের তরফ থেকে উপহার হিসাবে পাঠানো হচ্ছিল তাদের ইস্তাম্বুলের সুলতানের কাছে।

মার্চের তেরো তারিখে শেষপর্যন্ত থামল সামুদ্রিক ঝড়।

ষোলো তারিখে দুই রণতরীর রন্দেভু হলো। এরপর আবারও রওনা হলো তারা ত্রিপোলির দিকে।

সে-রাতে স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার, ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড যুদ্ধ-পরিকল্পনার জন্য জরুরি মিটিং ডাকল। খুদে অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসল অফিসাররা। সশস্ত্র আটজন নৌ-সেনা নিয়ে নৌকায় করে ওই জাহাজে গেল লেফটেন্যাণ্ট জেফ মার্টেল।

নিচু গানেলে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মার্টেলকে তুলে নিল ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড। ঠাট্টা করল, 'ও? আরামসে ঝড় পার করে এখন বিজয়ের স্বাদ নিতে চাইছ?'

অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেন সুদর্শন সুপুরুষ। চওড়া কাঁধ, মাথাভরা ঘন কালো চুল। যে কাউকে আকর্ষণ করে তার বুদ্ধিদীপ্ত বাদামি চোখ, মুহূর্তে সবাই মেনে নেয় তার কর্তৃত্ব।

'দুনিয়ার সব কিছুর বদলে বিজয় চাই, স্যর,' বলল মার্টেল।

এ দু'জনের পদবী সমান, বয়সেও সমান। যখন মিডশিপমেন ছিল, তখন থেকে তাদের বন্ধুত্ব।

দৈর্ঘ্যে জেফ মার্টেল বন্ধুর সমান। তবে অপেক্ষাকৃত হালকা-পাতলা, ঠিক যেন পাকা কোনও ফেন্সার। ওর চোখের মণি দুটো এতই ঘন কালো, মনে হয় কয়লার টুকরো। এখন তার পরনে

স্থানীয় পোশাক। ছদ্মবেশের কারণে লাগছে কিংবদন্তীর জলদস্যু ইউনুস আল-কবিরের মত। মনে মনে তার আশা, একদিন মুখোমুখি হবে ওই দস্যুর। কানাডার মণ্ট্রিয়লে জন্মেছে মার্টেল, তবে ষোলো বছর বয়সে চলে আসে ইউনাইটেড স্টেট্সে। ওর জানার কৌতূহল ছিল, কীভাবে পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক দেশ। কিছুদিন পর নাগরিত্ব নেয়, দশ বছর কাজ করে টিমবার স্কুনারে। শেষে যোগ দেয় আমেরিকান নেভিতে।

চৌষট্টি ফুটি অ্যাডভেঞ্চারে গাদাগাদি হয়ে অপেক্ষা করছে আশিজন যোদ্ধা। তাদের কেউ কেউ ছদ্মবেশ পরেছে। বেশির ভাগ যোদ্ধা লুকিয়েছে গানেলের পিছনে, কিংবা অবস্থান নিয়েছে হোল্ডে। পরে যখন পাল তুলে ত্রিপোলির পাথুরে ব্রেকওয়াটার পেরুবে অ্যাডভেঞ্চার, ঢুকে পড়বে বন্দরের অভ্যন্তরে, তখন এই লোকগুলো ডেকে দাঁড়িয়ে লড়বে।

'মার্টেল, এসো পরিচয় করিয়ে দিই ব্রুনো মার্সের সঙ্গে। বন্দরের কাছাকাছি হলে সারেঙের কাজ করবে ও।'

চওড়া দেহের লোক ব্রুনো মার্স, গায়ের রং কালচে। মুখ ভরা ঘন কালো দাড়ি, পুরো বুক ঢেকে ফেলেছে। নোংরা সুতির পাগড়ি ঘিরে রেখেছে বিরাট মাথাটাকে। কোমর-বন্ধ থেকে ঝুলছে বাঁকা ছোরা। হাতলে ঝিকমিক করছে লাল পাথর।

সারেঙের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইল মার্টেল, তবে তার আগে জ্যাচ রেমণ্ডের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'এ বোধহয় স্বেচ্ছাসেবী নয়?'

'অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে ওর পিছনে,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাচ রেমণ্ড।

'আপনাকে দলে পেয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার মার্স,' বলল মার্টেল, খপ্ করে ধরল ইটালিয়ানের ঘর্মাক্ত হাত। 'আমাদের যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য ইউএসএস সিগনালের সবার তরফ

থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

চওড়া হাসি দিল ব্রুনো। তার দাঁত ফাঁক ফাঁক। ‘বাশাওয়ের দস্যুরা বহুবার আমার জাহাজে হামলা করেছে। তাই ভাবলাম, এইবার প্রতিশোধ নিলে কেমন হয়।’

‘খুব ভাল লাগছে যে আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন,’ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মার্টেল। চারদিকে চাইতে শুরু করেছে।

অ্যাডভেঞ্চারের মাত্র দুটো মাস্তুল এখনও খাড়া, কাত হয়ে গেছে কয়েকটা। যে হাওয়া ধরছে পালগুলো, সব লবণে ভরা। কাপড়ের এখানে ওখানে তালি-পট্টি দেয়া। অবশ্য ডেক ঘষা হয়েছে লাই ও পাথর দিয়ে। চকচক করছে ওক কাঠ। মার্টেলের চোখ জ্বলছে লাইয়ের ধকে।

অ্যাডভেঞ্চারে রয়েছে মাত্র চারটি ছোট ক্যারোনেড। নেভির এ কামান গোলা ছুঁড়লে রেলের উপর পিছিয়ে যায়, লাফিয়ে ওঠে না চাকার উপর। এদিকে রেইডিং পার্টি শুয়ে পড়েছে ডেকের উপর, হাতের পাশে মাস্কেট ও তলোয়ার। বেশিরভাগ সৈনিককে দেখতে লাগছে অসুস্থ। গত ক’দিনের ঝড় মস্ত ঝাঁকি দিয়ে গেছে সবাইকে।

জ্যাচ রেমণ্ডের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল মার্টেল। ‘ভাল লোক নিয়ে লড়তে চাইছ।’

‘টিটকারি দেয় কে রে?’ ভুরু কুঁচকে বন্ধুকে দেখল রেমণ্ড। ‘বলো দেখি জাহাজটা কার? শুনিনি তো কেউ তোমাকে ক্যাপ্টেন বলে ডেকেছে কোনদিন। অথচ দেখো, বছরের পর পর সার্ভিস দিয়ে চলেছ।’

‘কথা ঠিক, ক্যাপ্টেন!’ হাসিমুখে মেনে নিল মার্টেল।

সে রাতে মিটিং শেষে যে যার দায়িত্ব বুঝে নিল।

পরের রাতে অনুকূল হাওয়া বইতে শুরু করল। ত্রিপোলির দিকে ছুটল অ্যাডভেঞ্চার। পালা করে ব্রাসের টেলিস্কোপ চোখে

তুলল মার্টেল ও রেমণ্ড।

পরদিন ফাঁকা বিশাল মরুভূমির বুকে জেগে উঠল প্রাচীর ঘেরা দুর্গ-নগরী। বাশাওয়ের কেল্লা ও উঁচু দেয়ালে দেখা গেল কামান, সংখ্যায় এক শ' পঞ্চাশটি। রক্ষা করছে পুরো নগরী। সমুদ্র-প্রাচীরের কারণে দূর থেকে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার মাত্র তিনটি মাস্তুল দেখা গেল।

'তোমার কী মনে হয়?' জানতে চাইল জ্যাচ রেমণ্ড। এবারের আক্রমণের জন্য মার্টেলকে ফার্স্ট অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সে। ইটালিয়ান সারেঙের পিছনে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বন্ধু।

অ্যাডভেঞ্চারের ফোলা পালের দিকে চাইল মার্টেল। পরক্ষণে দেখল পিছন-সাগরে ফেনা তৈরি করছে জাহাজটা। গতিবেগ হবে চার নট। 'আমার মনে হয় গতি কমানো উচিত। নইলে সূর্যাস্তের আগেই বন্দরে ঢুকে পড়ব।'

'তা হলে টপ সেইল আর জিব গুটিয়ে নিতে বলব, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল ব্রুনো মার্স।

'বোধহয় তা-ই ভাল।'

সময় পেরুতে লাগল, দীর্ঘ হলো মাস্তুলের ছায়া, শেষে মিলিয়ে গেল এক সময়। সূর্যের শেষ রশ্মি ঠিকরে উঠল পশ্চিম দিগন্তে। ত্রিপোলির উপসাগরে প্রবেশ করল অ্যাডভেঞ্চার, এগুতে লাগল দুর্গ-নগরীর সুউচ্চ প্রাচীর লক্ষ্য করে। নতুন চাঁদের আলোয় বাশাওয়ের বিশাল কেল্লা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। উঁচু প্রাচীর ও কেল্লার গায়ে কালো ফোঁটার মত কী যেন। ওগুলো বিধ্বংসী কামান, সামনে থেকে দেখলে ভয়ই লাগে। প্রাচীরের ওপাশে চোখে পড়ল মসজিদের মাথার উপর গম্বুজ। অ্যাডভেঞ্চারের সবার কানে দূর থেকে ভেসে এল আযানের ধ্বনি। সূর্য ডুববার আগমুহূর্তে নামাযের জন্য ডাকছেন মোয়াজ্জিন।

বাশাওয়ের কেল্লার ঠিক নীচে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। দূর থেকে মনে হলো ভাল অবস্থায় রাখা হয়েছে জাহাজটাকে। সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছিল কামানগুলো, কিন্তু আবার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি রয়েছে গানপোর্টে।

নিঃসঙ্গ ওই জাহাজ দেখে একই সঙ্গে কয়েকটা অনুভূতি হলো মার্টেলের ভিতর। ভাবছে, কী অপূর্ব সুন্দর জাহাজ, আর কী প্রকাণ্ড! আবার রেগে উঠল, ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার স্টার্নে ঝুলছে ত্রিপোলির বাশাওয়ের পতাকা। ওই রণতরীর তিন শ' সাতজন নাবিক-সৈনিককে বন্দি করে রেখেছে বাশাও। এখন যদি জ্যাচ রেমণ্ড নির্দেশ দেয়, দ্বিধা না করে সৈনিকদের নিয়ে আক্রমণ করবে সে বাশাওয়ের কেল্লা, চেষ্টা করবে বন্দিদের উদ্ধার করতে। কিন্তু মনের গভীরে জানে মার্টেল, কখনও এ নির্দেশ আসবে না। সমগ্র ভূমধ্যসাগরের কমাণ্ডার, কমোডোর টিসন ওদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এমন কোনও ঝুঁকি নেবেন না যার ফলে, বারবারি জলদস্যুরা আরও বেশি আমেরিকানকে বন্দি করতে পারে।

বন্দরের ব্রেকওয়াটারের চারপাশে নোঙর ফেলেছে কমপক্ষে বারোটা জাহাজ। সেগুলোর ভিতর রয়েছে ল্যাটিন-রিগ মার্চেন্টমেন থেকে শুরু করে জলদস্যুদের জাহাজও। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের জাহাজ থেকে মুখ বের করে রয়েছে কামান। বিশটা গোনার পর হিসাব বাদ দিল মার্টেল।

নতুন অনুভূতি আঁকড়ে ধরল হৃৎপিণ্ডকে।

হ্যাঁ, ভয় লাগছে তার।

সব যদি পরিকল্পনা মত না চলে, ওদের পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার সহ বন্দর থেকে আর বেরুনো সম্ভব হবে না। জাহাজের প্রতিটি মানুষ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। অথবা তার চেয়েও খারাপ, হয়তো বন্দি হবে তারা, এবং বাকি জীবন বরণ করতে হবে ক্রীতদাসত্ব।

গলা শুকিয়ে গেল মার্টেলের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলাস প্র্যাকটিস করে নিজের দক্ষতা বাড়িয়েছে সে। কিন্তু এখন মনে হলো না সে বিদ্যা খুব কাজে আসবে। কোমর-বন্ধনির দু'পাশের খাপে গুঁজে রেখেছে বেমানান চেহারার দুটো .৫৮ ক্যালিবারের ফ্লিন্টলক পিস্তল। ওগুলো যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। চট্ করে দেখে নিল অ্যাডভেঞ্চারের গানেলের আড়ালে শুয়ে থাকা সৈনিকদের। তাদের সঙ্গে কুঠার-বর্শা-তলোয়ার ও ছোরা। আরব জলদস্যুদের মতই রক্ত-তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকে স্বেচ্ছাসেবী, দেশের জন্য যে-কোনও সময় জান দিতে রাজি। তাদের মাঝে হাঁটছে এক মিডশিপম্যান, নিশ্চিত হচ্ছে স্কোয়াড লিডাররা তাদের লণ্ঠন জ্বেলে নিয়েছে। হ্যাঁ, সবাই প্রস্তুত। তিমি মাছের তেলে ভিজানো সলতে তৈরি।

আরেকবার ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চাইল জেফ মার্টেল। অনেক কাছে চলে এসেছে। ওই দেখা যায় রেইলে দাঁড়িয়ে তিন প্রহরী, পরিষ্কার চোখে পড়ল ওদের কোমরে ঝুলানো দীর্ঘ তলোয়ার।

মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। আরও দু'ঘণ্টা লাগল ফ্রিগেটের কাছাকাছি হতে। এবার চেঁচিয়ে কথা বললে শুনবে লোকগুলো।

আরবিতে ফাটা গলা ছাড়ল ব্রুনো মার্স, 'অ্যাহোয়, শুনছ?'

'কী চাও?' একজন পাল্টা জানতে চাইল।

'আমি ব্রুনো মার্স,' বলে উঠল ইটালিয়ান সারেং। জ্যাচ রেমণ্ড ও মার্টেলের তৈরি খসড়া অনুযায়ী গড়গড় করে বলতে লাগল, 'এই জাহাজটা হালিদা। গরু-ছাগল-দুম্বা কিনতে এসেছি। পৌঁছে দেব মাল্টার ব্রিটিশ বেসে। কিন্তু ঝড় শুরু হলো, অন্য দিকে সরে গেলাম। খসে পড়েছে নোঙর। থামতে পারছি না। রাতের জন্য তোমাদের সুন্দর জাহাজে দড়ি বাঁধতে পারি? সকালে ডকে নেমে নোঙর কিনব।'

‘ব্যস, আর কিছু বলার নেই,’ মার্টেলের কানের কাছে বলল জ্যাচ রেমণ্ড। ‘ওরা যদি আপত্তি করে, ঝামেলার ভিতর পড়ব।’

‘থামতে দেবে। ওদের দিক থেকে ভেবে দেখো। কেউ এত ছোট জাহাজ নিয়ে ভিড়তে চাইলে কী-ই বা ভাবতাম আমরা?’

‘না, কিছুই ভাবতাম না।’

প্রহরীদের নেতা খসখস করে দাড়ি চুলকাল, সন্দেহ নিয়ে চাইল অ্যাডভেঞ্চারের দিকে, তারপর চেঁচিয়ে জানাল, ‘ঠিক আছে! দড়ি বাঁধতে পারো। তবে ভোরে সরে যাবে।’

‘অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন। দশটা ছেলে দিন।’ মুখ না ফিরিয়ে নিচু স্বরে বলল মার্স, ‘ওরা রাজি হয়েছে।’

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে জ্যাচ রেমণ্ড ও জেফ মার্টেল। হালকা হাওয়া অ্যাডভেঞ্চারকে নিয়ে চলেছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার পাশে। ফ্রিগেটের কামানগুলো দেখছে ওরা, নলের মুখ থেকে নিরাপত্তা-খাপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রকাণ্ড লাগছে একেকটা গহ্বর। এখন যদি বুঝে ফেলে জলদস্যুরা, এত কম রেঞ্জে শলার কাঠির মত মট্ করে ভাঙবে অ্যাডভেঞ্চার, ছিন্নভিন্ন হবে আশিজন সৈনিক।

আরও কাছে চলে গেল অ্যাডভেঞ্চার। ওটার ডেক থেকে পনেরো ফুট উপরে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার রেলিং। ওখানে আলাপ করছে প্রহরীরা, আঙুল তুলে দেখাল অ্যাডভেঞ্চারের গানেল। ওখানে গুটিশুটি মেরে অনেকে বসে রয়েছে।

দুই জাহাজের মাঝে এখনও দশ ফুট দূরত্ব। এমন সময় এক প্রহরী চেঁচিয়ে উঠল, ‘আমেরিকানো!’

‘আপনার লোকদের বলুন হামলা করতে,’ প্রায় কেঁদে ফেলল ব্রুনো মার্স।

‘কমাণ্ডিং অফিসার না বললে কেউ আক্রমণ করবে না,’ কড়া স্বরে বলল জ্যাচ রেমণ্ড।

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেকে বারবারি জলদস্যুরা সড়াৎ করে বের করে ফেলেছে তলোয়ার। তাদের একজন পিঠের ক্রস-ফিতা থেকে বের করতে চাইল ব্লাণ্ডারবাস* । দুই জাহাজে ঘর্ষণ হতেই চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল জ্যাচ রেমণ্ড, 'জাহাজে ওঠো!'

বুকে ঝুলছে খুদে বাইবেল, একবার ওটা স্পর্শ করল মার্টেল, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল খোলা এক গানপোর্টে। এক হাতে আঁকড়ে ধরল কাঠের ফ্রেম, অন্যহাত রাখল হালকা গরম ব্রোঞ্জের কামানে। ওপাশের ফ্রেম ও কামানের মাঝ দিয়ে গলিয়ে দিল দুই পা, পিছলে ঢুকে গেল জাহাজের পেটে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েই খাপ থেকে বের করল তলোয়ার।

নিচু ছাত থেকে ঝুলছে মাত্র একটা লণ্ঠন। সে আলোয় দেখা গেল আরেকটা গানপোর্ট থেকে হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল দুই জলদস্যু। লাফিয়ে জাহাজে উঠছে আমেরিকান সৈনিক। দুই জলদস্যুর একজন ঘুরেই মার্টেলকে দেখতে পেল। দেরি না করে খাপ থেকে চওড়া ফলার তলোয়ার বের করল, খালি পায়ে তেড়ে এল ডেক মাড়িয়ে। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার। নিরস্ত্র বা আনাড়ি কাউকে আক্রমণ করবার সময় এ কৌশলে বেশ ভাল ফল দেয়।

ঘাবড়ে গেল না জেফ মার্টেল। থমকে না গিয়ে চেয়ে রইল শীতল চোখে। তেড়ে আসছে শত্রু। কোমরের পাশ থেকে তলোয়ার চালাল লোকটা। দু' টুকরো করতে চাইছে। তবে হালকা পায়ে এক ফুট সামনে বাড়ল মার্টেল, দেরি না করে

---

* বড় বোরের অস্ত্র। একসঙ্গে ছিটকে বের হয় অজস্র বল। আহত হয় অনেকে।

নিজের তলোয়ার গেঁথে দিতে চাইল শত্রুর বুকে।

শেষ মুহূর্তে থামতে পারল না জলদস্যু, পাঁজরের ভিতর পড়পড় করে ঢুকল মার্টেলের তলোয়ারের ফলা, বেরিয়ে গেল পিঠ ভেদ করে। লোকটার হাত থেকে খসে পড়ল ভারী তলোয়ার, ঠনাৎ করে পড়ল ডেকে। আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে শত্রুর বুকে এসে পড়ল জলদস্যু, শিথিল। মার্টেল এক হাঁটু তুলে তাকে ঠেলে দিয়েই বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে নিল ফলা, চরকির মত ঘুরল। পাশেই ছায়া। ঝপ্ করে বসে পড়ল। ওর মাথার উপর দিয়ে গেল ধারালো কুঠারের ফলা। কাঁধ খুঁজে না পেয়ে সরছে আরেকদিকে। বাঁ পাশ থেকে তলোয়ার চালাল মার্টেল, ফলার ডগা চিরচির করে কাটল লোকটার কাপড়-ত্বক এবং পেশি। পুরো পেট চিরতে পারেনি, তবে মার্টেল দেখল গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। ওই লোক আর লড়বে না।

গোটা গানডেক জুড়ে যেন নারকীয় দৃশ্য। আবছা আলোয় কুঠার নিয়ে ব্যস্ত কালো মূর্তিগুলো, একে অপরের দেহে ফলা গেঁথে দিতে চাইছে। তলোয়ারের ইস্পাতে ইস্পাত ঠনাৎ-ঠং লাগছে। একে অপরকে ফুটো করছে। ব্যথায় কাতরে উঠছে আহতরা। গান-পাউডারের গন্ধে বাতাস ভারী। সব ছাপিয়ে আসছে রক্তের আঁষটে ঘ্রাণ।

লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আরেকদিকে চলল মার্টেল। তলোয়ার বা বর্শা নিয়ে লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয় গানডেক। তবে প্রাণপণ লড়ে চলেছে দুই পক্ষ। এক আমেরিকান সৈনিক পড়ে গেল। তার বুকে তলোয়ার গেঁথে দিয়েছে এক দস্যু। প্রতিপক্ষ ওই লোক সবার চেয়ে লম্বা। পাগড়ি ছুঁই-ছুঁই করছে ছাতের আড়াটাকে। তলোয়ার চালাল সে মার্টেলের দিকে। ফলাটা ঠেকিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। তবে এত জোরে আঘাত হেনেছে দস্যু, অবশ হয়ে গেল হাত। দ্বিতীয়বারের মত

আক্রমণ এল। নিজের তলোয়ার তুলে ঠেকাতে গিয়ে ফুরিয়ে গেল মার্টেলের সব শক্তি। কোনওমতে সরিয়ে দিল ফলা।

টলমল করতে করতে পিছাতে হলো ওকে। ধাওয়া করে এল জলদস্যু, দু' পাশ থেকে চালাচ্ছে তলোয়ার। শত্রুকে দাঁড়াতে দেবে না। আক্রমণ দূরের কথা, সোজা হয়ে তলোয়ার তুলতেই পারছে না মার্টেল। জ্যাচ রেমণ্ড পরিকল্পনার সময় বারবার বলেছে: হামলার সময় নীরবতা বজায় রাখতে হবে, নইলে বন্দরের সমস্ত জলদস্যু ছুটে আসবে।

খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মার্টেল, আর কোনও উপায় না দেখে কোমরের খাপ থেকে বের করল পিস্তল। নিশানা নিখুঁত হওয়ার আগেই টিপে দিল ট্রিগার। প্যানের ভিতর ঝলসে উঠল সামান্য পাউডার, পরক্ষণে জ্বলে উঠল মূল চার্জ, কড়াৎ করে উঠল ফ্লিন্টলক। .৫৮ ক্যালিবারের বল ফুটো করল দস্যুর বুক।

সাধারণ লোক এক পলকে ডেকের উপর আছড়ে পড়ত, কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে আসছে দস্যু! মাত্র এক সেকেণ্ড পেল মার্টেল, তারপর দেখল তলোয়ার চালাতে চালাতে আসছে দানব। লেফটেন্যান্টের বাহুর উপর পড়ত কোপ, তবে শেষ মুহূর্তে ফলা দিয়ে ঠেকিয়ে দিল সে আঘাতটা। প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে দৈত্য, সামলাতে গিয়ে ছিটকে পিছাতে হলো। খেয়াল করবার আগেই চলে গেল মার্টেল গানডেকের আরেক মাথায়। ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার আঠারো পাউণ্ডের কামানের উপর পড়ল সে। জ্যাচ রেমণ্ডের কথা তখনও কানের ভিতর গুনগুন করছে: নীরবতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এবার কোমরের পিছন থেকে জ্বলন্ত তেলের লণ্ঠন খুলে নিল মার্টেল, দেরি না করে শিখা ছুঁইয়ে দিল ব্রোঞ্জের কামানের টাচ-হোলে। পাউডার চার্জ পুড়তে শুরু করেছে, কড়া গন্ধ বেরুল। চারপাশে হই-হই করে লড়ছে সবাই। সেসব শব্দের উপর দিয়ে শোনা গেল বারুদ পুড়বার মৃদু চিড়বিড়

আওয়াজ। দানব দস্যুর মাঝখানে মোটা কামান রেখে দাঁড়িয়েছে লেফটেন্যান্ট। নেভির কামান সম্বন্ধে এত দিনের অভিজ্ঞতা ওকে বলে দিল, ঠিক সময় বেছে নিয়েছে।

জলদস্যু বুঝে নিয়েছে, হাঁপিয়ে গেছে প্রতিপক্ষ, বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মেনে নিয়েছে মরতে হবে। মাথার উপর তলোয়ার তুলল দস্যু, পরক্ষণে হামলা করল, টের পেতে চাইল মাংস-হাড় কাটবার অনুভূতি। কিন্তু ততক্ষণে বেজির মত সরে গেছে মার্টেল। শেষ আঘাত হানতে এত ব্যস্ত দস্যু, নিজের তলোয়ার ফেরাতে পারল না, বা খেয়ালই করল না কামানের পিছনে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। এক সেকেণ্ড পর ভুশ করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল গন্ধকের ধোঁয়া। প্রচণ্ড বুম্‌ম্‌ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল গোলা।

ডেকের উপর দিয়ে যেন হড়কে না যায়, সেজন্য রয়েছে হেম্প লাইনগুলো, তারপরও কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল কামান। ব্রোঞ্জের দৈত্যের পিছন অংশ ছিটকে লাগল দস্যুর তলপেটে, চুরমার হলো পেলভিসের হাড়গুলো, চুরচুর হলো হিপজয়েন্ট, গুঁড়ো হলো দুই উরুর হাড়। শিথিল দেহটা ছিটকে গিয়ে লাগল ছাতের বিমে, সেখান থেকে নামল ডেকে। তবে উল্টো ভাঁজ হয়ে গেছে।

এক সেকেণ্ড পর গানপোর্ট দিয়ে উঁকি দিল মার্টেল। আঠারো পাউণ্ডের গোলা বন্দর পেরিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছে কেল্লার দেয়ালে। মস্ত এক গর্ত তৈরি করেছে। উপর অংশ থেকে নেমে আসছে ছোট পাথরের অ্যাভালাঞ্চ।

'এক গোলায় দুই পাখি, মোটেই খারাপ নয়,' বলল বোসান, মাইকেল গোমেজ। 'চালিয়ে যান, স্যর।'

'যদি ক্যাপ্টেন জানতে চায়... গোলা ছুঁড়েছে ওই বদমাশ।'

'আমি তো তা-ই দেখলাম, লেফটেন্যান্ট মার্টেল!'

কামান গোলাবর্ষণ করতেই যেন স্টার্টারের পিস্তল টাশ্ করে উঠেছে। শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিরোধ বাদ দিয়ে গানপোর্টগুলোর সামনে ছুটে গেল জলদস্যুরা, একের পর এক লাফিয়ে পড়তে লাগল বন্দরের শান্ত পানিতে। যারা মই বেয়ে মেইন ডেকে উঠতে চাইছে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জ্যাচ রেমণ্ডের দল।

'চলো, কাজ শেষ করি,' বলল মার্টেল।

ওরা দু'জন জাহাজের স্টারবোর্ডে সরে গেল, ওখানে অ্যাডভেঞ্চারের নাবিকরা জড় হয়েছে রেইডিং পার্টির হাতে বিস্ফোরক তুলে দেওয়ার জন্য। মার্টেলের অধীনে গোমেজ ও আরও ছ'জন বুঝে নিল কালো পাউডার। সবার আগে মই বেয়ে নীচের ডেকে নামতে লাগল লেফটেন্যান্ট। পরের ডেকে দেখা গেল এখনও র‍্যাফটার থেকে ঝুলছে হ্যামক, তবে অন্যান্য সব জিনিস লুঠ হয়েছে।

মই বেয়ে নামছে মার্টেলের দল, শেষে চলে এল সবচেয়ে নীচের ডেকে। একটা হোল্ডের ভিতর ঢুকল। নেভির বেশিরভাগ রসদ সরিয়ে নেয়া হয়েছে, তবে তারপরও যা রয়েছে তাতে আগুন দিলে পুড়তে শুরু করবে ফ্রিগেট।

দ্রুত কাজ সারতে চাইল সবাই। লেফটেন্যান্ট স্থির করল কোথায় বসানো হবে সলতে। কাজ শেষে লণ্ঠন থেকে আগুন দিল। তরতর করে বেড়ে উঠল শিখাগুলো। এবং এতই দ্রুত যে, চমকে গেল সবাই। কয়েক মুহূর্তের ভিতর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল হোল্ড। আগুন দেয়া দলটি তাড়াতাড়ি মই বেয়ে উঠতে লাগল। একটু পর পর থামছে, শার্টের আস্তিনে নাক-মুখ চেপে শ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ ওদের মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো ছাত। ঝলসে উঠল আগুন। মনে হলো ডেকের উপর পড়েছে কামানের গোলা। মাইকেল গোমেজ ছিটকে পড়ল এক পাশে, আরেকটু

হলে জ্বলন্ত বিমের নীচে চাপা পড়ত কিন্তু ওর দুই পা ধরে কর্কশ ডেকের উপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে সরিয়ে নিল মার্টেল। টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল, পরক্ষণে ছুটতে লাগল। পিছনে আসছে দলের সবাই। উপর থেকে খসে পড়ছে জ্বলন্ত কাঠ। ছুটবার ফাঁকে এদিক ওদিক সরতে হচ্ছে।

একটা মইয়ের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। ঘুরে দাঁড়াল মার্টেল, দ্রুত ইশারা করল, 'যাও-যাও-যাও! জলদি! নইলে পুড়ে মরতে হবে!'

প্রায় সবার শেষে ধীরে উঠছে মাইকেলের পা দুটো। তার পরপর উঠতে লাগল মার্টেল। পিছনে একটা করিডোর থেকে ধেয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা। মাইকেলের পিঠে কাঁধ দিয়ে গুঁতো দিল মার্টেল। দ্রুত নড়ছে না ছোকরা! গায়ের জোরে উপরে ঠেলল। প্রায় একই সঙ্গে হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন, শরীর গড়িয়ে সরে গেল দু'পাশে। ঠিক তখনই হোল্ডের ভিতর থেকে ভলকে উঠল আগুন, গিয়ে লাগল ছাতে। ওখানে তৈরি হলো কমলা রঙের বিশাল এক ছাতি।

সবাই যেন রয়েছে আগুনের সাগরে। দেয়াল, ডেক ও ছাত জুড়ে নেচে চলেছে উদ্বাহু শিখা। সেই সঙ্গে গাঢ় ধোঁয়া। সবার চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। কিছু দেখা যায় না। মাইকেল ও মার্টেল প্রায় অন্ধের মত পৌঁছে গেল একটা মইয়ের মুখে, ওটা বেয়ে উঠে এল গানডেকে। পোর্টগুলো দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। তবে এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে। গত পাঁচ মিনিটে এই প্রথমবারের মত বুক ভরে দম নিতে পারল ওরা। আর কাশতে হচ্ছে না।

ছোট একটা বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিল ক্যালিফোর্নিয়াকে, তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জন।

'চলো, বাছা!' তাড়া দিল মার্টেল।

লাফ দিয়ে উঠল ওরা, দৌড়ে গিয়ে চড়ল এক গানপোর্টে। সামনেই অ্যাডভেঞ্চারের ক্রুরা হাত বাড়িয়ে রেখেছে। নিজেদের জাহাজে নামিয়ে নিল ওদেরকে। দু'জন ক্রু বার কয়েক পিঠ চাপড়ে দিল মার্টেলের। লেফটেন্যান্টের ধারণা হলো ওকে বাহবা দেয়া চলছে। কিন্তু তা নয়, লোকগুলো ওর শার্টের পিঠ থেকে আগুন নেভাতে ব্যস্ত।

ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার বুলওয়ার্কের উপর বুট রাখল জ্যাচ রেমণ্ড।

মুখ তুলে চাইল মার্টেল। 'ক্যাপ্টেন,' গলা উঁচিয়ে বলল, 'নীচের ডেকে কেউ নেই।'

'খুব ভাল, লেফটেন্যান্ট।' দড়ি বেয়ে সঙ্গীদের নেমে যেতে দেখছে রেমণ্ড, সবার শেষে নেমে এল নিজের জাহাজে।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়া। গানপোর্ট থেকে ছিটকে উঠছে লাল-হলুদ-কমলা শিখা, মাস্তুলের দড়ি পোড়াতে শুরু করেছে। এখুনি নরক হয়ে উঠবে চারপাশ। এখন পুড়তে শুরু করেছে কামানের ভিতরের পাউডার।

এখনও নয়টি কামান তাক করা অ্যাডভেঞ্চারের দিকে!

খুদে রণতরীর সামনের দিকের দড়ি সহজে খোলা গেল। কিন্তু পেঁচিয়ে গেছে পিছনের দড়ি। লোক ঠেলে ওখানে চলে গেল মার্টেল, খাপ থেকে বের করল তলোয়ার। লড়াই করতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে তলোয়ার। এক ইঞ্চি পুরু দড়ি, তারপরও প্রচণ্ড কোপে কেটে দিল।

লেলিহান আগুন প্রচুর অক্সিজেন পোড়াচ্ছে, আর সেই কারণে ভরছে না অ্যাডভেঞ্চারের পাল। ক্যালিফোর্নিয়ার জ্বলন্ত দড়ি-দড়ার কাছে ঝুঁকে পড়েছে জিব পাল। অ্যাডভেঞ্চারকে সরিয়ে নিতে চাইছে নাবিকরা। তবে একটু সরলেই আবার অমোঘ টানে ফিরছে। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরবে এই জাহাজেও।

ফ্রিগেটের প্রধান মাস্তুল থেকে খসে পড়ল জ্বলন্ত পাল। তার এক টুকরো আগুন পুড়িয়ে দিল এক নাবিকের চুল।

'মার্টেল,' ভারী গলায় বলে উঠল জ্যাচ রেমণ্ড, 'জাহাজ থেকে নৌকা নামাও, টেনে নিয়ে যাও আমাদেরকে।'

'আই-আই, ক্যাপ্টেন।'

মাইকেল ও অন্য চার নাবিককে নিয়ে মার্টেল জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলল ডিঙি। অ্যাডভেঞ্চারের বো থেকে দড়া নিয়েছে ওরা। নিঃশব্দে জাহাজ টেনে নেয়ার চেষ্টা শুরু হলো। দড়া টানটান হতেই বৈঠা বাইতে লাগল সবাই, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে। পানি থেকে বৈঠা তুললে দেখছে আগুনের তৈরি হাওয়ায় অর্ধেক পথ আবার পিছিয়ে পড়েছে।

'বৈঠা মারো, বৈঠা মারো!' চেঁচিয়ে উঠল মার্টেল। 'মারো টান, হেঁইয়ো!'

প্রাণপণ চেষ্টা করছে সবাই। চৌষট্টি টন ওজনের বোঝা নিয়ে এগুতে চাইছে। পিছন থেকে আকর্ষণ করছে আগুনের লেলিহান যজ্ঞ। জেদ ধরে বৈঠা বেয়ে চলেছে তারা। ভেঙে আসতে চাইছে মেরুদণ্ড। ফুলে উঠছে ঘাড়ের রগ। টনটন করছে দুই হাত। ডিঙি নৌকার দুঃসাহসী নাবিকরা একটু একটু করে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে চলল অ্যাডভেঞ্চারকে। কিছু দূর যাওয়ার পর পাল তুলল জ্যাচ রেমণ্ড। মরুভূমি থেকে ভেসে এল মৃদু হাওয়া, একটা একটা করে ফুলে উঠল পাল।

ঠিক তখনই কেল্লার দেয়ালে ফুটে উঠল রক্তগোলাপ। ক' মুহূর্ত পর ভেসে এল কামানের গর্জন। জাহাজ ও নৌকা পেরিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল গোলা। মোট বারোবার গোলা-বর্ষণ হলো। অস্থির হয়ে উঠল চারপাশের পানি। ব্রেকওয়াটার ধরে ছুটে আসছে প্রহরীরা। ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র থেকে গুলি করছে।

দ্রুত দাঁড় টানছে মাঝি-মাল্লারা। হঠাৎ অ্যাডভেঞ্চারের পিছনে

ঝলসে উঠল লাল আলো। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরো পালে ধরে গেছে আগুন।

পরবর্তী বিশ মিনিট রুদ্ধশ্বাসে দাঁড় টেনে চলল মাল্লারা, এদিকে চারপাশের পানিতে এসে পড়ছে একের পর এক গোলা। একটা চলে গেল অ্যাডভেঞ্চারের টপগ্যালেন্ট পাল ভেদ করে। তবে এখনও সরাসরি কোনও গোলা আঘাত হানেনি। প্রথমে থেমে গেল খুদে ক্যালিবারের গুলি, তারপর অ্যাডভেঞ্চার সরে গেল বাশাওয়ের কামানেরও আওতার বাইরে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই, ঢলে পড়ল একে অপরের উপর। হাসছে, গান গাইছে, নাচছে উন্মাদের মত। জ্বলন্ত জাহাজের আলোয় ওই যে দেখা যায় বাশাওয়ের কেল্লা! আর ওদেরকে ধরতে পারবে না কেউ!

অ্যাডভেঞ্চারে ভিড়ল মার্টেলের ডিঙি। ওটা তুলে রাখা হলো ডেভিটে।

'দারুণ দেখিয়েছ, দোস্ত,' খুশি মনে বলল জ্যাচ রেমণ্ড। পিছন থেকে আসা রক্তিম আলোয় চকচক করছে তার মুখ।

মার্টেল এতই ক্লান্ত, কোনও জবাব দিতে পারল না, চুপচাপ হাঁপিয়ে চলেছে। তবে ছোট্ট করে স্যালিউট দিল বন্ধুর উদ্দেশে।

হঠাৎ সবার চোখ ঘুরে গেল বন্দরের দিকে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল মাস্তুলগুলো, কাত হয়ে পড়ে গেল পোর্ট সাইডে। বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, ছিটকে উঠল স্ফুলিঙ্গ। অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে ফ্রিগেটের, প্রায় একইসঙ্গে আগুন উগরে দিল কামানগুলো, কিছু গোলা পড়ল পানিতে, বাকিগুলো লাগল গিয়ে বাশাওয়ের কেল্লার দেয়ালে।

হই-হই করে উঠল নাবিকরা। প্রতিশোধ নেয়া গেছে জলদস্যু ও বাশাওয়ের উপর।

'এবার কী?' জানতে চাইল মার্টেল।

সাগরের দিকে চেয়ে রইল জ্যাচ রেমণ্ড। ওদিক থেকে চোখ

না সরিয়ে বলল: 'আজ রাতেই সব শেষ হয়ে যায়নি। বন্দরে এক দস্যুকে চিনতে পেরেছি—ইউনুস আল-কবির। ওর জাহাজের নাম রক। প্রাগৈতিহাসিক বিশাল আরবি পাখি। বাজি ধরতে পারো, লোকটা এখন পাল তুলছে আমাদের আক্রমণ করবে বলে। আজ যা হলো তার জন্য বন্দি নাবিকদের উপর প্রতিশোধ নেবে না বাশাও। তার কাছে মানুষগুলো জরুরি। বহু হাজার ডলার মুক্তিপণ পাবে। কিন্তু ইউনুস আল-কবির প্রতিশোধ নিতে চাইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।'

'শুনেছি আগে ধার্মিক লোক ছিল, কথা ঠিক?'

'কয়েক বছর হলো বদলে গেছে,' বলল জ্যাচ। 'আগে ছিল মুসলিমদের ইমাম। তবে খ্রিস্টানদের প্রতি তার ঘৃণার সীমা পরিসীমা নেই। এই লোক মুসলিমদেরকে শুধু ঘৃণা করতেই শেখায়নি, হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। মুসলিম দেশের পতাকা নেই এমন যে-কোনও জাহাজ আক্রমণ করে সে।'

'শুনেছি, কাউকে বন্দি করে না। কতল করে।'

'একই কথা শুনেছি আমিও। ইমাম আল কবিরের উপর নাকি কারও কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। যখন খুশি যে-কোনও বন্দরে ভেড়ে তার জাহাজ। এই লোককে শাসনকর্তারা সমঝে চলে, কারণ অসংখ্য ভক্ত তাকে পীরের মত মানে। তার একটি কথায় জীবন দিতে পারে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা।'

'মনে হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী?'

'বলতে পারো। আল-কবিরের লোক ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাদের কাছে বিধর্মীর জাহাজ লুটে নেয়া ধর্মের কাজ। ওটাকে তারা বলে: জিহাদ। ওরা লড়ে মরতে রাজি, যদি সঙ্গে নিতে পারে কোনও অমুসলিমকে।'

বিশালদেহী ওই দস্যুর কথা মনে পড়ল মার্টেলের। লোকটা গুলি খেয়েও তেড়ে এসেছিল। হয়তো ইউনুস আল-কবিরের

ভক্তদের কেউ। তার দৃষ্টিতে ছিল তীব্র ঘৃণা আর উন্মাদনা। ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে রক্ষার চাইতে মার্কিনিদের মারতে বেশি আগ্রহী ছিল।

'কেন আমাদের এত ঘৃণা করে ওরা?' বলল মার্টেল।

চোখ সরু করে চাইল জ্যাচ রেমণ্ড। 'এমন পাগলাটে প্রশ্ন আগে কখনও শুনিনি, মার্টেল।' বড় করে শ্বাস নিল সে। 'তবে আমি কী মনে করি বলছিঃ আমরা বেঁচে আছি বলে ওরা আমাদেরকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে কারণ আমরা ওদের মত নই, ওদের ধর্মের কেউ নই। সবচেয়ে বড় কারণ: ওরা মনে করে আমাদেরকে ঘৃণা করার অধিকার আছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, আমাদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নেই।'

পুরো এক মিনিট নীরব রইল মার্টেল, রেমণ্ডের কথাগুলো ভাবছে। কোনও মানুষ কেন এভাবে ভাববে, তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না। আজ রাতে কয়েকজন মানুষকে খুন করেছে, তবে ওদেরকে ঘৃণা করত না সে। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে গেছে। ওই হত্যা কোনও ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। অথচ কিছু মানুষ ভাবছে অন্যদেরকে ঘৃণা করার অধিকার তাদের আছে!

'এবার কী নির্দেশ দেবে?' কিছুক্ষণ পর বলল মার্টেল।

'ইউনুস আল-কবিরের রক শক্তিশালী জাহাজ, সেই তুলনায় অ্যাডভেঞ্চার দুর্বল। তা ছাড়া, এই জাহাজে অনেক বেশি লোক। তোমাদেরকে সিগনালে তুলে দেব। আগের পরিকল্পনা বদলে নিয়েছি। তোমরা মাল্টা দ্বীপে যাবে না। সিগনাল নিয়ে শিক্ষা দেবে ইউনুস আল-কবিরকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমেরিকান নেভি তাকে ভয় পায় না। ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টসকে জানিয়ে দিয়ো, যুদ্ধে হারা চলবে না।'

মৃদু হাসল জেফ মার্টেল। গত দু' বছর লড়তে হয়নি। শুধু হালিদা দখল করবার সময় লড়েছে। তারপর পুড়িয়ে দিয়েছে

ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে। ওর ভাল লাগছে এবার দস্যুদের বিরুদ্ধে নিজেরা কিছু করতে পারবে ভেবে।

'আমরা যদি লোকটাকে ধরতে পারি, বা হত্যা করতে পারি,' বলল মার্টেল, 'আমাদের মনোবল বাড়বে।'

'এবং অনেক কমবে ওদের মনোবল।'

ভোরের এক ঘণ্টা আগে।

সিগনালের প্রধান মাস্তুলের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ওয়াচম্যান, 'জাহাজ! সামনে জাহাজ দেখা যায়! স্টারবোর্ডের বিম থেকে ছয় পয়েন্ট দূরে।'

এ সংবাদের অপেক্ষায় ছিল দুই লেফটেন্যান্ট, জেফ মার্টেল ও সিগনালের ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টস।

'সময় হলো,' বলল ক্যাপ্টেন।

জেমস রবার্টসের বয়স মাত্র ছাব্বিশ। আইনানুগ ভাবে নেভি সৃষ্টির এক মাস আগে কংগ্রেস থেকে কমিশন পেয়েছে সে। জ্যাচ রেমণ্ডের সঙ্গে বড় হয়েছে, এবং তারই মত মহানায়ক হয়ে উঠছে নেভিতে। সবাই বলছে বিশাল এই ফ্লিট দেশে ফিরবার আগেই তাকে পদোন্নতি দেয়া হবে। হালকা-পাতলা লোক সে, মুখটা ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, গর্তে বসানো চোখ দুটো তীক্ষ্ণ। কড়া মানসিকতার মানুষ, কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। যে জাহাজে নিয়োগ করা হয়, নাবিকরা মনে করে কপাল গুণে এত ভাল ক্যাপ্টেন পেয়েছে।

বালুঘড়ি চলছে। ধীরে নীচে পড়ছে বালু-কণা। আরও দশ মিনিট পর আবার চিৎকার ভেসে এল মেইনমাস্ট থেকে: 'জাহাজটা চলতে শুরু করেছে উপকূলের পাশ ঘেঁষে।'

ঘোঁৎ করে উঠল রবার্টস। 'ওরা ঘুরে আমাদের পিছনে আসতে চেয়েছিল। তারপর ধাওয়া করে হামলা করত।' বোসান

মাইকেলের দিকে চাইল সে। ছোকরা এই জাহাজের সেইলিং মাস্টার। 'সব পাল তুলে দাও।'

চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল। দড়ি-দড়ার সঙ্গে ঝুলছে কয়েকজন, একইসঙ্গে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। বারোটা পাল ইয়ার্ড থেকে উপরে উঠল, হালকা বাতাসে ফুলে উঠল। চাপ খেয়ে ককিয়ে উঠল প্রধান মাস্তুল। ভূমধ্যসাগরে বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুই শ' চল্লিশ টনি জাহাজ।

কাত হয়ে পিছনে সাগরের দিকে চাইল মার্টেল। সাদা ফেনা তুলে ছুটছে জাহাজ। আন্দাজ করল, ঘণ্টায় দশ নট গতিতে চলেছে ওরা। বাতাস বাড়লে সব মিলে আরও পাঁচ নট মিলতে পারে।

'ওরা আমাদের দেখেই চলতে শুরু করেছে,' চেঁচিয়ে উঠল পাহারাদার। 'পাল তুলছে ওরাও।'

'এ সাগরে এমন কোনও ল্যাটিন রিগওয়ালা জাহাজ নেই, যেটা আমাদের চেয়ে দ্রুত চলে,' বলল মার্টেল।

'কথা ঠিক। কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে অনেক কম পানি কাটছে। যদি চায়, উপকূলের পাশ দিয়ে যেতে পারবে। আমাদের কামান নাগাল পাবে না ওদের।'

'ক্যাপ্টেন রেমণ্ডের কাছে শুনলাম ইউনুস আল-কবির লড়তে ভয় পায় না।'

'তোমার কি মনে হয় আমাদের পিছু নেবে ও?'

'জ্যাচ রেমণ্ড তো তাই মনে করে।'

পরের তেরো ঘণ্টা দস্যুজাহাজকে ধাওয়া করল সিগনাল। সিগনালের পালের সংখ্যা বেশি, ইউনুস আল-কবিরের জাহাজের তুলনায় গতিও বেশি। তবে আরব দস্যু এদিকের পানি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চেনে। বারবার সিগনালকে বিপজ্জনক অগভীর

পানিতে টেনে নেবার চেষ্টা করল। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে ধাওয়া বন্ধ করে সিগনালকে সরে যেতে হলো নিরাপদ পানিতে। উপকূলের কাছে জোরালো হাওয়া খুঁজে নিল ইউনুস আল-কবির। ওই বাতাস মরুভূমি পেরিয়ে টিলা টপকে আসছে। এদিকের উপকূলে একের পর এক টিলা।

টুকটুকে লাল সূর্য পশ্চিমে পাটে বসল। ততক্ষণে কমে এসেছে দুই জাহাজের মাঝের দূরত্ব। এদিকে প্রায় থেমে গেছে উপকূল থেকে আসা হাওয়া।

'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের ধরব,' বলল রবার্টস। কেবিন স্টুয়ার্ডের হাত থেকে পানি নিল। চোখ বোলাল খোলা গানডেকের উপর।

কামান নিয়ে তৈরি ক্রুরা। খানিক দূরে গোলা ও পাউডার। দশ-বারো বছর বয়সী জনা কয়েক 'পাউডার মাঙ্কি' অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ শুরু হলে দ্রুত কামান প্রস্তুত রাখবার জন্য তাদের লাগবে। দড়ি-দড়া বেয়ে উপরে উঠে গেছে কয়েকজন নাবিক। প্রয়োজনের সময় দেরি না করে পালের দিক পরিবর্তন করবে। মেরিন মার্কসম্যানরা উঠেছে ফোরমাস্ট ও মেইনমাস্টে। তাদের দু'জন টেক্সাসের লোক, দুই ভাই। কম কথা বলে, কিন্তু অন্যদের তুলনায় দ্রুত লোড করে অস্ত্র। প্রতি মিনিটে চারবার। এবং প্রতিবার আঘাত হানে নিখুঁত লক্ষ্যে।

হঠাৎ দুটো সাদা ধোঁয়া একাকার হয়ে ঢেকে দিল ইউনুস আল-কবিরের জাহাজকে। এক মুহূর্ত পর ভেসে এল গোলার আওয়াজ। একটা গোলা গিয়ে পড়ল সিগনালের পোর্ট বো থেকে খানিক দূরে। অন্যটা পড়ল স্টার্ন পেরিয়ে সাগরে।

একে অপরের দিকে চাইল রবার্টস ও মার্টেল।

মার্টেল বলল, 'ওদের স্টার্নে ও-দুটো দূরপাল্লার কামান। আমাদের সরে যাওয়া উচিত, ক্যাপ্টেন।'

'মিস্টার গোমেজ, পোর্টে বারো ডিগ্রি সরো,' নির্দেশ দিল রবার্টস। দস্যুজাহাজের গোলন্দাজদের কাছ থেকে দূরে সরতে চাইছে। 'তৈরি থাকো। প্রতিবার গোলা এলে দিক পাল্টে নিতে হবে। শেষ গোলা যেখানে পড়েছে, তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'আর যদি গোলা পড়ে তো আপনার নির্দেশ কী হবে?' মুখ ফস্কে বলে উঠল বোসান।

এ ধরনের মন্তব্যের জন্য মাইকেলের পিঠে চাবুক কষাতে পারত ক্যাপ্টেন রবার্টস। তার বদলে বলল, 'নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো।'

উপকূল থেকে আসা হাওয়া থেমে গেল হঠাৎ। দস্যুজাহাজের ত্রিকোণ বড় পাল ঝুলে পড়ল। আর এগুতে পারছে না জাহাজ। কিন্তু সিগনালের পালগুলো এখনও ফোলা। দস্যুজাহাজের সরাসরি পিছনে চলল সিগনাল। এমন একটা কোণ তৈরি করে চলেছে, সামনের জাহাজের বো থেকে কামান ছোঁড়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ পর দুই জাহাজের মাঝে আর মাত্র দেড় শ' গজ দূরত্ব রইল। আর তখনই গর্জে উঠল জলদস্যুদের কামান। ওই জাহাজের এক পাশ ঢেকে গেল ধোঁয়ায়। দুটো গোলা অনেক উপর দিয়ে গেল। তবে তৃতীয়টা লাগল সিগনালের খোলে।

চুপ করে রইল জেমস্ রবার্টস, অপেক্ষা করছে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে। যে-কোনও সময় বিধ্বস্ত হবে জাহাজ। খেয়াল করছে, দস্যুজাহাজের অন্য কোনও কামান এখনও গোলা ছুঁড়ছে না। দেখতে না দেখতে গোলা ফুরিয়ে গেল দস্যুদের। ব্যস্ত হয়ে উঠল কামান পরিষ্কার ও রিলোডে।

'কামান নিশানা করো!' নির্দেশ দিল রবার্টস। 'আগুন দাও ফিউজে!'

কর্কশ আওয়াজে গোলা দাগল চারটে কামান। প্রচণ্ড শব্দে ধক্

করে উঠল মার্টেলের হৃৎপিণ্ড। মনে হলো লাথি খেয়েছে বুকে। জাহাজের বো হারিয়ে গেল ঘন ধোঁয়ায়। পরক্ষণে বাতাসে ভর করে ধোঁয়া ঢেকে দিল পিছন অংশ। আমেরিকান জাহাজ ছুটে চলেছে দস্যুজাহাজ লক্ষ্য করে। মেরিনরা উঁচু জায়গা থেকে গুলি ছুঁড়ছে, পরক্ষণে মাস্কেটে ভরছে গুলি। সামনের জাহাজে ডেকে পড়ে গেল কয়েকজন। ভেবেছে রেলিঙের ওপাশে তারা নিরাপদ।

গোলা-গুলির উপর দিয়ে চেঁচাল রবার্টস, 'মিস্টার গোমেজ, মেইনমাস্ট থেকে কয়েকটা পাল নামিয়ে ফেলো, নইলে পুরো মাস্তুল ভেঙে পড়বে। মিস্টার মার্টেল, বো-র দিকে দায়িত্ব নাও। আগুনগুলো নিভিয়ে ফেলো। তৈরি রাখো কামান।'

'আই-আই, স্যর,' দ্রুত স্যালিউট দিয়ে বো-র দিকে ছুটল মার্টেল। দস্যুজাহাজ থেকে মাস্কেটের অসংখ্য বুলেট এসে বিঁধছে ডেকে। এক পলক দেখল বারবারি জাহাজে দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন। সিগনাল থেকে সমানে গুলিবর্ষণ চলছে। মার্টেল খেয়াল করল ওই জাহাজে চড়া কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে চলেছে এক লোক। ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই আচরণে। সব স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করছে। পরনে সাদা জোব্বা। গালে ঘন কালো চাপ দাড়ি। কিন্তু দীর্ঘ গোঁফগুলো ধবধবে সাদা, নেমেছে থুতনির পাশে। মস্ত নাক তার, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো ডগা, প্রায় নেমে এসেছে উপরের ঠোঁটের উপর।

ইউনুস আল-কবির টের পেল কেউ লক্ষ করছে। তীক্ষ্ণ চোখে আমেরিকান জাহাজের দিকে চাইল। মার্টেল এক শ' গজ দূর থেকেও টের পেল লোকটার চোখেমুখে উথলে উঠেছে প্রবল ঘৃণা। একটা গোলা দাগতেই আর দেখা গেল না দস্যু নেতাকে। নিজেও ধপ করে বসে পড়ল মার্টেল। ওর পিছনের রেলিঙে এসে লেগেছে গোলা। ছিন্নভিন্ন হলো শক্ত কাঠ। উঠে দাঁড়িয়ে আবারও চাইল মার্টেল। ইউনুস আল-কবির এখনও তেমনি চেয়ে।

চোখ সরিয়ে নিল মার্টেল। দেরি না করে চলে গেল বো-র সামনে, ওখানে লোকজনকে ডেকে জড় করল। পানি ভরা বালতি হাতে কাজে লাগিয়ে দিল। ঝপাঝপ পানি ঢালতে নিভে এল আগুন। গোলা পড়ে একটা কামান পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে পাশেরটা এখনও ঠিক। নিজে ওটার দায়িত্ব নিল মার্টেল। একটু আগে এখানে লড়েছে এক তরুণ মিডশিপম্যান, কিন্তু বেচারা এখন আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। লাশ থেকে পোড়া গন্ধ আসছে।

বারুদ ভরা কামান তৈরি। ফিউজে ম্যাচ ছোঁয়াল মার্টেল। বিকট আওয়াজ তুলল কামান। বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে গেল গাইড রেইল ধরে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যারেলের ভিতর অংশ সাফ করে ফেলল কয়েকজন। দস্যুজাহাজের কোথায় গোলা লেগেছে, একবার দেখে নিল মার্টেল। একটা গানপোর্টের পাশে মস্ত গর্ত হয়েছে। পাশে পড়ে আছে এক লোক, ছটফট করছে ব্যথায়।

'রিলোড!'

প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে এখন দুই জাহাজ, একটি অন্যটির উপর গোলা ফেলছে। যেন দুই ষাঁড় লড়ছে, কিন্তু জানে না কখন থামা উচিত। এদিকে ঘনিয়ে আসছে আঁধার। দুই দল যোদ্ধা এতই কাছে, শত্রু-জাহাজের আগুনের আভায় সহজে পরস্পরকে গুলি করছে। এখানে ওখানে দপ্ করে জ্বলে উঠছে শিখা, আবার নেভানো হচ্ছে।

দস্যুজাহাজ থেকে দ্রুত কমে আসছে গোলাগুলি। একটার পর একটা কামান ধ্বংস করছে আমেরিকানরা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পুরো এক মিনিট পেরিয়ে গেল, কিন্তু শত্রুযান থেকে কোনও গোলা এল না।

নির্দেশ দিল জেমস রবার্টস, 'সবাই তৈরি হয়ে নাও, ওই জাহাজে উঠতে হবে!'

গ্র্যাপলিং হুক নিয়ে প্রস্তুত হলো নাবিকরা। দুই জাহাজকে দড়ি দিয়ে বাঁধবে। আরেক দল তৈরি হলো বর্শা, কুঠার ও তলোয়ার নিয়ে। মার্টেল নিজের দুই পিস্তলের প্রাইমিং প্যান পরীক্ষা করে দেখল, তারপর গুঁজে নিল বেল্টে। খাপ থেকে বের করল কাটলাস।

ফেনায়িত শুভ্র ঢেউ ঠেলে দস্যুজাহাজের দিকে ছুটল সিগনাল, ভাব দেখে মনে হলো খেপা ষাঁড়। দুই জাহাজের মাঝে দশ ফুট থাকতে ছুঁড়ে দেয়া হলো হুকগুলো। পরক্ষণে প্রচণ্ড গুঁতো খেল দুই জাহাজ। দেরি করল না মার্টেল, লাফিয়ে পেরুল রেলিং, নেমে পড়ল শত্রুযানের ডেকে।

সামলে নেয়ার আগেই একের পর এক বিকট আওয়াজ শুরু হলো জাহাজ জুড়ে। বসে পড়তে বাধ্য হলো মার্টেল। থরথর করে কাঁপছে জলদস্যু যান। ওই লোকগুলো ভুল বুঝিয়েছে আমেরিকান নেভিকে। সিগনাল কাছে আসতেই আগুন উগরে দিল কামান। বারোটা গোলা গিয়ে পড়ল ব্রিগের উপর। রেলিঙের পাশে তৈরি ছিল সৈনিকদল, অনেকে ছিন্নভিন্ন হলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্টেল, চট্ করে পিছনে চাইল। গ্র্যাপলিং দড়িগুলো উন্মত্তের মত কাটতে চাইছে সৈনিকরা। দস্যুজাহাজ থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ হচ্ছে অবিরাম।

নিজের লোক মরতে দেখে থমকে গেল মার্টেল। কিন্তু রেলিং টপকে নতুন করে সিগনালে নামতে পারল না, তার আগেই দেখতে না দেখতে বিশ ফুট সরে গেল জাহাজ। ফাঁদে পড়ে চারপাশে চাইল অসহায় মার্টেল। ওর মাথার উপর দিয়ে ছুটছে মেরিনদের মাস্কেটের গুলি।

দস্যুদের গোলন্দাজরা খেয়াল করেনি জাহাজে নেমেছে সে। এখন বাঁচবার একমাত্র উপায় সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া। যথেষ্ট ভাল সাঁতারু সে। তারপরও প্রার্থনা করল, যেন দূরের ওই তীরে

পৌঁছুতে পারে। নিঃশব্দে পা বাড়াল মার্টেল। এদিকের রেলিঙে নয়, ওদিকের রেলিং পেরিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে। প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ঠিক তখনই ধেয়ে এল এক লোক।

ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল মার্টেলকে। ওই লোক বুঝে উঠবার আগেই হামলা করতে হবে। ঘুরেই উল্টো তেড়ে গেল সে। ডান হাতে বের করল পিস্তল, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার। দু' সেকেণ্ড পর ওর কাঁধ গুঁতো দিল লোকটার বুকে।

জোরাল ধাক্কা খেয়ে রেলিং টপকে পানিতে পড়ল দু'জন। জাহাজ থেকে নীচে পড়বার সময় টের পেল মার্টেল, সঙ্গের লোকটার গোঁফ সাদা! ইউনুস আল-কবিরকে সঙ্গে নিয়ে সাগরে পড়ছে সে!

জড়াজড়ি করে কুসুম-গরম পানিতে ঝপাস করে পড়ল দু'জন। ভেসে উঠেই পাশে ইউনুস আল-কবিরকে দেখল মার্টেল। দ্রুত শ্বাস টানছে ইমাম। উন্মত্তের মত একহাত নেড়ে ভেসে থাকতে চাইছে। অন্য হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নড়ছে। মার্টেলের চোখে পড়ল, সাদা জোব্বার কাঁধে লাল দাগ। সরাসরি গুলি লেগেছে কাঁধের জয়েণ্টে। লোকটা হাত তুলতে পারছে না।

চারপাশ দেখে নিল মার্টেল। কয়েক মুহূর্তে পঞ্চাশ ফুট দূরে সরে গেছে দস্যুজাহাজ। সিগনালের পাশে চলে গেল, নতুন করে আবারও সংঘর্ষ হলো। ওদিকে হই-চই চলছে। এত দূর থেকে কেউ শুনবে না মার্টেল বা আল-কবিরের কণ্ঠ। কাজেই চিৎকার করল না কেউ-ই।

পানির উপর মাথা জাগাতে গিয়ে হিমশিম খেল আল-কবির। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। জোরে শ্বাস নিতে পারছে না। তার উপর ভারী জোব্বা তাকে টেনে নামাতে চাইছে। ছোটবেলা থেকে দক্ষ সাঁতারু মার্টেল, পরিষ্কার বুঝল ইউনুস আল-কবির ভাল সাঁতার জানে না। হঠাৎ ডুবে গেল মাথাটা। কয়েক মুহূর্ত হাবুডুবু খেয়ে

আবার ভেসে উঠল। তবে লোকটা একবারের জন্যও সাহায চায়নি ওর কাছে।

আবারও ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠল। কোনওমতে ভাসছে। ঠোঁট দুটো পানি থেকে উপরে রাখতে চাইছে। সবসময় পারছে না। লাথি মেরে বুট খুলে ফেলল মার্টেল, এক টানে খাপ থেকে ছোরা বের করে চিরে দিল ইমামের জোব্বা। একটু দূরে ভেসে গেল পোশাক। তবে ওটার মালিক বড়জোর আর এক মিনিট ভাসতে পারবে।

এখান থেকে কমপক্ষে তিন মাইল দূরে উপকূল। মার্টেল নিশ্চিত নয় ওখানে পৌঁছুতে পারবে কি না। ইমামকে অতদূরে টেনে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু লোকটার জীবন এখন ওর হাতে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল মার্টেল, কখনও কোনও দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে গেছি? ...না, আমার উচিত লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

ইউনুস আল-কবিরের উদোম বুক পেঁচিয়ে ধরল মার্টেল। জবাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইল ইমাম।

সরে না গিয়ে বলল মার্টেল, 'আমরা যখন জাহাজ থেকে পড়ে গেলাম, তখন থেকে আর পরস্পরের শত্রু নই। তবে ঈশ্বরের শপথ, তুমি যদি ঝাপটা-ঝাপটি করো, তোমাকে ফেলেই চলে যাব।'

'আমি হলে তা-ই করতাম,' বিজাতীয় সুরে ইংরেজি বলল ইউনুস আল-কবির।

'তা হলে তা-ই হোক,' একটানে দ্বিতীয় পিস্তল বের করল মার্টেল, পরক্ষণে সজোরে ব্যারেলটা নামিয়ে আনল ইমামের মাথার উপর। বামহাতে অচেতন দেহ পেঁচিয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল তীরের দিকে।

দুই

ওয়াশিংটন ডি.সি.।

পথের পাশে পুরনো হোণ্ডা অ্যাকর্ডের ড্রাইভিং সিটে বসে আছে আহমেদ শরীফ, মনোযোগ দিয়ে পড়ছে চিঠিগুলোর ফটোকপি। এগুলো বিখ্যাত অ্যাডমিরাল জেমস রবার্টসের চিঠি। এ ভদ্রলোক যে সমস্ত প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। আমেরিকান সরকারের আর কোনও অফিসার এত সম্মান অর্জন করতে পারেননি।

অ্যাডমিরালের চিঠির মূল কপিগুলো ড্যাশবোর্ডে তুলে রেখেছে আহমেদ শরীফ। প্রতিলিপি থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল সে। পনেরো মিনিট পেরুল, তারপর যা আশা করছে, দেখতে পেল। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের রোলস-রয়েস সিলভার ডন গাড়িটা সাঁই-সাঁই করে পেরিয়ে যেতেই মুচকি হাসল। মিস্টার বিউ মরটন চলেছেন চিঠিগুলো কিনতে। তবে, ঠকতে হবে তাঁকে। আজ ভোরে খবরের-কাগজ দেখেই রওনা হয়েছে আহমেদ। গিয়ে কিনেও নিয়েছে চিঠিগুলো। তারপর থেকে মনে মনে হাসছে। যাঁকে নিজের ওস্তাদ মনে করে, সেই বিউ মরটনকে হারাতে পেরে যার পর নাই সন্তুষ্ট।

যে কেউ নির্দ্বিধায় বলবে পৃথিবীর সেরা নেভাল হিস্টোরিয়ান বিউ মরটন, তার তুলনা হয় না। কিন্তু গত ছয় বছরে তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সৎ-বাপের তাড়ানো বঙ্গ-সন্তান আহমেদ

শরীফ। নিরানব্বুই সালে প্রথমে আমেরিকায় আসে। ছোট চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে নেমে পড়ে স্টক মার্কেটে। তারপর থেকে শুধু এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এরইমধ্যে জমিয়ে ফেলেছে বারো মিলিয়ন ডলার। এখনও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে জড়িত, তবে আগের মত সময় দেয় না। গত ক' বছরে হাজারো বই কিনেছে সে সমুদ্র বিষয়ে, এবং পড়েছে মনোযোগ দিয়ে। তা চিঠি হোক বা কোনও অ্যান্টিক, নতুন যা কিছু পেয়েছে, ছুটে গিয়ে কিনে নিয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই ঠকেনি।

বোধহয় এবারও জিতেছে সে।

রবার্টস পরিবারে বংশপরম্পরায় ছিল চিঠিগুলো। তবে এখন নিভে এসেছে বংশের বাতি। জেনি রবার্টসের একমাত্র ছেলে ভীষণ রকম অটিস্টিক, চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে প্রচুর। ভদ্রমহিলা অভাবে রয়েছেন জানবার পর এসব চিঠির জন্য বেশি দরদাম করেনি আহমেদ।

ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা মার্কেটে গাড়ি রেখেছে। তারপর চিঠিগুলো ফটোকপি করিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে থেমেছে কখন আসবেন বিউ মরটন।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল আহমেদ, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে দেখল, ফিরছে রোলস্-রয়েস। দ্বিতীয়বার ওটার দিকে চাইল না। বার কয়েক তুড়ি দিয়ে তুলে নিল একটা চিঠি।

ওর হাতে এখন যে চিঠি, ওটা পাঠানো হয়েছিল সেক্রেটারি অভ ওয়ার, জেরি হিউবার্টকে। তখন ফিলাডেলফিয়ার নেভি ইয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন জেমস রবার্টস। ভদ্রলোক শুধু শুকনো কথা লিখেছেন। কী ধরনের সাপ্লাই পেয়েছেন, ফ্রিগেটের মেরামত কতখানি হলো, কী ধরনের পাল পেয়েছে নেভি, এই সব। তবে বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে রবার্টস ওই ফ্যাসিলিটির প্রধান না হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসাবে কাজ করতে পারলে বেশি খুশি

হতেন।

এ চিঠি সরিয়ে রাখল আহমেদ। এক ঢোক সেভেন-আপ গিলে নিয়ে কয়েকটা চিঠি তুলে নিল। প্রথমটার উপর চোখ বোলাল। রবার্টসকে লিখেছে জাহাজের এক পেটি অফিসার। বারবারি উপকূলে লড়াইয়ের সময় সে ছিল রবার্টসের অধীনে। ব্যাকরণ মেনে চিঠি লেখা হয়নি। লোকটার নাম মাইকেল গোমেজ। স্বল্প শিক্ষিত। বর্ণনা দিয়েছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে কীভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর রক নামের এক দস্যু জাহাজের সঙ্গে লড়ে তারা।

ওই ইতিহাস ভাল করেই জানে আহমেদ। ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড লিখেছিলেন কীভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয় আমেরিকান ফ্রিগেট। তবে জলদস্যু জাহাজের সঙ্গে কীভাবে লড়াই হয়, তাঁর লেখায় কিছুই নেই। অবশ্য ওই যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় ওয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে। সেটা লেখেন ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টস।

চিঠি পড়তে পড়তে আহমেদের মনে হলো বারুদের গন্ধ এসে লাগছে নাকে। চিৎকার করে উঠছে আহত সৈনিকরা। তারপর দস্যু জাহাজের পাশে ভিড়ল রণতরী সিগনাল।

চিঠিতে অ্যাডমিরাল রবার্টসের কাছে গোমেজ জানতে চেয়েছে ব্রিগের সেকেণ্ড ইন-কমাণ্ড জেফ মার্টেলের ভাগ্যে কী ঘটে। জলদস্যু তরীতে লাফিয়ে নামেন লেফটেন্যাণ্ট মার্টেল, তারপর গর্জে ওঠে দস্যুদের কামান। আগের চিঠিগুলো পড়ে আহমেদ ভেবেছিল, সে সময় মারা পড়েন মার্টেল। কারণ, তাঁর জন্য মুক্তিপণ দাবি করেনি দস্যুরা।

চিঠি পড়ে চলেছে আহমেদ, কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল ভুল ভেবেছিল সে। গোমেজ দেখতে পায় জলদস্যু তরীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে লড়ছেন মার্টেল। তারপর দু'জনেই রেলিং টপকে পড়ে যান সাগরে।

'...তারপর আর মিস্টার মার্টেল বা ইউনুস আল-কবিরকে দেখতে পাইনি...'

জলদস্যু জাহাজের বর্ণনা পড়ছে আহমেদ। তবে ওকে কাঁপিয়ে দিল ইউনুস আল-কবির নামটা। বর্তমান বিশ্বে এই নাম আবারও উচ্চারিত হচ্ছে। অতীতের সেই দস্যু নয়, এ নতুন কেউ। শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে পৃথিবী জুড়ে জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে লোকটা। গত কয়েক বছরে অন্যতম ওয়ান্টেড হয়ে উঠেছে।

নব্য ইউনুস আল-কবির কিছু ভিডিও ছেড়েছে। তাতে দেখা যায় এক লোক তলোয়ার উঁচু করে কেটে ফেলছে শ্বেতাঙ্গদের গর্দান।

এই লোকের নির্দেশে মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান জুড়ে অসংখ্য আত্মঘাতী বোমার হামলা চলছে। তার সেরা কীর্তি আফগান সীমান্তে এক পাকিস্তানী আর্মি পোস্টে আক্রমণ। ওতে মারা পড়ে দেড় শ' সৈনিক।

এই একই লোক বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের মৌলবাদী জঙ্গিদের দিচ্ছে বিপুল টাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র।

চিঠিগুলো ঘেঁটে রবার্টসের জবাব খুঁজতে চাইল আহমেদ। এবং পেয়েও গেল। ভদ্রলোক সব গুছিয়ে রাখতেন। পরের চিঠি মাইকেল গোমেজের উদ্দেশে। রবার্টস কী লিখেছেন পড়তে শুরু করল আহমেদ। দ্বিতীয়বার পড়তে হলো। বিস্মিত হয়ে উঠেছে। আস্তে করে হেলান দিয়ে বসল সিটে।

চিঠির তৎকালীন পরিস্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতির কোনও মিল আছে কি না, বুঝতে চাইছে। আস্তে করে মাথা নাড়ল। কোনও মিল না থাকারই কথা।

অন্য চিঠি হাতে নেবে, কিন্তু তা না করে আবারও আগের চিঠিটা পড়ল। নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এই চিঠির গুরুত্ব

আমেরিকান সরকারের কাছে অনেক। এ থেকে সুবিধা পাবে তারা। কিন্তু আমেরিকান সরকারের হাতে চিঠি না দিয়ে ভাল হয় না বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দিলে?

এ ধরনের তথ্য পেলে প্রিয় বন্ধু কমপিউটার বিশেষজ্ঞ রশিদ রায়হানের সঙ্গে আলাপ করে সে, নিজেই চলে যায় রানা এজেন্সিতে। কিন্তু বন্ধু এখন জরুরি কাজে দেশের বাইরে। তা ছাড়া, এ চিঠি রানা এজেন্সির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আসলে দিতে হবে বাংলাদেশ সরকারের উপযুক্ত কোনও অফিসারের হাতে।

গত কয়েক বছরে আহমেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাংলাদেশি অনেকের সঙ্গে। আর সে-কারণে মনে পড়ল চিঠিটা কাকে দেয়া যায়।

মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল আহমেদ, অপেক্ষা করছে।

'হ্যালো?' ওপাশ থেকে ভেসে এল মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

ডিরেক্ট লাইনে যোগাযোগ করেছে বলে জুনিয়র অফিসারদের মাধ্যমে লাইন পেতে হলো না আহমেদকে। 'হাই, কৃষ্ণা। আমি আহমেদ। মনে পড়ে সেই বিদীর্ণহৃদয় মানুষটাকে?'

'আহমেদ, তাই তো দেখছি!' বলল মেয়েটি। 'কিন্তু আমি যাকে চিনতাম সে গত সাত দিনে ফোন করেনি! ...তুমি কি ভূত?'

'বলতেও পারো। এই ভূত অপেক্ষা করছে তোমার অপূর্ব মুখটা দেখার জন্য।'

'মতলবটা কী তোমার? হঠাৎ অফিসে ফোন?'

'ওই যে বললাম, মোনালিসা টাইপের মুখ দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি।'

'কখন আসতে চাও?'

'যখন তুমি বলবে। তুমি বললে আমি পারি না এমন কিছু...'

উদাস ভঙ্গি নিয়ে থেমে গেল আহমেদ।

'সামাজিকতা রক্ষা করতে, নাকি কোনও কাজ?'

'দুটোই বলতে পারো।'

'আমি কিন্তু খুব ব্যস্ত। জানো তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতি-সংঘে এসেছেন? কাল আসছেন ওয়াশিংটনে।'

'আরে, সেজন্যেই তো আসতে চাই,' হালকা সুরে বলল আহমেদ। 'যা আনব তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ভদ্রমহিলার।'

'ঠাট্টা করছ?' একটু গম্ভীর হয়ে গেল কৃষ্ণা হায়দার।

'না। এমন একটা জিনিস পেয়েছি, যেটা আমি চাই সবার আগে তুমি দেখো।' জেমস রবার্টসের চিঠির বিষয়টা সংক্ষেপে বলল আহমেদ।

ওর কথা শেষে মাত্র একটা প্রশ্ন করল বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসার, 'আমার অফিসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'জ্যাম ঠেলে? ধরো দুই ঘণ্টা?'

'চলে এসো।' কেটে গেল লাইন।

চিঠিগুলো গুছিয়ে রেখে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল আহমেদ। গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল। গুনগুন করে গাইছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি...

তিন

টলমল করছে ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি। কিন্তু ওটার বুকে ভাসছে মস্ত এক বেমানান খুঁত। ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে পাঁচ শ' ষাট ফুটি বিতিকিচ্ছিরি এক ফ্রেইটার। মোটা

চিমনি থেকে ভকভক করে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। বহু পুরনো জাহাজ, অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে যৌবন। সোমালিয়ার উপকূল থেকে খানিক দূর দিয়ে চলছে মন্থর গতিতে।

সাগরে ডেবে রয়েছে খোল। ক্যাপ্টেন কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি, মুম্বাই বন্দর পেরুনোর পর তীরের পাশ দিয়ে ঘুরপথে যাচ্ছেন। নইলে সামুদ্রিক ঝড় এলে মস্ত বিপদে পড়বে সবাই। ডেক থেকে মাত্র চার ফুট নীচে সাগর। জাহাজটা বামপাশে কাত হয়ে পড়েছে। একটু জোরালো ঢেউ এলেই ডেকে উঠে আসছে পানি। অদক্ষ হাতে রং করা হয়েছে সবুজ খোলটা। তার উপর এখানে ওখানে নানা রঙের পোঁচ। স্কাপারগুলোর গায়ে মরিচার ছাপ। খোলের কয়েক জায়গায় ঝালাই করা ধাতব প্লেট।

আমিডশিপ থেকে খানিক পিছনে ফ্রেইটারের সুপারস্ট্রাকচার। সামনে তিনটে হোল্ড, পিছনে দুটো। বিশাল তিনটে ক্রেন, পুরু জঙে আচ্ছন্ন। একই অবস্থা কেবলগুলোরও। ডেকের উপর নানান জঞ্জাল। ফুটো হয়ে যাওয়া ব্যারেল, নষ্ট মেশিনারি থেকে শুরু করে ভাঙা একটা সাইকেল পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এক দিকের রেলিং মরিচা ধরে খসে পড়েছে। সে জায়গা নিয়েছে পুরু শিকল। ওদিক দিয়ে যে কেউ পড়ে যেতে পারে।

জাহাজের একটু দূর দিয়ে চলেছে একটা মাছ ধরা ট্রলার। ওটার ডেক থেকে পুরনো জাহাজের দিকে চেয়ে রয়েছে জেলেরা।

সোমালিয়ান ক্যাপ্টেনের দেহ দড়ির মত পাকানো, চেহারা ঠিক কুঠারের ফলার মত লম্বাটে। মুখ খুললে দেখা যায় মাঝের দুটো দাঁত নেই। অন্যগুলো পোকায় ধরা। কালো মাড়িতে ঘা। ব্রিজে সে ছাড়া আরও তিনজন দাঁড়িয়ে। এদের সঙ্গে আলাপ সেরে নিল ক্যাপ্টেন, তারপর টু ওয়ে ট্র্যান্সিভার থেকে তুলে নিল হ্যাণ্ড মাইক। সুইচ দাবিয়ে বিশ্রী সুরে ইংরেজি বলে উঠল, 'অ্যাহোয়, ফ্রেইটার।'

দুই সেকেণ্ড পর ছোট্ট স্পিকারে শোনা গেল কণ্ঠ: 'তোমরা কি আমার পোর্ট বিমের পাশের ওই ট্রলার?'

'হ্যাঁ। আমাদের ডাক্তার দরকার।' এক মুহূর্ত পর বলল সোমালিয়ান ক্যাপ্টেন, 'আমার চারজন লোক অসুস্থ। তোমাদের সঙ্গে ডাক্তার আছে?'

'আমাদের এক নাবিক নেভির মেইল-নার্স ছিল। তোমার লোকেদের কী হয়েছে?'

'আমরা বুঝব কী করে? আমরা তো ডাক্তার না।'

'কতটা অসুস্থ?' রেডিও অপারেটর জানতে চাইল।

'ক' দিন ধরে বমি করছে। মনে হয় পচা খাবার খেয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমরা বোধহয় ওদের সুস্থ করে তুলতে পারব। সুপারস্ট্রাকচারের পাশে ভিড়বে। যতটা পারা যায় গতি কমাব আমরা। তবে পুরোপুরি থামতে পারব না। কথা বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমরা থামবে না। ঠিক আছে।' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে শেয়ালের মত চতুর হাসি দিল লোকটা। সোমালিয়ান ভাষায় বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করেছে। তবে থামবে না। বোধহয় ভাবছে থামলে আর ইঞ্জিন চালু হবে না। রাসদি, স্টিয়ারিং হুইল ধরো। সুপারস্ট্রাকচারের পাশে ভিড়বে, সমান গতি তুলে এগুতে থাকবে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ।'

'তোমরা ডেকে বেরিয়ে যাও,' অন্য দু'জনকে নির্দেশ দিল গুলবুদ্দীন। হুইলহাউসের নীচে কেবিনের দিকে চাইল। ওখানে কর্কশ-নোংরা কম্বল কাঁধে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে চারজন। খুবই শীর্ণ, কাঁধের হাড়ে মাংস নেই বললেই চলে।

ষাট ফুটি ট্রলার থেকে বিশাল উঁচু দেখাল জাহাজটাকে। তবে ওটার ডেক পানি থেকে মাত্র চার ফুট উপরে। সহজেই রেলিং ধরতে পারবে সোমালিয়ানরা। তার উপর নাবিকরা জাহাজের

পাশে নামিয়ে দিয়েছে ট্রাকের চাকা। সংঘর্ষ হবে না দুই জলযানে। রেলিঙের একটা অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সহজেই অসুস্থদের তুলে নেবে। নাবিকদের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। প্রথম লোকটা বেঁটে। এশিয়ান। বোধহয় চিনা। পরনে ইউনিফর্ম শার্ট ও নীল প্যাণ্ট। কাঁধের এপিউলেট বলছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। দ্বিতীয়জন বিশাল, ছয়ফুটি এক মহিলা-দানব। অন্য দু'জন পুরুষ, কোন্ দেশি বোঝা গেল না।

'আপনিই ক্যাপ্টেন?' অফিসারের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন।

'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন গ্যাং ফেং।'

'সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। আমার লোক খুবই অসুস্থ। অথচ দেখুন ওদের কপাল, সাগরে মাছ ধরতে যেতেই হবে।'

'আমার কর্তব্য সাহায্য করা,' তাড়াহুড়ো করে বললেন ক্যাপ্টেন ফেং। 'জাহাজের পাশেই রেখো তোমাদের ট্রলার। চলেছি সুয়েজ খালের দিকে। তোমার লোকদের তীরে নামাতে গিয়ে সময় অপচয় করতে পারব না।'

'এ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না,' তেলতেলে হাসি দিল গুলবুদ্দীন। ট্রলারের দড়ি এগিয়ে দিল।

বিশালদেহী মহিলা দড়িটা নিয়ে রেলিঙে বেঁধে ফেলল।

'ঠিক আছে, তোমার লোকদের তুলে দাও,' বললেন ফেং।

নিজের এক লোককে ট্রলারের রেলিঙে উঠতে সাহায্য করল গুলবুদ্দীন। দুই জলযানের মাঝে মাত্র নয় ইঞ্চি ফাঁক। কেউ এত শান্ত সাগরে পা পিছলে পড়বে না। লোকটাকে ধরে নিয়ে ফ্রেইটারের ডেকে উঠে পড়ল গুলবুদ্দীন। একটু সরে দাঁড়াল। ওর পর জাহাজে উঠল আরও দুই অসুস্থ রোগী।

চতুর্থ লোকটা লাফিয়ে উঠবার পর সন্দেহের মধ্যে পড়লেন ক্যাপ্টেন ফেং। ঠিক করেছেন জানতে চাইবেন এদের কী ধরনের অসুস্থতা। কিন্তু মুখ খুলবার আগেই গা থেকে কম্বল ফেলে দিল

তারা। আর কম্বল সরে যেতেই দেখা গেল ওদের হাতে ধরা একে-৪৭। এবার গুলবুদ্দীনের ট্রলারে অন্য দুই সঙ্গী শাহিন ও হাকিম কাঠের সিন্দুক থেকে বের করল রাইফেল। ওগুলো হাতে নিয়ে উঠে এল জাহাজে।

'জলদস্যু!' ককিয়ে উঠলেন চিনা ক্যাপ্টেন। জবাবে তাঁর পেটে মেশিন পিস্তলের নল দিয়ে গুঁতো মারল গুলবুদ্দীন।

প্রায় ভাঁজ হয়ে গেলেন ফেং, ব্যথা সামলাতে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েছেন। অস্ত্রের মুখে নাবিকদের রেলিং থেকে সরিয়ে নিল গুলবুদ্দীনের লোক। কেউ উঁচু ব্রিজ উইঙে থাকতে পারে, কাজেই ওদিকে নজর রেখেছে একজন।

কিন্তু ওখানে কেউ নেই।

গুলবুদ্দীন একহাতে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যাপ্টেনকে, আরেক হাতে কণ্ঠার উপর ধরল পিস্তলের নল। 'যা বলব ঠিক তা-ই করবেন, তা হলে কারও ক্ষতি করব না।'

ক্যাপ্টেনের চোখে ফুটে উঠল প্রবল প্রতিবাদ, তবে তা মুহূর্তের জন্য। তারপর নিস্পৃহ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। কিছুই খেয়াল করেনি জলদস্যু নেতা, ঘাড় কাত করে ইশারা করল।

'আপনি রেডিও রুমে চলুন। ওখানে একটা ঘোষণা দেবেন, সবাই যেন মেস হলে চলে আসে। উপস্থিত হতে হবে সবাইকে। পরে যদি কাউকে জাহাজে ঘুরঘুর করতে দেখি, বিনা দ্বিধায় গুলি করব।'

গুলবুদ্দীনের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্লাস্টিকের ফিতা দিয়ে ক্রুদের হাত বেঁধে ফেলেছে তার লোক। প্রকাণ্ড মহিলার বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নেয়নি, ব্যবহার করেছে তিনটি ফিতা।

ক্রুদের দায়িত্ব নিয়েছে শাহিন ও আলীম। অন্য চার অসুস্থ জেলে ঢুকে পড়েছে সুপারস্ট্রাকচারে। ক্যাপ্টেন ফেং-এর পিঠে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে এগুতে বলল গুলবুদ্দীন। জাহাজের ভিতর

অংশের তাপ মাত্র কয়েক ডিগ্রি কম। এয়ার-কণ্ডিশনার ঠিক কাজ করছে না। হল ও প্যাসেজওয়ে বহুদিন পরিষ্কার হয়নি। ফেটে গেছে লিনোলিয়াম মেঝে, উঠে আসছে চল্টা। প্রতি কোণে পাওয়া গেল ফুটবলের মত গোল ঝুল।

পুরো এক মিনিট লাগল না সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে উঠতে। ভিতরে কাঠের বড় হুইলের সামনে এক হেলমসম্যান। আরেক অফিসার ঝুঁকে পড়েছে চার্ট টেবিলের উপর। পাশে কয়েকটা এঁটো বাসন। চার্ট এতই পুরনো, মনে হয় ওটা প্যানজিয়ারের উপকূল। জানালাগুলো নীলচে হয়ে উঠেছে সামুদ্রিক লবণে।

'জেলেরা কী বলছে?' চার্ট থেকে মুখ না তুলে জানতে চাইল তরুণ অফিসার। কোনও জবাব এল না দেখে মাথা তুলল, পরক্ষণে বিস্ফারিত হলো দুই চোখ।

রাইফেল হাতে পুরো ঘর কাভার করছে দুই জলদস্যু। ক্যাপ্টেনের মাথা কাত হয়ে আছে। ঘাড়ের উপর ঠেসে ধরা হয়েছে পিস্তলের মাযল।

'কোনও সাহস দেখাতে যেয়ো না, মিস্টার কাশেম,' নরম স্বরে সাবধান করলেন ক্যাপ্টেন ফেং। 'এরা বলেছে নির্দেশ মত চললে কারও ক্ষতি করবে না। চালু করো শিপওয়াইড চ্যানেল।'

'আই, ক্যাপ্টেন।' ঝুঁকে ইণ্টারকমের বাটন টিপল অফিসার। একটু একটু করে সরে আসছে। মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেনের দিকে।

ফেং-এর উদ্দেশে বলল গুলবুদ্দীন, 'কাউকে সাবধান করলে খুন হয়ে যাবেন নিজেই। আপনার একটা লোকও বাঁচবে না।'

'আমি কোনও ঝুঁকি নেব না,' মাইকের সুইচ না টিপে কাঁপা স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন। এবার সুইচ অন করে লাউড স্পিকারে জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন বাণী: 'ক্যাপ্টেন বলছি। আপনারা এক্ষুণি চলে আসুন মেস হলে। এটা জরুরি মিটিং।

ডিউটিতে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদেরকেও আসতে হবে। আবারও বলছি জরুরি মিটিং। যে যেখানে আছেন, চলে আসুন মেস হলে।'

'যথেষ্ট,' ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোন কেড়ে নিল গুলবুদ্দীন। 'মোক্তার, হুইল বুঝে নাও।' অফিসার ও হেলমসম্যানের দিকে পিস্তলের ইশারা করল সে। 'অ্যাই, তোমরা ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়াও।'

'মাত্র একজন লোক হেলমস সামলাতে পারবে না,' প্রতিবাদ করলেন ফেং।

'আমরা আগেও এরকম ঝক্কড়ে জাহাজ চালিয়েছি।'

'হতে পারে।'

বহুদিন হলো সোমালিয়া শাসন করছে না কোনও সরকার। কয়েকজন ওয়ার লর্ড মিলে ভাগ করে নিয়েছে দেশটাকে। নিজেদের ভিতর প্রচণ্ড বিরোধ। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সেনাবাহিনী। এবং এসব ওয়ার লর্ডের কেউ কেউ সেনাবাহিনী পুষতে গিয়ে শুরু করেছে জলদস্যুতা। এদের কারণে হর্ন অভ আফ্রিকার চারপাশের পানি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমেরিকা ও আরও কিছু দেশ তাদের নেভি রেখেছে এদিকে। কিন্তু ক'দিন পর পর ছিনতাই হচ্ছে জাহাজ। এত বিস্তৃত সাগরে পাহারা দেয়া অসম্ভব। তার উপর সোমালিয়ান জলদস্যুরা জাহাজে উঠবার জন্য ব্যবহার করছে স্পিড-বোট। আগে জাহাজ থেকে নগদ টাকা ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যেত, কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো তারা গোটা জাহাজ হাইজ্যাক করছে। কার্গোগুলো স্থান পাচ্ছে কালোবাজারে। বেশিরভাগ সময় ক্রুদের নামিয়ে দেয়া হচ্ছে লাইফবোটে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে জাহাজের মালিকের কাছ থেকে। মুক্তিপণ না দিলে খুন হচ্ছে ক্রুরা।

ক'দিন পর পর বড় জাহাজ হাইজ্যাক করছে সোমালিয়ানরা। আগে শুধু উপকূলবর্তী ফ্রেইটারে হামলা চলত, কিন্তু এখন ট্যাঙ্কার

বা কণ্টেইনারশিপও বাদ পড়ছে না। এক সপ্তাহ আগে একটা ক্রুজ লাইনারের উপর পনেরো মিনিট গুলিবর্ষণ করা হয়। সবাই জানে ইদানীং এক ওয়ার লর্ড উত্তর-উপকূলের সমস্ত জলদস্যুদের একত্র করে মস্ত দল তৈরি করেছে। আশপাশের সবাই মেনেও নিয়েছে তার নেতৃত্ব।

এ দলের সর্বোচ্চ নেতা দালমার আলী। মধ্য নব্বুই-এর দিকে সে ছিল রাজধানী মোগাদিশুর এক সাধারণ সৈনিক। তখন ইউএন চেষ্টা করছে সেদেশের মহামারীতে আক্রান্ত ক্ষুধার্ত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখতে। সে সময় দালমার আলী নাম কিনল একের পর এক ইউএন ট্রাক লুঠ করে। সেসব ইমার্জেন্সি ফুড চলে গেল তার পকেটে। তারপর এক ভোরে আমেরিকান একটা পজিশনে হামলা করল দালমার আলী, আরপিজি দিয়ে উড়িয়ে দিল হামভি। বিধ্বস্ত যান থেকে টেনে বের করল মৃত-অর্ধমৃত সবাইকে, টুকরো টুকরো করে ফেলল ম্যাসেটি দিয়ে কুপিয়ে।

এরপর ভয় পেয়ে মেরিনদের প্রত্যাহার করতে শুরু করল আমেরিকান সরকার। তখন থেকে দলবল তৈরির চেষ্টা করছে দালমার আলী। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের চার ভাগের এক ভাগ দখল করে নিল এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দস্যু। উনিশ শ' আটানব্বুই-এ যখন কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় আমেরিকান এম্বেসিতে বোমা মারল আল-কায়েদা, সেই সময়ে দালমার আলী ওই বোমারুদেরকে লুকিয়ে রাখে দু'মাস। এর ফলে তার মাথার জন্য আড়াই লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে হেগের বিশ্ব আদালত। দালমার ভাল করেই জানে তার সময় ফুরিয়ে আসছে, শীঘ্রিই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ওই পুরস্কার পাওয়ার চেষ্টা করবে। এবং এটা জানে বলেই মোগাদিশু থেকে নিজ কার্যক্রম সরিয়ে নিয়েছে, চলে এসেছে তিন শ' মাইল উত্তরে, উপকূল ঘেঁষা জলাভূমির ভিতর।

প্রচার করা হলো: ওই এলাকায় এসে জলদস্যুদের কাছ থেকে

বন্দিদের ছুটিয়ে নিয়েছে দালমার আলী, মুক্ত করে দিয়েছে মানুষগুলোকে। তবে সত্য কথা হচ্ছে: এর পর থেকে যত লোক বন্দি হয়েছে, তাদের জন্য নিজেই মুক্তিপণ চেয়েছে সে। কোনও দেশ বা জাহাজ-কোম্পানি মুক্তিপণ না দিলে, বা বেশি দরদাম করলে দেরি না করে মেরে ফেলা হয় মানুষগুলোকে। শোনা যায় দালমারের কণ্ঠ থেকে ঝুলছে সোনা দিয়ে ফিলিং করা দাঁতের বড়সড় নেকলেস। ওই লোকগুলোকে নিজ হাতে খুন করেছে সে।

আজকের এই পুরনো ফ্রেইটারটা দখল করেছে সেই কুখ্যাত দালমার আলীর স্যাঙাতরাই।

ক্যাপ্টেন ফেংকে তার অফিসে ঢুকতে বাধ্য করল গুলবুদ্দীন ও তার এক লোক। এদিকে ব্রিজের অফিসার ও হেলমসম্যানকে মেস হলে নিয়ে গেল আরেক জলদস্যু। ক্যাপ্টেন ফেং-এর অফিস ও কেবিন পাইলটহাউসের এক ডেক নীচে। ঘরদুটো পরিষ্কার। দেয়ালে ঝুলছে দুটো ছবি, এ ছাড়া ধাতব দেয়াল ফাঁকা। টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে ক্যাপ্টেন ফেং ও এক বয়স্কা মহিলা। ক্যাপ্টেনের মা হতে পারেন হয়তো।

একমাত্র পোর্টহোল থেকে আসছে উজ্জ্বল আলো।

'ক্রুদের ম্যানিফেস্ট দেখি,' হুকুমের সুরে বলল গুলবুদ্দীন।

ক্যাপ্টেনের ডেস্কের পাশে ছোট সেফ। ওটার উপর ঝুঁকে পড়লেন ফেং, কমবিনেশন মিলিয়ে তালা খুলছেন।

'তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসবেন,' নির্দেশ দিল জলদস্যু নেতা।

কাঁধের উপর দিয়ে তার দিকে চাইলেন ফেং। 'শপথ করে বলতে পারি এখানে কোনও অস্ত্র নেই।' বললেন বটে, তবে নির্দেশ মেনে তালা খুলেই পিছিয়ে গেলেন।

গুলবুদ্দীনের সঙ্গী একে-৪৭ বাগিয়ে ধরেছে ক্যাপ্টেনের বুকে। এবার গুলবুদ্দীন ঝুঁকে পড়ল সিন্দুকের উপর। ফাইল ও ফোল্ডার

বের করে ধপাধপ্ করে নামিয়ে রাখল ক্যাপ্টেনের ডেস্কের উপর। শিস দিয়ে উঠল পুরু খাম দেখে। দেরি না করে খুলে ফেলল, বেরিয়ে এল কয়েক দেশের মুদ্রা। নাকের নীচে ধরল এক শ' ডলারের তোড়া। বড় করে শ্বাস নিল, ভাব দেখে মনে হলো সেরা ওয়াইনের সুবাস পেয়েছে।

'এখানে কত আছে, ক্যাপ্টেন?'

'বারো হাজার ডলার। একটু কমও থাকতে পারে।'

এনভেলপটা শার্টের পকেটে রেখে দিল গুলবুদ্দীন। এবার কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত পর পেল ক্রুদের ম্যানিফেস্ট। সোমালিয়ান ভাষাও পড়তে পারে না সে, ইংরেজি তো দূরের কথা। তবে পাসপোর্টগুলো থেকে চিনতে পারছে কে কোন্ দেশের। সব মিলে ক্রু রয়েছে তেইশজন। প্রতিটি পাসপোর্ট ঘেঁটে দেখল সে। ক্যাপ্টেন ফেং, অফিসার কাশেম, হেলমসম্যান ও ডেকের কয়েকজনকে ভাল করেই চিনল। খুশি হয়ে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্রুদের চার ভাগের এক ভাগ ক্রু এরইমধ্যে হাতের মুঠোর ভিতর চলে এসেছে।

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। এবার মেস হলে চলুন।'

পাঁচ মিনিট পর মেস হলে পৌঁছে গেল তারা। ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি। গিজগিজ করছে লোক। কেউ কেউ ধূমপান করছে। বাতাসে ঘন ধোঁয়া। হয়তো ওটার কারণেই ঘামের গন্ধ পাওয়া গেল না। উত্তেজনা ও ভয়ের কারণে দরদর করে ঘামছে সবাই। হতক্লান্ত চেহারার একটা দল। এদের কপাল মন্দ যে ভাল কোনও জাহাজে স্থান মেলেনি। তবে পুরনো জাহাজ মোটামুটি যত্নে রেখেছে, নইলে এ জিনিস এতদিনে ভেঙে ফেলা হতো। আর তা হলে চাকরি থাকত না তাদের।

ক্যাপ্টেন ফেং-এর এক ক্রুর মাথার পিছনে রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজ। নিশ্চয়ই কিছু বলেছে, বা কিছু করতে গিয়েছিল, যে

কারণে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জলদস্যুরা।

'কী হয়েছে, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। জাম্প সুটে লেগে রয়েছে গ্রিজ।

'আপনার কী মনে হয়?' ভুরু নাচালেন ফেং, তারপর বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, জাহাজে জলদস্যু উঠেছে।'

'একদম চুপ!' ধমকে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে পাসপোর্টগুলো নিয়ে এসেছে। একটা একটা করে ছবি মিলিয়ে দেখতে লাগল। একবার এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিশ্বাস করে মস্ত ভুল করেছিল সে, ওই লোকের দু'জন ক্রু জাহাজে লুকিয়ে ছিল। গুলবুদ্দীনের এক লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে তারা, রেডিও রুমে গিয়ে মে-ডে প্রচার করে, তারপর ধরা পড়ে।

'গুড। কেউ হিরো সাজতে চেষ্টা করেনি।' পাসপোর্টগুলো পাশে রাখল গুলবুদ্দীন, চোখ বুলিয়ে নিল সবার উপর। ভীত মানুষ দেখলেই চিনতে পারে সে, এবং তাতে খুশি হয়। সন্দেহ নেই এই জাহাজের ক্রুরা তীব্র আতঙ্কের ভিতর আছে। নিজের এক লোককে ডেকে পাঠিয়ে দিল গুলবুদ্দীন। সে লোক গিয়ে রাসদিকে বলবে ট্রলার সরিয়ে নিতে। সোজা বেসে ফিরবে রাসদি, সর্বোচ্চ নেতাকে জানিয়ে দেবে ওরা একটা ফ্রেইটার দখল করেছে। 'আমার নাম গুলবুদ্দীন হেকমত, আর এই জাহাজ এখন থেকে আমার। তোমরা যদি আমার নির্দেশ মত চলো, তোমাদেরকে খুন করব না। যদি পালাতে চেষ্টা করো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারব। হাঙরের মুখে ফেলে দেয়া হবে লাশ। সবসময় এই দুটো বিষয় মাথার ভিতর রাখবে।'

'আমার লোক নির্দেশ মত চলবে,' ক্লান্ত স্বরে বললেন ফেং। 'আপনি যা বলবেন তাই মানব। আমরা সবাই যার যার ঘরে পরিবারের কাছে ফিরতে চাই।'

'খুবই ভাল বলেছেন, ক্যাপ্টেন। আপনার সাহায্য নিয়ে

জাহাজের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারা মুক্তিপণ দিলেই মুক্তি পাবেন।'

'ওই হারামজাদারা এক গ্যালন রংও খরচ করে না,' ফিসফিস করে পাশেরজনকে বললেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'ওরা আমাদের জন্য একটা পয়সা খরচ করবে না।'

দুই জলদস্যু চলে গেছে কিচেনে। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে পারে এমন সব সরিয়ে ফেলছে। একটু পর সুতির ব্যাগ ভরা স্টেকের ছোরা, কিচেন ছুরি ও কাঁটা-চামচ নিয়ে ফিরল। এরপর গুলবুদ্দীন ছাড়া মেস হল-এ রইল শুধু একজন সশস্ত্র দস্যু। অন্যরা হলওয়েতে বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়েছে ছুরির ব্যাগ, ফেলে দেবে সাগরে।

'ওরা জানে কী করতে হবে,' ফিসফিস করে রেডিও অপারেটরকে বলল কাশেম। 'ভাবছি ওদের লোক কমলে একটা ছুরি নিয়ে...'

তরুণ অফিসার জানে না তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দস্যু। দেরি করল না সে, একে-৪৭-এর বাঁট পড়ল কাশেমের ঘাড়ে। ঠাস্ করে নাকমুখ বাড়ি খেল ফরমাইকা লাগানো টেবিলের উপর। কয়েক মুহূর্ত পর সিধে হলো অফিসার, নাক থেকে দরদর করে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত।

'আবার কথা বললে স্রেফ খুন করে ফেলব,' ধমক দিল গুলবুদ্দীন। কণ্ঠস্বর বলে দিল মিথ্যা বলছে না। 'মেস হলের পাশে বাথরুম দেখছি। দরকার পড়লে ব্যবহার করবেন। আপনারা এখানেই থাকছেন। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেব। সর্বক্ষণ পাহারা থাকবে।' এবার নিজ দলের জন্য সোমালিয়ান বলে উঠল, 'চলো, দেখা যাক কার্গো হিসাবে কী এনেছে আমাদের জন্য।'

একটা লাইন তৈরি করে মেস হলের বাইরে অপেক্ষা করছে দস্যুরা। বাইরে থেকে আটকে দেয়া হলো দরজা। একটা তার

দিয়ে হ্যাণ্ডেলে প্যাঁচ মেরে, অপর অংশ পেঁচিয়ে দেয়া হলো প্যাসেজওয়েয়ের উল্টোদিকের রেলিঙে। এবার আর ভিতর থেকে দরজা খোলা সম্ভব হবে না। গুলবুদ্দীন দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে বলল তার এক লোককে। অন্যরা নিয়ম মেনে জাহাজ তল্লাসী করতে চলল।

এ জাহাজ বড়, কিন্তু বাইরের আকৃতির তুলনায় ভিতর অংশে জায়গা কম। কিছুক্ষণ থাকলে হাঁফ ধরে যায় বুকে। আগে যা ধারণা করেছিল গুলবুদ্দীন, সে তুলনায় জাহাজের হোল্ড অনেক ছোট। পিছনের দুই হোল্ডে ঠেসে রাখা হয়েছে শিপিং কন্টেইনার। সবচেয়ে চিকন দস্যু চাইলেও দুই সারি বাক্সের মাঝ দিয়ে যেতে পারবে না। নিজেদের নিরাপদ বন্দরে না পৌঁছুনো পর্যন্ত বুঝবার উপায় নেই কন্টেইনারগুলোর ভিতর কী। তবে সামনের তিন হোল্ডে যা পাওয়া গেল, তাতেই খুশি হয়ে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্রেট্ ভরা যন্ত্রপাতি, ইণ্ডিয়ান গাড়ির ইঞ্জিন, লোহার চারকোনা পাত ও ছয়টি পিকআপ ট্রাক। শেষের জিনিসগুলোর ছাতের উপর মেশিনগান বসিয়ে নিলে রীতিমত যুদ্ধযান হয়ে উঠবে। আফ্রিকায় ওটাকে বলে টেকনিকাল্স্। শুধু এগুলো নয়, বড় একটা ট্রাকও রয়েছে। তবে ওটা এত পুরনো যে মনে হয় না চলবে। জাহাজে আরও রয়েছে স্টেনসিল করা পেট মোটা ছালা। এক নামকরা এনজিও গম পাঠাচ্ছে সুদানে। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার এক শ' ড্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। সার হিসাবে ভাল কাজ করে, তবে ওই নাইট্রেট কম্পাউণ্ডের সঙ্গে ডিজেল মেশালে তৈরি হয় শক্তিশালী বিস্ফোরক। এ জাহাজের সামনের হোল্ডে যে পরিমাণ আছে, অর্ধেক মোগাদিশু উড়িয়ে দিতে পারবে দালমার আলী।

গুলবুদ্দীন ভাল করে জানে চির দিনের জন্য জলাভূমিতে পড়ে থাকবে না তার নেতা। প্রায়ই বলে আবার রাজধানীতে ফিরবে সে, অন্যান্য ওয়ার লর্ডের বিরুদ্ধে শেষবারের মত লড়বে। আর

এখন এসব বিস্ফোরক পেয়ে যাওয়ায় অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে পৌঁছে গেছে দালমার। গুলবুদ্দীনের মনে সন্দেহ নেই, আজ হোক বা এক মাস পর হোক, পুরো সোমালিয়া দখল করে নেবে তার নেতা। মনে মনে হাসল গুলবুদ্দীন। এই ফ্রেইটার দখল করেছে বলে সে নিজে পাবে অচিন্ত্যনীয় সম্মান ও বিপুল সম্পদ। বলা যায় না, দালমার হয়তো প্রধানমন্ত্রী করে দেবে তাকে।

একটু মন খারাপ করল গুলবুদ্দীন। রাসদিকে আগেই খবর দিতে পাঠানোটা ঠিক হলো না। কিন্তু এখন আর ভেবে কী হবে! ওদের সঙ্গের রেডিও বড়জোর দুই মাইল পর্যন্ত যোগাযোগ করবে। এদিকে ট্রলার চলে গেছে রেঞ্জের অনেক বাইরে।

হোল্ড থেকে বেরিয়ে ব্রিজে চলে এল গুলবুদ্দীন, ক্যাপ্টেনের কেবিনে পাওয়া কিউবান চুরুট ধরিয়ে চারপাশে চাইল। দিগন্তে ঝুলছে অস্তায়মান সূর্য। সেই আলোয় ব্রোঞ্জের মত হয়ে উঠেছে পান্না-সবুজ সাগর। গুলবুদ্দীন বা তার মত দস্যুদের চোখে সন্ধ্যার কোনও বাড়তি সৌন্দর্য নেই। এ ধরনের লোক বেঁচে থাকে নোংরা এক পরিবেশে। কী পাবে সেটা মেপে প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়। হয়তো কেউ বলতে পারে, এ ধরনের লোক তৈরি হয়েছে সোমালিয়ার যুদ্ধাবস্থার কারণে। এ মানুষগুলো ভাল পরিবেশে বাঁচবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। সত্যি হচ্ছে: সোমালিয়ার বেশিরভাগ লোক জীবনে কখনও কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেনি। কিন্তু গুলবুদ্দীনের মত যারা দালমার আলীদের মদত দিয়ে চলেছে, তারা এসব করছে ক্ষমতা পাওয়ার আশায়, সবার উপর ছড়ি ঘোরাবার জন্য। যেমন, এ জাহাজের সবার জীবন নিয়ে যেমন খুশি খেলছে তারা।

ক্যাপ্টেনের মাথা নিচু হতে দেখে ভাল লেগেছে গুলবুদ্দীনের। নাবিকদের চোখে যে ভয় দেখেছে, তাতে নিজেকে মনে হয়েছে ক্ষমতাশালী। ক্যাপ্টেনের কেবিনে বয়স্কা এক মহিলার ছবি, ইচ্ছা

করলে ওই মহিলার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে সে। কথাটা ভাবলে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে হয়। সে যে অবস্থানে রয়েছে, সেখানে কোনও তাড়াহুড়ো করতে হয় না তাকে।

শাহিন ও হাকিম ব্রিজে এসে ঢুকেছে। পছন্দ মত পোশাক পরে নিয়েছে অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে। শাহিনের বয়স মাত্র চব্বিশ, কিন্তু এরইমধ্যে বারোটা জাহাজ হাইজ্যাক করে ফেলেছে। চিকন ধরনের লোক সে, জিন্স পরবার জন্য বেল্টে নতুন গর্ত করতে হয়েছে। আর হাকিমের বয়স পঁয়তাল্লিশ মত। সে দালমার আলীর পাশে থেকে আমেরিকান মেরিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একবার ভিন্ন এক দলের বিরুদ্ধে ছোরা লড়াইয়ে তার বাম গালের মাংস খুবলে যায়। এর পর থেকে চুপ মেরে যায়। কম কথা বলে, এবং যখন বলে, তার বেশিরভাগ বোঝা যায় না। তবে গুলবুদ্দীনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করে সে। গুলবুদ্দীন এর বেশি কিছু চায় না তার কাছে।

'যাও, ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এসো। তার কাছ থেকে জানতে হবে এ জাহাজের মালিক কোম্পানি কত টাকা দিতে পারে।' শাহিনের চোখের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। 'আরেকটা কথা, বাড়ি ফেরা পর্যন্ত গাঁজা টানবে না বলে দিচ্ছি, খবরদার!'

দুই জলদস্যু সিঁড়ি বেয়ে প্রধান ডেকে নেমে গেল। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোয় ভুতুড়ে লাগছে জাহাজটাকে। দ্রুত নেমে আসছে ছায়া। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর জ্বলছে কয়েকটা আলো। সে আভায় বেশি দূর দেখা যায় না। প্রহরীকে দরজায় বাঁধা তারটা খুলতে বলল শাহিন। সে ও হাকিম দু'হাতে বাগিয়ে ধরল অস্ত্র। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা।

হাঁ হয়ে গেল তিন জলদস্যু!

কেউ নেই হলঘরে।

চার

দরজা ঠেলে মেস হলের ভিতর ঢুকল শাহিন ও হাকিম। প্রহরীর মনে হলো করিডোরের দূরে কে যেন! অন্ধকারে চেয়ে রইল সে। কাঁধে তুলেছে রাইফেল। ক্রুরা গায়েব না হলে ভয় পেত না, গিয়ে দেখত প্যাসেজওয়ের ওদিকে কী। কিন্তু এখন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তার উত্তেজিত স্নায়ু। ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরল তর্জনী, বারোটা গুলি ছুটে গেল করিডোর ধরে। একে-৪৭-এর আগুনের ঝিলিকে পরিষ্কার দেখা গেল, করিডোর ফাঁকা। কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, শুধু নোংরা দেয়াল থেকে খসে পড়েছে আরও রং।

'কী হলো?' জানতে চাইল শাহিন।

'আমার মনে হলো কে যেন...' থমকে থমকে বলল প্রহরী।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল শাহিন। 'হাকিম, তুমি ওর সঙ্গে গিয়ে ডেক খুঁজে দেখো। আমি গুলবুদ্দীনকে জানাচ্ছি কী ঘটেছে এখানে।'

গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে গুলবুদ্দীন। শাহিনের সঙ্গে তার দেখা হলো মাঝ পথে। সিনেমার নায়কের মত পিস্তলটা কাত করে বাড়িয়ে ধরেছে। চোখ জ্বলছে রাগে।

'কে গুলি করল? এবং কেন?' হাঁটবার গতি কমল না গুলবুদ্দীনের। বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে পিছাতে শুরু করল শাহিন।

'মেস হল ফাঁকা—কেউ নেই। খালিক নাকি ছায়া মত কী যেন দেখেছে। হাকিম আর খালিক এখন ডেক দেখতে গেছে।'

গুলবুদ্দীনের মনে হলো ভুল শুনছে। 'মেস হল খালি মানে?'

'ক্রুরা গায়েব। রেলিং আর দরজার হ্যাণ্ডেলে তার লাগানো

ছিল। জেগে ছিল খালিক। কিন্তু লোকগুলো কীভাবে যেন গায়েব হয়ে গেছে!'

করিডোর পেরিয়ে মেস হলের দরজার সামনে পৌঁছে গেল দুই দস্যু। কপাট এখনও সামান্য ফাঁক করা। গায়ের জোরে লাথি দিয়ে গুলবুদ্দীন খুলল দরজা। ডোরস্টপে লেগে বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হলো চারপাশ থরথর করে কাঁপছে। গুলবুদ্দীন এক ঘণ্টা আগে দেখে গেছে এ ঘরে তেইশজন ছিল। এখনও ঠিক তা-ই আছে! এক এক করে গুনল গুলবুদ্দীন। একজনও বাদ পড়েনি। লোকগুলো উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত।

'গুলি কীসের?' নরম স্বরে জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন ফেং।

সঙ্গীর উপর খুনিদৃষ্টি ফেলল গুলবুদ্দীন। 'ইঁদুর মারা হয়েছে।' খপ করে শাহিনের বাহু ধরল, ঘর থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে এল। পিছনে দরজা বন্ধ হতেই সপাটে দুটো চড় লাগিয়ে দিল দুই গালে। 'আবার নেশা করেছ! ...এখন কী দেখলে?'

'না, গুলবুদ্দীন। শপথ করে বলতে পারি। আমরা সবাই দেখেছি...'

'যথেষ্ট শুনেছি! আবার যদি দেখি আমার কোনও কাজে গাঁজা টেনেছ, এক গুলিতে খতম করব। কুত্তার বাচ্চা! কথা মাথার ভিতর ঢুকেছে?' শাহিনের চোখ পায়ের আঙুল গুনছে। কোনও জবাব দিল না। খপ করে তার চোয়াল ধরল গুলবুদ্দীন, চোখে চোখ রাখল। 'বুঝতে পেরেছিস?'

'হ্যাঁ, গুলবুদ্দীন।'

'দরজাটা আবারও বেঁধে ফ্যাল্। খুঁজে বের কর খালিক আর হাকিমকে। আমি চাই না আরও গুলি নষ্ট হোক।'

দরজা বন্ধ করে হুকুম পালন করতে রওনা হয়ে গেল শাহিন। করিডোরেই দাঁড়িয়ে রইল গুলবুদ্দীন। একবার কান পাতল পুরু ধাতব দরজার উপর। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। ফাঁকা

করিডোরের চারপাশ দেখে নিল। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো কেউ চোখ রাখছে তার উপর। ঘাড়ের কাছ থেকে শিরশির করে একটা অনুভূতি নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'শালারা, আমাকে ঘাবড়ে দিতে চায়! আমি শালা কি ওদের মত?'

•

জলদস্যুরা ভাবতেও পারবে না মেস হল-এর দুই ডেক নীচে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘর, সেখানে বসে সোমালিয়ান লোকটাকে শিউরে উঠতে দেখল মাসুদ রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। বিশাল ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লেতে পরিষ্কার দেখছে লোকটাকে।

নিচু ছাতের এ ঘরটার নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন্স সেন্টার। বললে ভুল হবে না, এটাই হাইটেক জাহাজের মগজ। ঘরে আবছা নীল আভা, চালু রয়েছে অসংখ্য কমপিউটার স্ক্রিন। মেঝে ঢেকে দেয়া হয়েছে অ্যান্টিস্কিড অ্যান্টিস্ট্যাটিক রাবার দিয়ে। হঠাৎ কেউ এ ঘর দেখলে ভাববে টেলিভিশনে দেখা স্টার-শিপ এন্টারপ্রাইজের ব্রিজ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। মেইন ডিসপ্লের সামনে দুটো চেয়ার। প্রথমটা হেলমসম্যানের জন্য। পাশেরটা ওয়েপন্স কন্ট্রোল। এ ছাড়া ঘরের চারপাশে রেডিও, সোনার, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ড্যামেজ কন্ট্রোল-এর প্রধানদের চেয়ার ও কন্সোল।

অপারেশন্স সেন্টারের মাঝামাঝি জায়গায় মাসুদ রানার চেয়ার, ওখানে বসলে চারপাশের সবই দেখা যায়। ওই চেয়ারের সঙ্গে ফিট করা কমপিউটারের সাহায্যে ঘরের যে-কোনও কন্সোল অপারেট করতে পারে রানা।

সুঠামদেহী যুবক মাসুদ রানা। বাঙালি। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। প্রথম দৃষ্টিতে ভয়ানক নিষ্ঠুর মনে হয়, আবার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় মায়াময় এক কোমলহৃদয়ের

মানুষ। কুচকুচে কালো দুটি চোখ সব দেখে, সব খেয়াল করে। ভিতরে কী যেন রয়েছে ওর, যে-কারও মনে হবে, ঠিক এই মানুষটাকেই খুঁজছে সে জীবনভর। এর উপর ভরসা রাখলে ঠকতে হবে না। খুব কম মানুষ জানে সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুঃসাহসী এক এজেন্ট। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও নিজ দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জান বাজি রেখে।

ওর পাশে বসেছে সোহেল আহমেদ, বিসিআই, অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি, দুর্ধর্ষ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। রানার প্রিয় বন্ধু। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। ওদেরকে পাঠানো হয়েছে একটি বিশেষ মিশন দিয়ে।

২০০৯-এর জুনের শেষে বাংলাদেশের পতাকাবাহী লায়নস হার্টের মালিকানাধীন একটি ফ্রেইটার এমভি জাহাঙ্গীর ৪৩,০০০ টন নিকেল ওর নিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে যাচ্ছিল গ্রিসের উদ্দেশে। ভারতের কোচি শহর থেকে আরব সাগর ধরে ৫০০ মাইল পশ্চিমে যেতেই অতর্কিত আক্রমণ করে জাহাজটা দখল করে নেয় একদল সশস্ত্র সোমালিয়ান জলদস্যু। পঁচিশজন ক্রুসহ জাহাজটা হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় তারা ১১০০ মাইল দূরে সোমালিয়ার উপকূলে। আত্মসমর্পণ না করে উপায় ছিল না বাঙালি ক্যাপ্টেন নাসিরুদ্দীন চাকলাদারের।

ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড এবং সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ের অ্যান্টি-পাইরেসি টিমের কাছে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ হয়নি। ক্রুদের দু'জনের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন। দস্যুদের কাছে আবেদন-নিবেদনে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর ২০০৯ সালের ২০ই সেপ্টেম্বর জাহাজের মালিকের কাছ থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ আদায় করে তারপর ছেড়ে দেয় তারা

এমভি জাহাঙ্গীরকে।

ওই বছর সোমালিয়ার জলদস্যুরা মোট ১২১টি জাহাজের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। কমা তো দূরের কথা, বাড়তে বাড়তে অসহ্য পর্যায়ে চলে যায় তাদের পাইরেসির মাত্রা।

উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ সরকার এই দস্যুতার একটা বিহিত করবার জন্য বিসিআই-চিফকে অনুরোধ করে। বলা হয় যেভাবে হোক সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

এরপর সোমালিয়ান দস্যুদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে ব্যাপারে বিসিআই অফিসে একটা জরুরি মিটিং হয়।

তারই বাস্তবায়নে গত ক'দিন হলো এ মিশনে এসেছে মার্ভেলের এই দলটি। সঙ্গে রয়েছে কোরিয়া, চিন, মালয়েশিয়ার কয়েকজন এজেন্টও। কারণ, বার বার তাদের জাহাজও আটক করে মুক্তিপণ আদায় করেছে এই দস্যুরা। আপাতত মার্ভেলের ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অভিনয় করছে চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের এক সুযোগ্য এজেন্ট।

গত কয়েকদিন যাবৎ সোমালিয়ার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে মার্ভেল। শেষে আজ জাহাজে এসে উঠেছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। আপাতত তাদের হাতে 'বন্দি' মার্ভেলের তেইশজন সদস্য। অথচ অপারেশন্স সেন্টারের কেউ বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নয়।

রানার বন্ধু লিউ ফু-চুং এ মিশনে নিজে আসতে না পারলেও পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের সিক্রেট সার্ভিসের অন্যতম সেরা একজন অপারেটরকে।

মার্ভেল জাহাজে ভারতীয় এজেন্ট অনিল চট্টোপাধ্যায় নেই। অন্য কাজে আটকা পড়েছে সে। স্ত্রীর বাচ্চা হবে, কাজেই আসেনি আতাসি। আসতে পারেনি ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইন্টেলিজেন্সের উর্বশী দাশাও। তবে সাগর চষে বেড়াবার সুযোগ হাতছাড়া করতে

রাজি হয়নি বন্ধু ভিনসেণ্ট গগল। চলে এসেছে রানার ডাক পেয়ে।

মার্ভেল জাহাজে রয়েছে বাংলাদেশের মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যাণ্ট সানজিদা স্বর্ণা, কমাণ্ডো কাশেম, জলিল, এজেন্ট রায়হান রশিদ, ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে লিয়েন-এ আসা কয়েকজন তরুণ যোদ্ধা। হল্যাণ্ডের ফারা রাইনারও ডাক্তার হিসাবে এসেছে।

আরেকটু আগে থেকে বলা যাক।

আজ থেকে পাঁচ মাস আগে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে আলাপ করে রানা। তাঁকে জানায়, সাগরে ও রানা এজেন্সির একটা ফ্রন্ট খুলতে চায়।

বস্ বলেন, তাঁর বন্ধু পাপাগোপালার সঙ্গে রানা আলাপ করে দেখুক, ওঁর প্রিয় জাহাজটা পাওয়া যায় কি না।

এরপর দ্বিধা নিয়ে শিপিং টাইকুন চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালার কাছ থেকে মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটা ভাড়া নিতে চাইল রানা।

কিন্তু এক কথায় মানা করে দিলেন ভদ্রলোক। দেবেন না।

দমে গেল রানা।

তবে গ্রিক ব্যবসায়ী কয়েক মুহূর্ত পর বললেন: 'জাহাজ তো দিতেই পারি, কিন্তু ভাড়া নেব না। আগেও বলেছি, তোমাকে নিজের ছেলের মত দেখি আমি। রানা এজেন্সি সাগরে ভাসতে চাইছে জেনে আমি খুবই সন্তুষ্ট। তাতে আমার নিজেরও অনেক সুবিধে। আমার শিপিং ফ্লিটের যে-কোনও সমস্যায় তোমাদের সাহায্য আমি আশা করব। ব্যাপারটা হবে পারস্পরিক সাহায্য বিনিময়, বুঝেছ? ...এই প্রস্তাবে যদি রাজি থাকো, মার্ভেল অভ গ্রিস তুমি নিতে পারো। ...নেবে?'

'নেব,' রাজি হয়ে গেছে রানা।

এবারের মিশনে তাই এসেছে রানা এজেন্সির বিভিন্ন শাখার

কয়েকজন দুর্ধর্ষ তরুণও। এরা আসলে বিসিআই-এর এজেন্ট, তবে বেসরকারী সংস্থা রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ছত্রছায়ায় কাজ করে।

ফেরা যাক বর্তমানে। প্রথম যখন সোমালিয়ান জলদস্যুরা জাহাজে উঠল, সে মুহূর্তটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। দস্যুরা কীভাবে ক্রুদের নেবে তার কোনও ঠিক ছিল না। তখন বো-র কাছে অপেক্ষা করেছে বাংলাদেশ আর্মির দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো স্নাইপার কাশেম ও জলিল। ডেকের ক্রুদের পরনে ছিল অস্বাভাবিক পাতলা আর্মার। জার্মানির এক কোম্পানি জিনিসটা তৈরি করেছে ন্যাটোর যোদ্ধাদের জন্য।

জাহাজের প্রতিটি হলওয়ে ও ঘরে পেতে রাখা আছে পিনহোল ক্যামেরা ও লিসেনিং ডিভাইস। একই জিনিস রয়েছে জাহাজের খোলা সব জায়গায়। দস্যুদের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা সহজ হয়েছে তার ফলে। প্রতিজন দস্যুর পিছনে লুকানো কম্পার্টমেণ্টগুলোর আড়ালে থেকে অনুসরণ করছে দু'জন করে এজেন্ট।

অতি পুরনো চেহারার এ জাহাজ আসলে একই সঙ্গে দুটো জাহাজ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এটাকে জাহাজ ভাঙবার ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া উচিত। যে-কোনও কাস্টমস ইন্সপেক্টর বা হার্বার পাইলট ওই একই কথা বলবে। কেউ দ্বিতীয়বার চাইবে না ওটার দিকে। আর ঠিক তা-ই চেয়েছে রানা।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস যেন ভাঙা ও নষ্ট জিনিসের আড়ত। স্টিলের প্লেট থেকে খসে পড়ছে রং। ডেকে নানান জঞ্জাল। হুইলহাউস ও সুপারস্ট্রাকচারের কেবিনগুলো রয়েছে মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য। এসব ব্যবহার করে না কেউ। যে দস্যু মার্ভেলের হুইল নেড়ে চলেছে, সে জানে না তার হাতের জিনিসটা কোনও কাজ করে না। তার ইচ্ছায় জাহাজ এক ইঞ্চিও নড়বে

না। তবে কী করতে চাইছে তা কমপিউটার বলে দিচ্ছে সত্যিকারের হেলমসম্যানকে। ওই কাজ করে চলেছে রানার পরীক্ষিত বন্ধু আর্মস-ডিলার গগল। কমপিউটার সিস্টেম থেকে ওর হুইল পেয়ে চলেছে ডেটা। প্রয়োজনে কোর্স ঠিক করে নিচ্ছে।

পৃথিবীর সেরা সফিস্টিকেটেড ইনফরমেশন গ্যাদারিং শিপ এই মার্ভেল। সাগরে ভেসে যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে, সংগ্রহ করছে প্রয়োজনীয় তথ্য। শহরভিত্তিক শাখাগুলো থেকে এর কর্মকাণ্ড আলাদা—একটাই শাখা, দুনিয়ার যেখানে দরকার চলে যাচ্ছে সেখানেই।

দিনের পর দিন এই প্ল্যাটফর্ম তৈরির পিছনে সময় দিয়েছে মাসুদ রানা। প্রয়োজনে বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছে। ফলে এ জাহাজে সংযুক্ত হয়েছে নানান ধরনের অত্যাধুনিক, মারাত্মক অস্ত্র। মার্ভেলে রয়েছে ইজিস-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারের মত ইলেক্ট্রনিকস সুইট। আর্মার দিয়ে শক্ত করা হয়েছে জাহাজের খোল। সাধারণ কোনও গোলা ওটাকে ভেদ করতে পারবে না। এমন কী রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড দিয়েও কিছুই করতে পারবে না। জাহাজে রয়েছে দুটো মিনি সাবমেরিন, ওগুলো সাগরে নামানোর জন্য কিলে রয়েছে বিশেষ দরজা। আপাতত পিছনের হোল্ডে নকল কণ্টেইনারের আড়ালে বসে আছে একটা ম্যাকডোনেল ডগলাস এমডি-৫২০এন হেলিকপ্টার।

'আমাদের অতিথি ইন্সপেক্টর সাহেব কোথায়?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সোহেল।

'গল্প করছে ফারার সঙ্গে,' বলল রানা। 'তবে তোর ভয় নেই, ফারা চান্স দেবে না।'

'সিলভিও বেনেডিক্টো হার মানবে?' আস্তে করে মাথা নাড়ল সোহেল। একটু আনমনা। 'তার উপর ব্যাটা দেখতে সত্যিই ভাল।'

রোম ইণ্টারপোলের সিলভিও বেনেডিক্টো হাসিখুশি লোক, কথায়-গল্পে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। যে-কারও সঙ্গে জমিয়ে ফেলে খাতির। রানার আমন্ত্রণে জাহাজে এসেছে দালমার আলীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে। মনে মনে খুশি, এবার ওই লোককে বিশ্ব আদালতে তুলতে পারলে নাম ফাটবে তার।

রানা ও বেনেডিক্টো বহুবার নানা কাজে পরস্পরের সাহায্য নিয়েছে। কখনও কখনও ইণ্টারপোল ফাইল ঘেঁটে রানা এজেন্সির কেসে সাহায্য করেছে সিলভিও, আবার তার কেসের অপরাধীদের ধরে দিয়েছে রানা এজেন্সি।

'প্রিয় শ্যালক, নিশ্চিত থাক, ফারা পটবে না,' বলল রানা। 'বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন আপা তো সুযোগই পেল না, শুরু থেকেই সিলভিও ওকে বড় বোন ডাকতে শুরু করেছে। স্বর্ণা এরইমধ্যে ডেঁটে দিয়েছে সিলভিওকে। এখন বাকি ছিল ফারা।'

'খুন-খারাবির সাক্ষী থাকবে, ভাল ঠেকছে না,' বলল সোহেল।

'ক্ষতি নেই। কথা আদায় করে নিয়েছি। কনফ্রণ্টেশনের সময় ও চুপচাপ একটা কেবিনে বসে থাকবে। ধরতে পারলে আমরা ওর ভাড়া করা ইয়টে তুলে দেব দালমার আলীকে। তারপর যা খুশি করুকগে, আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

'অথচ মার্ভেলের সবাই পেয়ে যাবে দালমার আলীর মাথার উপর ঘোষণা করা কয়েক লাখ ডলার?'

'ঠিক তা-ই।' মেইন ভিউ স্ক্রিনের কোণে ক্রোনোমিটার দেখে নিল রানা। জাহাজের গতি ও দিক দেখে বুঝে নিল ভোরের আগে তীরে পৌঁছুবে না মার্ভেল। 'চল, ডিনার সেরে নিই। শুনলাম বাবুর্চি আজ সাত-আট রকমের কাবাব আর রোস্ট দেবে।'

আস্তে করে পেটে হাত রাখল সোহেল। 'ফারার অর্ডার, আরও আধ ঘণ্টা খালিপেটে থাকতে হবে।'

‘বেশ। আধ ঘণ্টা পর চলে আসিস ডাইনিং রুমে।’ দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, ‘যদি হাড়গোড় কিছু অবশিষ্ট থাকে, ওতেই তোর হয়ে যাবে।’

ভোরের খানিক আগে উপকূলে পৌঁছল মার্ভেল। একপাশে আ-দিগন্ত ম্যানগ্রোভে ছাওয়া জলাভূমি। এখানে এসে জাহাজের হুইল নিজে নিল গুলবুদ্দীন। ওদের ভিতর সে-ই বেশি চেনে এদিকের চ্যানেলগুলো। গোপন আস্তানার দিকে নিয়ে চলেছে জাহাজ। আজ পর্যন্ত যত জলযান নিয়ে গেছে, সেগুলোর ভিতর এই ফ্রেইটারটাই সবচেয়ে বড়। তবে গুলবুদ্দীন আত্মপ্রত্যয়ী, মনে মনে নিশ্চিত, কোনও চরে আটকা পড়বে না। বেশি সরু খালে যদি আটকে যায়ও, দেখা যাবে তাদের আখড়া বেশি দূরে নয়। সহজেই আনলোড করা যাবে কার্গো।

জলাভূমির চারপাশের বাতাস গুমোট, ভেজা-ভেজা। দিগন্তে সূর্য উঠতেই লাফ দিয়ে বেড়ে গেল তাপমাত্রা।

জলার আরও গভীরে ঢুকছে বিশাল ফ্রেইটার। ওটার প্রপেলার পিছনে তৈরি করছে কাদাপানির স্রোত। হেলমের বাল্কহেডে ঝুলন্ত ফ্যাদোমিটার কীভাবে পড়তে হয়, জানে না গুলবুদ্দীন। জানা নেই জাহাজের নীচে মাত্র নয় ফুট পানি, তারপর শুধু থকথকে কাদা। সামনে আরও ঘন হয়ে জন্মেছে বৃক্ষসারি। এরইমধ্যে দু’পাশ থেকে এসে জাহাজের উপরে চাঁদোয়া তৈরি করেছে গাছগুলো।

গুলবুদ্দীন যে চ্যানেল ধরে চলেছে তা বড় জোর জাহাজের চেয়ে সামান্য চওড়া। তেমন একটা নড়াচড়ার সুযোগ নেই এখানে। ওর মনে হলো আগে চ্যানেলটা অনেক চওড়া ছিল। আসলে কখনও এত বড় জাহাজের হুইলহাউস থেকে নীচে তাকায়নি। নিমজ্জিত এক গাছের গুঁড়ি বো-র ধাক্কা খেয়ে সরে গেল। ওই গুঁড়ি ফুটো করে দিতে পারত গুলবুদ্দীনের ট্রলার, অথচ

জাহাজ যেন একটু নড়লও না। কেউ যেন চুলকে দিয়ে গেল ওটার খোল। সামনে রয়েছে তীক্ষ্ণ বাঁক, তারপর আস্তানায় পৌঁছবে সে। কিন্তু ওইখানে বাঁক নেওয়া খুবই কঠিন। উল্টো দিকের তীরের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। ভাবছে, দূরত্ব জাহাজের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম! বাঁক নেয়া কঠিন হবে।

'পারবে, গুলবুদ্দীন?' জানতে চাইল শাহিন।

ছোকরার দিকে চাইল না গুলবুদ্দীন। গতরাতের ঘটনা এখনও ভোলেনি। 'আমরা আস্তানা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। জাহাজ যদি আটকা পড়ে, সমস্যা নেই। এখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিতে সময় লাগবে না।'

দু'হাতে শক্ত করে হুইল ধরল গুলবুদ্দীন, পা দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়াল। দেখা গেল জাহাজের প্রাউ সহজে বাঁক নিতে লাগল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল গুলবুদ্দীন, তারপর বনবন করে ঘোরাতে লাগল হুইল। কিন্তু ওর মনে হলো, যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে না জাহাজ। বড় দ্রুত তীরের দিকে চলেছে বো।

সত্যি, বড় ধীরে ঘুরছে জাহাজ। দেরি হয়ে গেছে, তীরে ধাক্কা লাগতে চলেছে। গুলবুদ্দীন গায়ের জোরে ইঞ্জিনের টেলিগ্রাফ পুরো রিভার্সে দিল। বিপরীত গতি তুলে থামতে চাইছে।

কয়েক ডেক নীচে অপারেশন্স সেন্টারে কাজ করে চলেছে গগল। চারপাশের চ্যানেল যেন চেপে এসেছে। ইঞ্জিন রিভার্সে চালাতে চাইছে গুলবুদ্দীন। তবে তার নির্দেশ অগ্রাহ্য করল গগল। বদলে চাপ দিল বো থ্রাস্টারের উপর। একই সঙ্গে ডিরেকশনাল পাম্প জেটের নাযল সরিয়ে নিল, যত দূর যায়।

গুলবুদ্দীন ব্রিজে অবাক হয়ে ভাবল, জোরালো কোনও বাতাস সরিয়ে নিয়েছে জাহাজটাকে। অথচ চারপাশের গাছে নড়ছে না একটা পাতাও। তীরের মত বাঁক নিল বো, মনে হলো অদৃশ্য কোনও হাত সঠিক দিকে সরিয়ে নিল জাহাজকে। অবাক চোখে

পরস্পরের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন ও শাহিন। জানে না কীভাবে এত বড় জাহাজ ঘুরল। খেয়াল নেই, জাহাজ বাঁক নেয়ার পর সঠিক পথে চ্যানেলের মাঝে এসেছে। প্রয়োজন ছাড়াই হুইলে মোচড় দিল গুলবুদ্দীন। ভাবছে, নিজেই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

'এবারের কাজে প্রথম থেকে দেখছি, স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন,' বলল শাহিন।

সে এবং গুলবুদ্দীন ধার্মিক লোক নয়। কত মানুষ খুন করেছে নিজেরাও জানে না।

'ওসব বলতে পারো, কিন্তু আসল কথা অন্য। আমার জানা আছে কীভাবে জাহাজ চালাতে হয়,' একটু তীক্ষ্ণ শোনাল গুলবুদ্দীনের কণ্ঠ।

জলাভূমির ডানদিকের তীরে জলদস্যুদের আস্তানা। ওখানে মাটির উচ্চতা মার্ভেলের ডেকের সমান। জোয়ার বা বর্ষার বন্যা থেকে ওদের রক্ষা করছে ওই উঁচু জমি। তীরের পাশে এক শ' ফুটি ডক, কাঠের তৈরি। শক্ত তীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে ইস্পাতের কয়েকটা ধাপ, এসে উঠেছে ডকের উপর। প্রথম দিকে হাইজ্যাক করা এক জাহাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় ওই সিঁড়ি। খানিক দূরে জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে চারটে ট্রলার। সেগুলোর ভিতর রয়েছে গুলবুদ্দীনের ট্রলারটা।

তীরের খানিক দূর থেকে শুরু হয়েছে জলদস্যুদের ক্যাম্প। কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরি হয়েছে জনবসতি। যে যা পেয়েছে তা দিয়ে গড়ে তুলেছে বাসস্থান। এখানে ওখানে তাঁবু। আগে ওগুলো ছিল রিফিউজিদের। এ ছাড়া রয়েছে কাদামাটির ঘর ও কাঠের কেবিন। কোনও কোনওটার ছাত করাগেটেড পাতের তৈরি। এ বসতিতে বাস করছে আট শ' মানুষ। জনসংখ্যার বড় অংশ শিশু-কিশোর। আস্তানার চারপাশে চারটে ওয়াচ-টাওয়ার,

পাইপ দিয়ে তৈরি। তার উপর কাঠের তক্তার প্ল্যাটফর্ম। মাটিতে আবর্জনা ও মানুষের বর্জ্য। এক পাল আধ-বুনো হাড়জিরজিরে কুকুর ঘুরছে যত্রতত্র।

একদল লোক নদীর তীরে হৈ-চৈ শুরু করেছে এত বড় জাহাজ দেখে। অনেকে উঠে পড়েছে ডকের উপর। আরও ভিড় হলে ধসে পড়বে ডক। ভিড়ের ভিতর রয়েছে অর্ধ-নগ্ন কিশোর ও ধূলিমলিন পোশাক পরা মেয়েমানুষ। তাদের পিঠে বাঁধা থলেতে ঝুলছে দুধের শিশু। ডক ও তীরে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে কমপক্ষে এক শ' লোক। অনেকে গুলি ছুঁড়ছে আকাশে। চারপাশের আওয়াজে সবাই অভ্যস্ত। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে শিশুরা। সবার আগে ডকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী। দলের বিশ্বস্ত জনাকয়েক লোক তাকে ঘিরে রেখেছে।

দালমার আলীকে যতই ভয়ঙ্কর লোক বলা হোক, শারীরিক দিক থেকে সে মোটেও বিশাল কেউ নয়। বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে দৈর্ঘ্যে। চিকন কাঁধ থেকে ঝুলছে শখের ইউনিফর্ম, দেখতে লাগছে কাকতাড়ুয়ার মত। চোখের নীচ থেকে মুখের বাকি অংশ ঢাকা পড়েছে কাঁচা-পাকা ঘন দাড়িতে। লালচে চোখ দুটো জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মত। দেহ এমনই পাতলা, কোমরে ঝুলন্ত বড়সড় পিস্তলটা তাকে একপাশে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। ঠোঁটে হাসির চিহ্ন নেই। চেহারা একদম ভাবলেশহীন। এটা তার বৈশিষ্ট্য। কখনও কোনও অনুভূতি প্রকাশ করে না। রাগের মাথায় কাউকে খুন করলেও না। যখন শতাধিক বউয়ের কারও বাচ্চা হয়, তখনও থাকে না কোনও হাসি। কণ্ঠ থেকে ঝুলছে অসমতল অনেকগুলো সাদা বিচি। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, ওগুলো আসলে মানুষের দাঁত, সোনা দিয়ে ফিলিং করা।

বিশাল ফ্রেইটারটা ডকে ভিড়াতে গিয়ে পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় করল গুলবুদ্দীন হেকমত। একবার এত দ্রুত ডকের দিকে

ধেয়ে গেল যে, ভীষণ ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকজন। কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে গেল তীরে। ডকে ভিড়তে আরও অনেক সময় নিত গুলবুদ্দীন, কিন্তু বিরক্ত হয়ে গেল গগল, শেষে দেরি না করে জাহাজ ভিড়িয়ে দিল ডকে। মার্ভেলের ডেক থেকে নীচে দড়ি ছুঁড়ে দিল জলদস্যুরা। এরপর দেরি হলো না পিয়ারের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে।

মোটা চিমনি থেকে বেরুচ্ছিল ঘন ধোঁয়া, একটু পর দেখা গেল ওটা অনেক কমে এসেছে। গুলবুদ্দীন একবার ভেঁপু বাজাল। তাতে হৈ-হৈ করে উঠল তীরের সোমালিয়ানরা। শাহিনকে কাজে পাঠিয়ে দিল গুলবুদ্দীন, সে লোক জোগাড় করে সিঁড়ি নামাবে। উঠে আসবে দালমার আলী, নিজ চোখে দেখবে কী মহার্ঘ্য লুটে এনেছে সে।

অপারেশন্স সেন্টারে মনিটরের দিকে আঙুল তুলল সিলভিও বেনেডিক্টো। 'ওই যে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মহানায়ক।'

'ওই লোক?' বলল সোহেল। 'মনে হচ্ছে ওর গাল থেকে বেরিয়েছে মুরগির পালক।'

'সি। দেখতে তেমন কিছু না। কিন্তু পাক্কা খুনি।' আর্মি ফ্যাটিগ পরেছে সিলভিও। পায়ে চকচকে কালো বুট। দুর্দান্ত সুদর্শন লোক সে। ঠোঁটের কোণে হাসি। রানার দিকে চাইল। 'মার্ভেলে দালমার উঠলে, তারপর? তারপর কী?'

'ওকে বন্দি করব,' নরম গলায় বলল রানা।

'কাজটা অত সহজ হবে না। এত লোকের মাঝ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেয়া...' মাথা নাড়ল সিলভিও এপাশ ওপাশ। 'যাই হোক, এখন মার্ভেলে উড়ছে কোন্ দেশের পতাকা?'

'তাইওয়ানের। কাজেই আইন অনুযায়ী জাহাজ ওই দেশের সম্পদ। ওকে তুলে নিয়ে আবারও বেরিয়ে যাব সাগরে। তখন

জ্যাক স্টাফ থেকে উড়বে গ্রিসের পতাকা। গ্রিসের জাহাজ থেকে দালমার আলীকে ডেলিভারি নিবি তোর ইয়টে।'

'অসুবিধে নেই। ওয়ার্ল্ড কোর্ট কোনও প্রশ্ন তুলবে বলে মনে করি না। তা ছাড়া, ধরে নেয়া হবে লোকটা যে মুহূর্তে জাহাজে উঠবে, তখন থেকে সে সোমালিয়ায় নেই।'

'কিন্তু কোর্টে অনেক কথাই বলবে লোকটা,' বলল সোহেল।

হাসল বেনেডিক্টো। 'আমার সঙ্গে দারুণ একটা ড্রাগ আছে। ওটা ব্যবহার করব দালমার আলীর উপর। আজকের সব কথা বেমালুম ভুলে যাবে ও। জীবনের হেভিয়েস্ট হ্যাংওভার নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে কাল। খুবই কষ্ট পাবে... কিন্তু তাতে আমাদের ক্ষতি কী? এদেশের জল-সীমার বাইরে অপেক্ষা করছে ইয়ট। ওকে তুলে নিয়ে সোজা ইতালি ফিরব। সেখান থেকে হেগ শহরে, ওয়ার্ল্ড কোর্টে।'

ওঅর্ক স্টেশন থেকে নিচু স্বরে ডাকল নবী, 'মাসুদ ভাই।'

অনিল চ্যাটার্জি নেই, ওয়েপন্স অপারেটর হিসাবে কাজ করছে বাংলাদেশ আর্মি থেকে বিসিআইয়ে আসা ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী। আগেই শেখা ছিল ওঅর্ক স্টেশনের কাজ। টর্পেডো, সার্ফেস টু সার্ফেস, সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল, জাহাজের ডেকের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান, রেডার-গাইডেড ২০ এমএম ভালক্যান কামান বা বো-তে বসানো ১২০ এমএম কামান সবই খুব দ্রুত নখদর্পণে নিয়ে এসেছে।

একবার তার দিকে চেয়ে স্ক্রিনে চাইল রানা। বোর্ডিং স্টেয়ার নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটার দিকে এগুতে শুরু করেছে দালমার আলী।

'মাকড়সা এমন করেই ভাবে: ভাই মাছি, কোনও ভয় নেই, আমার জালের ভিতর এসো,' নিচু স্বরে বলল বিসিআই এজেন্ট রায়হান রশিদ।

পাঁচ

রুক্ষ মরুভূমির দেশ, তিউনিশিয়া। সবুজের দেখা মেলে না বললেই চলে।

সীমান্ত অঞ্চল। বাহিরেত আল বিবান।

ধূ-ধূ বালির প্রান্তর আর ঢেউ খেলানো মরুভূমি হতে উঠে আসা প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ নিয়ে কোনও নালিশ নেই স্মৃতি মাহমুদের। ওর সমস্ত নালিশ মাছির বিরুদ্ধে। ঠিক মাছিও না, মাছির মত দেখতে কোটি কোটি খুদে পোকা সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারছে ওকে। ও-ও চড় চাপড় মারতে মারতে ব্যথা করে ফেলেছে নিজের গা-হাত-পা। অনবরত কামড়ে চলেছে ওগুলো। যতই ক্রিম ব্যবহার করুক, ওকে ছাড়ছে না তারা। প্রতি রাতে তাঁবুর ভিতর মশারিতে ঢুকে দেখে ডানাওয়ালা শয়তানগুলো ঠিকই উপস্থিত। প্রায় দু'মাস হলো খনন কাজ তদারকি করতে এসেছে স্মৃতি। কবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবে, বলতে পারে না। অথচ, হাতে মোটেই সময় নেই।

এখন ওসব নিয়ে ভাবছে না স্মৃতি, ওর মাথায় ঘুরছে একটাই প্রশ্ন: স্থানীয় কর্মীরা পোকাগুলোকে পাত্তা দিচ্ছে না কেন? হয় ওদেরকে কামড় দেয় না, নয়তো টেরই পায় না ওরা ওদের জ্বালাতন! এসব ভাবতে গিয়েই মেজাজ গরম হয়ে উঠছে স্মৃতির।

নয়জন আমেরিকান, স্মৃতি ও তিন বাঙালি, মোট তেরোজন এসেছে এ দেশে আর্কিওলজিকাল খননের কাজে। সঙ্গে রয়েছে

পঞ্চাশজন শ্রমিক। সবার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রফেসর চার্লস ডুডলি। তিনি, প্রফেসর ট্যাগার্ট, স্মৃতি এবং দুই বাংলাদেশি ছাড়া অন্য সদস্যরা এখনও ইউনিভার্সিটি অভ অ্যারিযোনার গ্রেড স্কুলের ছাত্র। তাদের ভিতর মাত্র দু'জন মেয়ে। তবে এ নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়নি।

সবাইকে বলা হয়েছে, তাদের আনা হয়েছে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে আধ মাইল ভিতরের জমিতে খনন কাজ করতে। এখানে রয়েছে একটি রোমান সাইট। অনেকে বলে ওটা ছিল ক্লডিয়াস স্যাবিনাসের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ। এ ভদ্রলোক ছিলেন রিজিওনাল গভর্নর। প্রায় বিধ্বস্ত কিছু বাড়িঘর খুঁজে বের করার পর খুব খুশি হয়ে কাজ করে চলেছে হবু প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পাওয়া গেছে বিশাল এক মন্দির। আগে এ ধরনের মন্দির দেখা যায়নি। ছাত্ররা ক্যাম্প জুড়ে গুঞ্জন তুলছে, স্যাবিনাস অন্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যে সময় তিনি এ এলাকা শাসন করতেন, তা থেকে আন্দাজ করা চলে, তিনি ক্রিস্টের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য কোনও বক্তব্য দেননি প্রফেসর ডুডলি। শুধু ভুরু কুঁচকে চেয়ারে বসে থেকেছেন।

স্মৃতিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। চারজনের এই খুদে দল খনন কাজে এলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু অতীত খুঁড়ে বের করবে না, সুন্দর করতে চাইবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে।

তবে এখন পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি। পেরিয়ে গেছে সাত সপ্তাহ। ওরা ভাবতে শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার ওদের পাঠিয়েছে বুনো হাঁসের পিছনে ছুটতে।

স্মৃতির মনে পড়ছে, প্রথম যখন ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সেকেণ্ড অফিসার কৃষ্ণা হায়দার এই প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করল, খুব উৎসাহী ছিল ও। কিন্তু প্রায় দুই মাস মরুভূমির ভিতর কঠোর পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে

ওর প্রাণ-চাঞ্চল্য। কই, কিছুই তো পাওয়া গেল না!

স্মৃতি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমেরিকান ছাত্ররা প্রথমে ওকে সুন্দরী টিন-এজার মনে করে খাতির জমানোর চেষ্টা করেছিল। তারপর ওর অনাগ্রহ দেখে সরে যায়। ওর আসল বয়স পঁচিশ। গত ক'দিন ধরে খেয়াল করছে ওর দুই পুরুষ সহকর্মী ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রীতিমত প্রতিযোগিতার ভাব এসে গেছে ওদের মধ্যে। এ নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। চাইছে না কোনও ঝামেলা বাধুক। ছোটবেলা থেকে দেখেছে বাবা-মা সর্বক্ষণ ঝগড়া করছেন। ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে সে। খুব কম বয়সেই ঠিক করে, কোনওদিন বিয়ে করবে না। আর যখন ওর বিয়ের বয়স হলো, প্রস্তাব পাঠাতেই সাহস হলো না, একটু এগিয়েই মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা শুনে পত্রপাঠ বিদায় নেয় পাত্রপক্ষ। মাত্র এই পঁচিশ বছর বয়সে একই সঙ্গে আর্কিওলজি এবং জিয়োলজির উপর দুটো ডক্টরেট পেয়েছে ও অ্যারিযোনা ইউনিভার্সিটি থেকে।

মরুভূমিতে কাজ করতে এসে হাঁটু ছাড়িয়ে যাওয়া চুলগুলো ছেঁটে বব-কাট করে নিয়েছে। তারপরও মিষ্টি লাগে ওকে দেখতে। এখানে আসবার পর থেকে ওর ডিগ্রি দুটো কাজে লাগছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওরা যা খুঁজতে এসেছে, তা কি সত্যি রয়েছে এদিকটায়?

স্মৃতি ও তার ছোট্ট দল শুকনো নদী-খাতের কয়েক মাইল এলাকা চষে দেখেছে। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। লক্ষ বছর ধরে স্যাণ্ডস্টোনের ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে বয়েছে নদী। কোথাও দেখবার মত কিছুই নেই। তারপর এক জায়গায় এসে দেখা গেছে নদী-খাত এসে মিশেছে একটা জল-প্রপাতে।

ওটার পর থেকে আর উজানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি স্মৃতি। দু' শ' বছর আগে যখন এখানে নদী বইত, ওই জল-

প্রপাতের ওপাশে যাওয়ার উপায় ছিল না।

পাথরে ড্রিল ঢুকবার আওয়াজে ধ্যান ভাঙল স্মৃতির। মেশিনটা দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা ট্রাকের পিঠে বসে আছে। সহজেই ড্রিল করছে ভঙ্গুর স্যাণ্ডস্টোন টিলার বুকে। পিছন থেকে রিগ নিয়ন্ত্রণ করছে টেক্সাস থেকে আসা আসাদ চৌধুরি। দক্ষ জিওলজিস্ট সে। অয়েল ফিল্ডে ভাল অভিজ্ঞতা। হীরার মত তীক্ষ্ণ কাটার-হেড ভেদ করছে বহু আগের কোনও ভূমি-ধস। খুঁজে চলেছে কোনও ধরনের গুহা।

গত দেড় মাসে ওরা জমিতে তৈরি করেছে কয়েক শ' গর্ত। এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট দেখল স্মৃতি। কিছুক্ষণ পর পর ঘাম মুছল কপাল ও গলা থেকে। ড্রিল পঁয়ত্রিশ ফুট জমি ভেদ করবার পর আসাদ চৌধুরি বন্ধ করে দিল ডিজেল ইঞ্জিন। গোঙাতে গোঙাতে থেমে গেল মোটর। আবারও বাতাসের শ্-শ্ আওয়াজ শুনতে পেল স্মৃতি।

'কিছু নেই,' বলল আসাদ।

'তারপরও বলব ভাটির দিকে আরও কয়েকটা গর্ত করা উচিত,' বলল সবুর রহমান। এই যুবক রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি আলাপ করে। কাউকে কিছু বলেনি স্মৃতি, তবে ওর ধারণা এ বাংলাদেশ সরকারের কোনও গোপন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এ-কাজে আসবার জন্য সবুর রহমানের কোনও অ্যাকাডেমিক বা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নেই, অথচ সে হাজির।

অবশ্য তার বক্তব্য খুব একটা পাত্তা দেয় না স্মৃতি বা আসাদ চৌধুরি। ওরা খুশি, সবুর কোনও কাজ হাতে নিলে তা ঠিক ভাবে সম্পন্ন করে। আরেকটা ভাল দিক, চমৎকার আরবি বলে ও। এ দেশে এ জ্ঞান বেশ কাজে লাগছে।

ছোট্ট দলের চতুর্থ সদস্য ব্রাম ট্যাগার্ট, অটোম্যান (ওসমান)

সাম্রাজ্যের উপর বিশেষজ্ঞ। বয়স্ক মানুষ। ভাল জানেন বারবারি দেশগুলোর বিষয়ে। তবে স্মৃতির ধারণা, তিনি কুচুটে লোক। রোমান ধ্বংসাবশেষের ক্যাম্প থেকে কোথাও একপা নড়েননি। বলেছেন, তাঁর জ্ঞান কাজে লাগবে কিছু খুঁজে পাওয়ার পর। তার আগে কোথাও গিয়ে লাভ নেই।

পুরোপুরি মিথ্যা বলেননি তিনি।

অবশ্য, যখন ওয়াশিংটন ডি.সি.তে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসার কৃষ্ণা হায়দার তাঁকে কাজ দিল, তিনি নিজেই বলেছিলেন, এই মাঠে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। 'নখের নীচে ধুলো না থাকলে ভালই লাগে না আমার!' কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে দেখা যাচ্ছে ম্যানিকিউর করা নখের নীচে ধুলো জমার সুযোগই পাচ্ছে না। সবসময় ফিটফাট। তাঁর অন্যতম প্রিয় কাজ ঘন ঘন সাফারি জ্যাকেটের ভাঁজ সমান করা।

'তোমার লেটেস্ট পরামর্শ?' সবুর রহমানের দিকে চাইল আসাদ চৌধুরি। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিয়ে ভালই আলাপ হয় তাদের। অন্য বিষয়ে জমে না গল্প।

'ক্ষতি কী ওদিক দেখলে?' বলল সবুর।

'ক্ষতি নেই?' একটু বেশি তীক্ষ্ণ শোনাল স্মৃতির কণ্ঠ। ট্রাকের ছায়ায় বসে পড়েছে। নিজেকে সামলে নিল। 'দুঃখিত। আসলে বিরক্তি ধরে গেছে। ওদিকের টিলা অনেক বেশি খাড়া। ওখান থেকে মালবাহী উট নামানো অসম্ভব। তীরে ভিড়বে না জাহাজ।'

'আমরা কি নিশ্চিত সঠিক নদী-খাত এটা?' বলল আসাদ। 'স্যাণ্ডস্টোনে বড় গুহা থাকে না। স্যাণ্ডস্টোন হয় অনেক বেশি নরম। যে-কোনও সময় নেমে আসে ছাত। দস্যুরা নিশ্চয়ই এমন জায়গায় গোটা একটা জাহাজ লুকিয়ে রাখবে না।'

একই কথা ভেবেছে স্মৃতি। ওদের লাইমস্টোনে খোঁজা উচিত। সেখানে থাকতে পারে বড় গুহা। যদিও ওই পাথর পানি

বা বাতাসে ক্ষয় হয়, টিকে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওরা এদিকে স্যাণ্ডস্টোন বা সামান্য কিছু ব্যাসল্ট ছাড়া কিছুই পায়নি।

'জেমস রবার্টসের চিঠিতে পরিষ্কার লেখা ছিল কোথায় রয়েছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের গোপন আখড়া,' বলল স্মৃতি। 'মনে আছে, জেফ মার্টেল ওখানে পুরো দু' বছর বাস করেন। তারপর মৃত্যুবরণ করেন ধার্মিক জলদস্যু। স্যাটালাইট ইমেজারি থেকে বোঝা যায় চারপাশের এক শ' মাইলের ভিতর এটাই একমাত্র নদী-খাত। তার মানে এখানেই ছিলেন মার্টেল।'

'ভাবতে ভাল লাগছে আমরা লিবিয়ান সীমান্তের এপাশে,' বলল সবুর। 'ওরা ধরতে পারলে এক বছরের ভিতর জেল থেকে আর বেরুতে হবে না।' তার পরনে ফুলহাতা শার্ট ও নীল জিন্স। মাথার উপর শনের হ্যাট। 'যতই ঘনিয়ে আসছে সম্মেলন, সতর্ক হয়ে উঠছে মুয়াম্মার গাদ্দাফি। সে নিশ্চয়ই চাইবে না কেউ তার পিছন-উঠানে খোঁড়াখুঁড়ি করুক।'

'আমার বাবা লিবিয়ান অয়েল ফিল্ডে কাজ করতেন,' বলল আসাদ চৌধুরি। 'তারপর হঠাৎ তেলক্ষেত্রগুলো জাতীয়করণ করেন গাদ্দাফি, আর চাকরি থাকল না।' সবুরের চেয়ে লম্বা সে, তবে হালকা-পাতলা। প্রচুর কাজ করেছে সূর্যের আলোয়। চোখের কোণে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। বুড়ো ওক গাছের বাকলের মত কড়া পড়া দুই হাতের তালু। গালের ভিতর সারাক্ষণ থাকে গুলতির বলের মত তামাকের গুলি। 'বাবার কাছে শুনেছি লিবিয়ার সাধারণ মানুষ অন্যদেশের মানুষের চেয়ে অনেক সভ্য।'

'হতে পারে। কিন্তু শুনেছি সরকার খুব কঠোর।' ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক উষ্ণ পানি গলায় ঢালল স্মৃতি। ভুরু কুঁচকে গেল। 'হতেই পারে সম্মেলন আয়োজন করছে: কিন্তু নিজেদের মনোভাব পাল্টে নেয়নি।' সবুরের দিকে চাইল। 'শুনেছি অতীতের

সেই জলদস্যুর কাছ থেকে নামটা নিয়েছে বর্তমানের ইউনুস আল-কবির। একসময় তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিল সিআইএ। এখন ছোবল দেবে লোকটা। ...এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

ঢোঁপ গিলল না সবুর। 'আমি পেপারে পড়েছি আল-কবির লিবিয়ায় ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার তাকে ঢুকতে দেয়নি।'

'এই নদী-খাত ধরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসেছি, এখানে আসলে কিছুই নেই,' বিরক্ত স্বরে বলল আসাদ চৌধুরি। 'এই মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ। আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি।'

'কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো বলছে এখানে আছে ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা,' নরম স্বরে বলল স্মৃতি। ওর মনে পড়ে গেল ওয়াশিংটন ডিসিতে কৃষ্ণা হায়দারের সঙ্গে আলাপ হয়। তখন চিকন এক বাঙালি লোক উপস্থিত ছিলেন। মজা করে কথা বলেন তিনি। স্মৃতি ঘরে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান, কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে বলেন, তিনি খেদমত দেয়ার জন্য তৈরি।

দু'জনের ভিতর পরিচয় করিয়ে দেয় কৃষ্ণা হায়দার। স্মৃতিকে বলে, 'আমাদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর।'

'ডেকে নেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলে স্মৃতি। 'আমরা কেউ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভাল ব্যবহার পাই না। এতদিনে একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে।'

'অথচ দেখুন, এদের মত লোক ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়,' হেসে ফেললেন আহমেদ শরীফ। 'যে-কোনও পার্টিতে বাতি জ্বেলে দিন, দেখবেন তেলাপোকার মত খ্যাচর-ম্যাচর করে ভাগছে এরা। ...না, না, কৃষ্ণা, তুমি তো ভদ্রমহিলা। তোমার কথা বলছি না। তুমি তো বেহেস্তি হুর-পরী। তোমার কি তুলনা আছে?'

'আবার যদি ফাজলামো করো, এম্বেসির ডিনারগুলো থেকে তোমার নাম ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেব,' হুমকি দিল কৃষ্ণা।

'এটা পেটে লাথি দেয়ার মত হবে। ঠিক আছে, আমি চুপ,' বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আহমেদ।

'ডক্টর...'

'শুধু স্মৃতি বললেই চলবে।'

'স্মৃতি, আমরা আপনাকে ডেকেছি গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে। এ কাজে আপনার দক্ষতা থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে। ...দু' সপ্তাহ আগে কপাল জোরে আহমেদ শরীফ একটা চিঠি পেয়ে যায়। ওটা ছিল জেমস রবার্টস নামের বিখ্যাত এক মার্কিন অ্যাডমিরালের লেখা। সময়কাল ছিল আঠারো শ' বিশ সাল। ওই চিঠিতে অবিশ্বাস্য কাহিনি লেখেন তিনি। এক নাবিক হারিয়ে যান বারবারি উপকূলের লড়াইয়ে। সময়কাল ছিল আঠারো শ' তিন সাল। ওই নাবিকের নাম ছিল জেফ মার্টেল।'

এরপর কৃষ্ণা খুলে বলতে শুরু করল, জেফ মার্টেলের ভূমিকা কী ছিল। তারা ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজটা পুড়িয়ে দেয়। এরপর এক যুদ্ধে সাগরে হারিয়ে যায় লেফটেন্যান্ট। কৃষ্ণা এখানে আসবার পর মুখ খুললেন আহমেদ শরীফ।

'জেফ মার্টেল এবং ইউনুস আল-কবির তীরে পৌঁছতে পারে। খালি হাতে জলদস্যুর শরীর থেকে পিস্তলের বল খুঁড়ে বের করেন মার্টেল। পাথরে লেগে থাকা লবণ লাগিয়ে বুজিয়ে দেন ক্ষত। তিনদিন কোনও জ্ঞান ছিল না জলদস্যুর। তারপর চেতনা ফিরে পেলেন, ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন। ওঁদের কপাল ভাল যে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পেরেছিলেন মার্টেল। তা দিয়ে তৃষ্ণা মিটল। তীর থেকে সংগ্রহ করা শামুক-ঝিনুক খেয়ে প্রাণ বাঁচল।

'এখানে বলে রাখি, ইমাম ইউনুস আল-কবির জলদস্যু হলেও কখনও নিজের জন্য সম্পদ অর্জন করেননি। তাঁর রাগ-ঘৃণা-ক্ষোভ ছিল বিধর্মীদের উপর। এককথায় বলতে গেলে তিনি

ছিলেন অতীত কালের কোনও ওসামা বিন লাদেন। অসংখ্য মানুষ ছিল তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত।'

'তাঁর কাছ থেকেই নাম নিয়েছে বর্তমানের ইউনুস আল-কবির?' জানতে চাইল স্মৃতি। আজকাল প্রায়ই শোনে ওই নাম।

'হ্যাঁ। নামটা গ্রহণ করেছে বর্তমানের আরেক জঙ্গি নেতা।'

'জানতাম না অতীত ইতিহাস থেকে নাম নিয়েছে।'

'খুব সর্তকতার সঙ্গে এটা করেছে। ইসলাম ধর্মে যারা চরমপন্থী, তাদের কাছে সত্যিকারের ইউনুস আল-কবির ছিলেন মহানায়ক। শুধু তা-ই নয়, তিনি অনেককে ধর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। জলদস্যুতা শুরু করার আগে ছিলেন ইমাম। তাঁর বেশির ভাগ লেখা এখনও পাওয়া যায়। এখনও লাখো মুসলিম ওগুলো পড়ে। সেখানে লেখা আছে কেন অবিশ্বাসীদের উপর হামলা করা উচিত।

'তাঁর প্রথম সাগর-যাত্রার আগে একটা তৈলচিত্র আঁকা হয়,' বলল কৃষ্ণা। 'বহুবার জঙ্গিদের ধরতে গিয়ে তাদের আস্তানায় পাওয়া গেছে ওই ছবি। মুসলিম জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসীদের কাছে ইউনুস আল-কবির এক মহান নেতা। তিনি সত্যিকারের জিহাদি মানুষ, প্রথম পুরুষ, যিনি যুদ্ধকে নিয়ে গেছেন পশ্চিমাদের উঠানে।'

এবার মুখ খুলল স্মৃতি, 'দুঃখিত, তবে এসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? আমি তো আর্কিওলজিস্ট।'

'আসছি ওই প্রসঙ্গে,' বললেন আহমেদ শরীফ। 'সংক্ষেপে বলছি। মার্টেল আর আল-কবির ভিন্ন জগতের মানুষ। বলতে পারেন একজন পৃথিবীর, অন্যজন মঙ্গলগ্রহের। কিন্তু তাঁদের ভিতর গড়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক বন্ধন। বুঝতেই পারছেন, মার্টেল একবার নয়, দুই-দুইবার ইউনুস আল-কবিরের জান বাঁচিয়েছেন। প্রথমবার সাগর থেকে উদ্ধার করে, দ্বিতীয়বার সেবাযত্ন করে।

কোনও মুসলিম এই ঋণ ভুলতে পারে না। আরেকটা ব্যাপার ছিল, ইউনুস আল-কবিরের বহুকাল আগে মরে যাওয়া ছেলের মত দেখতে ছিলেন জেফ মার্টেল।

'তাঁরা আটকা পড়েন মরুভূমিতে, ত্রিপোলি শহর থেকে এক শ' মাইল দূরে। ইউনুস আল-কবির জানতেন একবার শহরে পৌঁছলে বাশাও ঠিক বন্দি করবেন মার্টেলকে। তাঁকে থাকতে হবে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার নাবিকদের সঙ্গে। তার চেয়ে ঢের খারাপ হতে পারে, ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। বাশাওয়ের শখের ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে পুড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

'যা-ই হোক, ভেবেচিন্তে অন্য পথ বের করলেন ইউনুস আল-কবির। এখন কথা হচ্ছে, তিনি শুধু শহর থেকে সাগরে যেতেন না। তাঁর ছিল গোপন এক আস্তানা। ওটা ছিল পশ্চিমের মরুভূমিতে। ওখান থেকে বহুবার হামলা করেছেন। কোনও নেভাল ফোর্স ঠেকাতে পারেনি তাঁকে। তিনি ধারণা করলেন তাঁর জাহাজ শেষপর্যন্ত আমেরিকান রণতরী সিগনালকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবে। তারপর ফিরবে আস্তানায়।'

সব কথা গুছিয়ে বলেন আহমেদ শরীফ, তৈরি করে ফেলেন পরিবেশ।

'কাজেই তাঁরা দু'জন রওনা হলেন পশ্চিমে। হেঁটে চললেন তীরের পাশ দিয়ে। বারবার তীর থেকে সরে গিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে হলো। জেফ মার্টেল বলতে পারেননি কত দিন হেঁটেছেন তাঁরা। আন্দাজ সময় পেরিয়েছে চার সপ্তাহ। সে সময়ে নরকযন্ত্রণায় ভুগেছেন দুজনেই। প্রায় দিনই দেখা যেত একফোঁটা পানিও জোগাড় হয়নি। বারবার মনে হয়েছে তাঁরা তৃষ্ণায় মরতে চলেছেন। ব্যাপারটা যেন কোলরিজের সেই কবিতার মত: "ওয়াটার, ওয়াটার, এভরিওয়্যার/নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক"। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে তৃষ্ণা দূর করেছে। বেশির ভাগ সময় ঝিনুকের

রস খেয়ে বেঁচে থেকেছেন।

'এদিকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তাঁদের ভিতর। একটু একটু করে দু'জন হয়ে উঠছেন পরস্পরের বন্ধু। ইউনুস আল-কবির খানিক ইংরেজি বলতে পারেন। আর দ্রুত আরবি শিখতে শুরু করেছেন মার্টেল। জানি না তাঁরা কী নিয়ে আলাপ করতেন, কিন্তু যতদিনে পৌঁছে গেলেন গোপন আস্তানায়, ততদিনে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছেন। তা ছাড়া, ইউনুস আল-কবির তো আগে থেকেই ঋণী, তিনি স্থির করলেন দস্যুদের সমস্ত বৈরিতা থেকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখবেন ছেলেটাকে। তরুণ অফিসার শুধু যে প্রাণে বাঁচল, তা নয়, কিছুদিন পর থেকে ইউনুস আল-কবির তাঁকে পুত্র বলে ডাকতে লাগলেন। বদলে মার্টেলও ইউনুস আল-কবিরকে পিতার স্থান দিলেন।

'গোপন আস্তানায় ফিরে দেখা গেল রক নামের জাহাজটা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা ধরে নেয় তাদের নেতা সাগরে মারা গেছেন। কাজেই তারা ফিরে যায় বারবারি উপকূলে নিজেদের বাড়িঘরে। নেভি ডিপার্টমেণ্টে রিপোর্ট করেন জেমস রবার্টস: শেষ যখন দেখেন, আগুনে পুড়ছে রক জাহাজটা। যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক জাহাজটা ধ্বংস হয়নি। ফিরে আসে নদীতে নিজ গোপন আস্তানায়।

'মার্টেলের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই আস্তানায় খাবার বা অন্য কোনও কিছুর অভাব ছিল না। ওঁদের দু'জনের দেখাশোনার জন্য ছিল বয়স্ক এক চাকর। কয়েক মাস পর পর ওখানে আসত উটের কারাভাঁ, পৌঁছে দিয়ে যেত খাবার ও প্রয়োজনীয় সব কিছু। বদলে পেত ইউনুস আল-কবিরের লুট করা সম্পদ থেকে সামান্য কিছু মোহর। ওই লোকগুলোকে ইমাম শপথ করিয়ে নেন। ফলে তারা ইউনুস আল-কবিরের অনুসারী দস্যুদের কিছুই জানায়নি।'

'সম্পদ?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'জেফ মার্টেল লিখেছেন, ওখানে ছিল এক-পাহাড় উঁচু স্বর্ণ-মুদ্রা,' জবাবে বললেন আহমেদ। 'আরও বহু কিছু ছিল ওখানে।'

কৃষ্ণার দিকে চাইল স্মৃতি। 'আপনি কি চান আমি ট্রেজার হান্ট করব?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কৃষ্ণা। 'এককথায় ওরকম বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা সোনা বা মাণিক্য নিয়ে ভাবছি না। আপনি কখনও ফতোয়া সম্পর্কে কিছু পড়েছেন?'

'ওটা তো বিজ্ঞ মুসলিমদের জন্য এক ধরনের মতামত বা নির্দেশ। ঠিক বলছি তো? যেমন সালমান রুশদি স্যাটানিক ভার্সেস লেখায় ফতোয়া দেয়া হয়, তাঁকে খুন করে ফেলা হোক।'

'একদম ঠিক। কে বা কারা ওই ঘোষণা দিল, তার উপর নির্ভর করে মুসলিম জগৎ কতটা আন্দোলিত হবে। আয়াতোল্লাহ খোমেনি ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় একটা ফতোয়া দেন: শত্রু ধ্বংস করতে বোমা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করা বৈধ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোরানে পরিষ্কার লিখে দেয়া হয়েছে, কোনও মুসলিম কখনও আত্মহত্যা করতে পারবে না। কিন্তু ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেন সহজে হারাতে থাকেন খোমেনি বাহিনীকে। তখন আর কোনও উপায় না দেখে খোমেনি ঘোষণা দেন বোমা দিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিলেও কোনও পাপ হবে না। আসল কথা হচ্ছে শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। খোমেনির পরিকল্পনা সফল হয়। ইরানিরা নতুন করে ইরাকি সেনাবাহিনীকে তাদের নিজেদের মাটিতে পৌঁছে দেয়। এরপর দুই দেশ সিয-ফায়ার করে। তবে ওই ফতোয়া চালু থাকে ইরানে। আর এখন ওটা ব্যবহার করছে আত্মঘাতী বোমারুরা। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে ইজরায়েল পর্যন্ত সবখানে চলছে নিজেকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া। এদের আক্রমণে নিহত হচ্ছে দোষী-নির্দোষ শত শত মানুষ। যা-ই

হোক, যা বলছিলাম, খোমেনির এই ফতোয়াকে গভীর ভাবে সম্মান জানায় অনেকে। কিন্তু তাঁরই মত আর কোনও ইমাম যদি এ ব্যাপারে পাল্টা ফতোয়া দেন, তা মানবে জঙ্গিরা। তা হলে হয়তো পৃথিবী থেকে দূর হবে আত্মঘাতী বোমাবাজ জঙ্গিরা।'

কী বলা হচ্ছে বুঝতে শুরু করেছে স্মৃতি। 'ইউনুস আল-কবির?'

সামনে ঝুঁকে বসলেন আহমেদ। 'দেশে ফিরে জেমস রবার্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জেফ মার্টেল। বলেন, ইউনুস আল-কবির নিজের অতীত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেন, অন্য কোনও ধর্মের প্রতি ঘৃণা রাখা উচিত নয়। অথচ আগে তিনি কোনও খ্রিস্টানের সঙ্গে কথা বলতেন না। উদ্ধার করবার পর এক সময় মার্টেল ইউনুসকে বাইবেল পড়ে শুনিয়েছেন। আর এর ফলেই ইমাম দুই ধর্মগ্রন্থের তফাতের দিকে মনোযোগ না দিয়ে মিলগুলো দেখতে শুরু করেন। তিনি মারা যাওয়ার আগের দুই বছর গোপন আস্তানায় মনোযোগ দেন কোরান পাঠে। এবং লিখে রাখেন কীভাবে মিলন হতে পারে ক্রিস্ট ধর্ম ও ইসলামের। মূল বক্তব্য ছিল: দুই ধর্ম পাশাপাশি ঠাঁই পেতে পারে। তাতে কোনও পক্ষেরই কোনও ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে। এই ফতোয়াগুলো লিখেছেন বলেই ইউনুস আল-কবির আর কখনও চাননি তাঁর সঙ্গীরা জানুক তিনি বেঁচে আছেন। এর কারণ বোধহয়, দলের সবাই চাইত আবার সাগরে দস্যুতা করতে। কিন্তু তিনি তা আর চাননি।'

কৃষ্ণা হায়দার বলে উঠল, 'এখন যদি ওই ফতোয়াগুলো পাওয়া যায়, ওগুলো হয়ে উঠবে গোটা দুনিয়ার উঠতি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অস্ত্র। অনেক ফ্যানাটিক টেরোরিস্ট বাধ্য হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে সরবে।' এক চুমুক পানি নিল সে, তারপর বলল, 'জানি না আপনি একটা বিষয়ে অবগত কি না। আগামী

কয়েক মাস পর লিবিয়ার ত্রিপোলিতে প্রতিটি দেশের প্রধানকে নিয়ে শান্তি সম্মেলন হতে চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও এত বড় শান্তি সম্মেলন হয়নি। আর সেখানে পৃথিবীর শান্তির জন্য, লড়াই বন্ধ করবার জন্য, আরও অনেকের পাশাপাশি বক্তব্য রাখতে চলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও। তাঁদের প্রচেষ্টায় হয়তো এবার থামবে জঙ্গিদের নিষ্ঠুর হানাহানি, হত্যা, বোমাবাজি। প্রত্যেকে তাঁরা পরস্পরকে সুবিধা দেয়ার কথা বলছেন। উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধু বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদানই নয়, দেবে প্রয়োজনীয় সবরকম কারিগরি সাহায্য, সহযোগিতা। আমরা চাইছি ওখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইউনুস আল-কবিরের লিখিত ফতোয়া পাঠ করুন। ওটা হয়তো সব ধরনের দলকে শান্তি বজায় রাখবার জন্য নতুন দিক নির্দেশনা দেবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল স্মৃতির। 'যা বুঝছি, ওই ফতোয়া তো সিমবোলিক?'

'হ্যাঁ, আসলেই তা-ই,' বললেন আহমেদ। 'কিন্তু কূটনীতির বেশিরভাগ কিন্তু শান্তি বজায় রাখবার জন্যই। সব ধরনের দল চাইছে আলোচনা করতে। আর শান্তি বিষয়ক বক্তব্য যদি আসে সম্মানিত কোনও ইমামের কাছ থেকে, তা হবে শক্তিশালী একটা মাধ্যম। আর তিনি যদি হন এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যিনি নিজের মতবাদ পাল্টে শান্তিকে প্রধান অস্ত্র মনে করেছেন তা হলে কূটনীতিতে ওটাকে বলা যেতে পারে বিশাল এক বিজয়।'

কৃষ্ণা হায়দার ও আহমেদ শরীফের সঙ্গে আলাপ করে স্মৃতির মনে হয়েছে, কাজটা নেয়াই উচিত। কিন্তু এখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে মনে হচ্ছে, খামোকা খুঁজছে ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। ট্রাকের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল। ছায়া থেকে বেরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'রোমান ধ্বংসাবশেষে ফিরবার আগে এখনও এক ঘণ্টা কাজ করা যায়। দু' ঘণ্টা পর ডিগ সুপারভাইযারের সঙ্গে মিটিং।' তিউনিশিয়ার সরকারের সঙ্গে ওদের যে-কথা হয়েছে, তাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে ক্যাম্পে। রাতে থাকতে হবে ওখানে, ভুলেও সন্ধ্যার পর মরুভূমিতে বেরুনো চলবে না। 'আসুন, রহমান সাহেবের কথামত ভাটির দিকে দেখা যাক। কিছু পেয়েও যেতে পারি!'

ছয়

দালমার আলীকে বন্দি করতে সহজ উপায় বেছে নিয়েছে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। সঙ্গী-সাথী নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকবে লোকটা, আর ঠিক তখনই অস্ত্র হাতে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে মার্ভেলের ক্রুরা। আশা করা যায় সাহস দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না লোকটা। তাকে নিয়ে পিয়ার থেকে পিছু হটবে মার্ভেল, আবারও ফিরবে সাগরে। কোনও ট্রলারের সাধ্য নেই ওদের ফ্রেইটারকে ধাওয়া করবে। আর এই ক্যাম্পে হেলিকপ্টার নেই যে পিছু নেবে।

রানা ও সোহেল ঠিক করেছে নিজেরা সরাসরি কিছু না করে একটু দূরে থেকে দেখবে কে, কতটা নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব পালন করে। সবার দক্ষতার পরীক্ষা হয়ে যাবে এই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে। চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের গ্যাং ফেং চেয়ে নিয়েছে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব। আশা করা যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভালই

করবে ক্র্যাক টিম। ফু-চুঙের বক্তব্য: দ্রুত অন্যতম সেরা এজেন্ট হয়ে উঠছে গ্যাং ফেং। আর তার পাশে থাকছে আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, নেভির লেফটেন্যাণ্ট সানজিদা স্বর্ণা, কমাণ্ডো কাশেম, জলিল ও আরও কয়েকজন।

এই প্রথম মার্ভেলে যোগ দিয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। তার সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বয়সে রানার চেয়ে চার বছরের বড় নিশাত, আর্মিতে দেরি করে যোগ দেয়ায় এখনও ক্যাপ্টেন রয়ে গেছে। বিশালদেহী মহিলা, দৈর্ঘ্যে পুরো ছয় ফুট। রানার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি। দশাসই শরীরটাও রীতিমত শক্ত-পোক্ত, বাঙালি মেয়েরা সাধারণত এত লম্বা-চওড়া হয় না। দেখে মনে হতে পারে: পুরুষ হিসেবে গড়তে শুরু করেছিলেন ওকে বিধাতা; শেষ মুহূর্তে দু-একটা জায়গা সামান্য পাল্টে মেয়ে বানিয়ে দিয়েছেন। বেচারির শৈশব-কৈশোর খুবই খারাপ কেটেছে এর ফলে। ছেলে বা মেয়ে... কেউ ওকে সহজভাবে নেয়নি কোনদিন। বন্ধুত্ব করতে চাইত না কেউ। নিঃসঙ্গ জীবন বিরক্ত করে তুলেছিল ওকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করবার পর তাই যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে... একটু বেশি বয়সে। ওখানেই ওর সত্যিকার প্রতিভার বিকাশ হয়। মেয়ে হয়েও ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত পারফর্মেন্স দেখায় প্রশিক্ষণে, নাম লেখায় কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য। শুরুতে সবাই নারী-কমাণ্ডোর ব্যাপারে নাক সিঁটকেছিল, নিশাতের বয়সও নাকি কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য বড্ড বেশি; কিন্তু ও হাতেনাতে প্রমাণ করে দেয় আর দশটা বাঙালি মেয়ের মত অবোলা বা অবলা নয় ও, ছেলেদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে প্রথম হয়।

এই অর্জনের স্বীকৃতি দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি রানা, নির্দ্বিধায় ক্র্যাক টিমের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড বানিয়েছে ওকে। এর পিছনে নারী জাতির প্রতি কোনও দুর্বলতা কাজ করেনি, আসলেই

মেয়েটা এই পদের উপযুক্ত। শুধু সৈনিক হিসেবে দক্ষ তা-ই নয়, স্বভাবজাত নেতার মত দলের সবার ভাল-মন্দের দিকে কড়া নজর ওর। সহকর্মীদের দেখাশোনা এতটাই আন্তরিকতার সঙ্গে করে যে, ওরা তাকে আড়ালে-আবডালে *আম্মু* বলে ডাকে।

এ দলটার ভিতর অদ্ভুত এক বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। ইচ্ছে করেই রানা নিজেদের ভিতর সামরিক ফর্মালিটি রাখেনি, তাতে পরস্পরের অনেক কাছে আসতে পেরেছে ওরা। সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আন্তরিক। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী *স্যর-ম্যাডাম* ডাকা, কিংবা স্যালিউট দেয়ার মত আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছে রানা। একান্তে ওরা একই পরিবারের সদস্যের মত। রানা যেমন অন্যদেরকে *মাসুদ ভাই* বলে ডাকতে দেয়, তেমনি নিজেও ওর চেয়ে বয়সে বড় নিশাতকে *আপা* বলে ডাকতে দ্বিধা করে না। অন্যদেরকেও একই সম্বোধনে উৎসাহিত করে। রানা *আপা* বলায় নিশাত খুশি, কিন্তু কিছুতেই রানাকে নাম ধরে ডাকতে বা তুমি বলতে রাজি হয়নি, ওকে 'স্যর' এবং 'আপনি' বলেই সম্বোধন করে।

এ মুহূর্তে বিশাল স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা। বুঝতে পারছে ওদের সাধের পরিকল্পনা জানালা দিয়ে পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে!

একটা ক্রেনের উপর রাখা ওদের ক্যামেরা। ওটা থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ডক। জাহাজের উঠবার আগে একটু থমকে গেল দালমার আলী, নিচু স্বরে কী যেন বলতে শুরু করেছে সঙ্গীদেরকে। একটু সরে দাঁড়াল। গ্যাংপ্লাঙ্ক বেয়ে দৌড়ে উঠে এল এক ডজন সোমালিয়ান, চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

একটু জোরে ডাকল নবী, 'মাসুদ ভাই!'

'দেখেছি।'

'কী করবি, রানা?' জানতে চাইল সিলভিও বেনেডিক্টো।

'এক মিনিট,' স্ক্রিন থেকে চোখ সরাল না রানা। চেয়ারে সংযুক্ত মাইক চালু করল। 'ফেং, শুনছ?'

'মনিটরে সব দেখছি। ভেস্তে গেছে "এ প্ল্যান"। এবার?'

'মেস হলের কাছে অপেক্ষা করো।'

গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করেছে দালমার আলী। কিন্তু ততক্ষণে কমপক্ষে এক শ' সোমালিয়ান উঠে পড়েছে জাহাজে। নেতার পিছু নিয়ে পিলপিল করে উঠছে আরও অনেকে।

মনের ভিতর এক এক করে পরিকল্পনা তৈরি ও বাতিল করে চলেছে রানা। মার্ভেলে যে পরিমাণ ফায়ার-পাওয়ার আছে, তাতে পুরো ক্যাম্পের সবাইকে শেষ করে দেয়া সম্ভব। কিন্তু এ কথা একবারও ভাবল না রানা। এই ক্যাম্পে যেমন রয়েছে একে-৪৭ রাইফেল হাতে বহু দুর্বৃত্ত, তেমনই রয়েছে অসংখ্য মেয়েমানুষ ও শিশু-কিশোর, সশস্ত্র লোকগুলোর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'ওয়াটার-সাপ্রেশান কামান তৈরি রাখো, রায়হান।'

'আগেই কাজ শুরু করেছি, মাসুদ ভাই।'

ঘরে এসে ঢুকেছে লেফটেন্যাণ্ট সানজিদা স্বর্ণা। ভাল কবিতা লেখে সে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল পারে বেয়াড়া লোক পেটাতে। ওর কথার ধারে তটস্থ থাকে পুরুষ কমাণ্ডোরা, খুব সমঝে কথা বলে।

'স্বর্ণা,' বলল রানা, 'তুমি দালমার আলীর উপর চোখ রাখো। ইণ্টারনাল ক্যামেরা থেকে যেন হারিয়ে না যায়। হোল্ডে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

মাইক্রোফোনে আবারও বলল রানা: 'ফেং, ক্যাপ্টেন নিশাত, দেরি না করে জাদুর দোকানে চলে আসুন।'

একটা পোর্টেবল রেডিও পকেটে রাখল রানা, কানে পরে নিল

হেডফোন। এবার কমিউনিকেশন গ্রিড থেকে তথ্য পাবে। দ্রুত চলে গেল পিছন দরজার কাছে, কাঁধের উপর দিয়ে সোহেলকে দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করল না, টিক-প্যানেল্ড সিঁড়িঘর দিয়ে নামতে শুরু করে রেডিওতে নির্দেশ দিতে শুরু করল: 'সোহেল, সবার কাজ বুঝিয়ে দে।'

'নিজে লড়তে পারলে খুশি হতাম,' বলল সোহেল।

'পরে সুযোগ পাবি। আমার সময় নেই, তুই যোগাযোগ কর্ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে।'

সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল । দ্রুত নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

লেফটেন্যান্ট আফতাব একটু গাঁইগুঁই করল। যা করতে বলা হচ্ছে, তাতে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে পরে পরিষ্কার করতে হবে গোটা জাহাজ।

প্রায় একই সঙ্গে জাদুর দোকানে পৌঁছে গেল রানা, ফেং ও নিশাত সুলতানা। এই প্রকাণ্ড ঘর একইসঙ্গে সেলুন এবং স্টোর। একদিকের দেয়ালে মেকআপ কাউন্টার। সামনে বিস্তৃত আয়না। দূরে র‍্যাক ভরা পোশাক, স্পেশাল এফেক্ট গিয়ার ও সব ধরনের প্রপ্স্।

ফেং ও নিশাতের পরনে কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম। কোমর থেকে ঝুলছে অ্যামিউনিশনের থলি, কমব্যাট ছোরা ও অন্যান্য গিয়ার। হাতে ব্যারেট আরইসি৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। এম১৬ রাইফেলকে ছাড়িয়ে এটাই এখন দুনিয়ার সেরা হিসাবে নাম করেছে।

'যা করার জলদি, বিল্লাহ,' তাড়া দিল রানা। 'আপা, ফেং, শার্ট পরে নিতে হবে।'

জাদুর দোকানে এক অংশে নানা ধরনের ছদ্মবেশ। মেকআপ আর্টিস্ট দু'হাত ভরা দিশদাশা নিয়ে তৈরি। আফ্রিকার এদিকে

অনেকে এই দীর্ঘ শার্ট পরে। সুতির কাপড় আগে সাদা ছিল, তবে পুরনো বানিয়ে ফেলেছে ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে। এখানে ওখানে নানা দাগ। ইউনিফর্মের উপর দিয়ে ঢিলাঢালা পোশাক পরে নিল ওরা। মনে হলো নিশাতকে সসেজ কেসিঙের ভিতর ভরা হয়েছে। ইউনিফর্ম ঢাকা পড়ল, তবে বেরিয়ে রইল কমব্যাট বুট।

সবার মাথায় কাফিয়ের মত করে কাপড় পেঁচিয়ে দিল মোফিজ বিল্লাহ। গায়ে মেখে দিল কালো মলম। প্রত্যেকে হয়ে উঠল সত্যিকারের আফ্রিকান। মোফিজ আরও কী করবে ভাবতে শুরু করেছে, কিন্তু বাধা দিল রানা, 'নিখুঁত হতে হবে না। মানুষ যা দেখতে চায় তা-ই দেখে। ছদ্মবেশের প্রথম শর্ত ওটা।'

রানার মাইক্রোফোনে ভেসে এল স্বর্ণার কণ্ঠ, 'আর দু'মিনিট পর মেইন হোল্ডে ঢুকবে দালমার আলী।'

'এত তাড়াতাড়ি? আমরা তৈরি নই। ...ব্রিজে কেউ আছে?'

'দুটো ছেলে। জাহাজের হুইল নিয়ে খেলছে।'

'ফগহর্নের ভেঁপু বাজিয়ে স্পিকার দিয়ে আওয়াজ পাঠিয়ে দাও হোল্ডে।'

'কেন, মাসুদ ভাই?'

'পরে বুঝবে, যা বলছি করো।'

ম্যানগ্রোভ জলাভূমির ভিতর ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। ফগহর্নের শব্দে চমকে গেল পাখিদল, ডাল ছেড়ে ছিটকে উড়ে গেল আকাশে। কেঁউ-কেঁউ করে উঠল ক্যাম্পের কুকুরগুলো, দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে লেজ। দালমার আলী ও তার সঙ্গীরা করিডোর ধরে মহা প্রাপ্তি দেখতে চলেছে, কিন্তু বিকট আওয়াজে ভড়কে গেল সবাই। দু' হাতে চেপে ধরল কান। আওয়াজ কমল না। প্রচণ্ড শব্দে থরথর করছে চারপাশ।

'দারুণ,' বলল স্বর্ণা। 'থমকে গেছে দালমার। এই মাত্র এক লোককে পাঠাল হুইলহাউসে। ছেলে দুটোর কান ছিঁড়বে এখন।'

'চারপাশের অবস্থা কী?'

'হর্ন বাজলে কী হবে, সোমালিয়ানরা যা পাচ্ছে লুঠ করছে। দুই মেয়েলোককে দেখলাম ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ম্যাট্রেস নিয়ে গেল। ছবিগুলো নিয়েছে আরও দুই মেয়েলোক। জানি না কেন, এক লোক টয়লেট থেকে কমোড উপড়ে নেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।'

'ওটায় বসেই তো রাজ্য চালাবে,' সোহেলের মন্তব্য।

রানাদের মেকআপ শেষ করে এনেছে মোফিজ বিল্লাহ্, এমন সময় দালমারের লোক পৌঁছুল ব্রিজে। পিছন থেকে দুই ছোকরার কান পাকড়ে ধরল সে, ভাল মত মুচড়ে দিল। কান ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাল ছেলেদুটো। কণ্ট্রোলের উপর হাত রাখতেই ভেঁপু থামিয়ে দিল স্বর্ণা। অবাক চোখে কণ্ট্রোল প্যানেলের দিকে চাইল লোকটা। এখনও কিছু ধরেনি সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল দালমার আলীর সঙ্গে কথা বলতে।

মার্ভেলের আর্মারার এল জাদুর দোকানে। প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল একটা করে কালাশনিকভ একে-৪৭। দেখে মনে হয় বহু বছর ব্যবহার করা। ঠিক জলদস্যুদের অস্ত্রের মত। তবে আসলে একদম নতুন। এ ছাড়া প্রত্যেককে দিল একটা করে ফিল্টার মাস্ক। রানা, ফেং ও নিশাতের শার্টের পকেটে চলে গেল ওগুলো।

'স্যর, কুচকুচে কালো আফ্রিকান হয়ে গেলাম, কিন্তু আপনার প্ল্যান তো বললেন না?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন নিশাত।

মৃদু হাসল রানা। 'নিনযা কালো পোশাকে দালমারকে ধরা যাবে না। তা ছাড়া, জাহাজে উঠেছে একদল লোক। কারও সন্দেহ উদ্রেক না করে দালমারের কাছে পৌঁছতে হবে। তারপর সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা।'

'আর দালমার যদি অ্যামোনিয়ামের ড্রাম খোলে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'দেখবে ভিতরে সাগরের পানি,' বলল সোহেল। 'সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করবে। পালাতে চাইবে মার্ভেল ছেড়ে।'

'পালাতে পারলে খুব দুঃখজনক হবে,' বলল বেনেডিক্টো।

'তাই তাড়াতাড়ি করছি,' বলল রানা। 'বিল্লাহ?'

দু' পা পিছিয়ে নিজের কাজ দেখল মেকআপ আর্টিস্ট। একটা ড্রয়ার থেকে দুটো সানগ্লাস বের করে ফেং ও রানার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এ দুটো পরলে ভাল হয়।' হাতে সময় নেই, নইলে মাসুদ ভাই ও নিশাত সুলতানাকে বানিয়ে দিতে পারত দালমার আলীর যমজ ভাই। একটু অসন্তুষ্টি নিয়ে সরে দাঁড়াল মোফিজ।

তার আগেই রওনা হয়ে গেছে রানা। পিছু নিল নিশাত সুলতানা ও গ্যাং ফেং।

'স্বর্ণা, দালমার এখন কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক হোল্ডের সামনে। সঙ্গে কমপক্ষে বারোজন গানম্যান। দালমারের সঙ্গে আলাপ করছে তার সাগরেদ গুলবুদ্দীন। এই কান থেকে ওই কান পর্যন্ত হাসি তার মুখে।'

'হাসছে বটে, কিন্তু আশা করা যায় খুব বেশিক্ষণ হাসবে না,' বলল সোহেল।

ফেং ও নিশাতকে নিয়ে একটা দরজা পেরিয়ে ঝকঝকে করিডোরে ঢুকে পড়ল রানা। পিপহোলের সামনে থামল। ওটা টু-ওয়ে আয়না। ওপাশের ঘরে কেউ নেই, অন্ধকার। সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। একটা ওভারহেড ফিক্সচার সরাতেই দেখা গেল ইউটিলিটি ক্লজিট বেরিয়ে এসেছে। মেঝেতে রাখা বালতির ভিতর ভেজা মপ। দেয়ালের তাকে সাবান, হারপিক ইত্যাদি। মার্ভেল জুড়ে অনেক গোপন প্যাসেজ রয়েছে, ওগুলোকে বলা হয় *ভিন জগতে যাওয়ার পথ*।

দরজার নবে হাত রেখে টের পেল রানা, দাঁড়িয়ে গেছে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। শীতল অনুভূতি নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কড়া ওষুধের মত শিরা দিয়ে দ্রুত চলছে অ্যাড্রেনালিন। জীবন হাতে নিয়ে লড়তে চলেছে। মনের ভিতর ভয় ও উত্তেজনা। সব দুঃসাহসী সৈনিকেরই এ অনুভূতি হয়। স্বীকার করে নেয়, সে ভয় পেয়েছে। নিজের ভয়কে জয় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে।

না থেমেই দরজা খুলল রানা, বেরিয়ে এল বাইরে। জাহাজের এদিকে দুই মেয়েলোক কার্পেট মুড়িয়ে কাঁধে নিয়ে চলেছে। ওগুলো কোনও কেবিনে ছিল। রানা বা ওর দলের কারও দিকে ঘুরেও চাইল না।

দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে রানা, ফেং ও নিশাত। পৌঁছে গেল স্টেয়ারওয়েলে। ওটা ধরে ফ্রেইটারের আরও গভীরে যেতে হবে। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সশস্ত্র প্রহরী। তাকে পাশ কাটাতে চাইল রানা, কিন্তু খপ করে ওর হাত ধরল লোকটা। যেতে দেবে না। সোমালিয়ান ভাষায় কী যেন বলল।

'দালমার আলীর সঙ্গে জরুরি কথা,' আরবিতে বলল রানা। ভাবছে, এই লোক আরবি বোঝে কি না কে জানে!

'না।' থমকে থমকে বলল লোকটা, 'তাকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বাংলায় বলেই এক পা পিছিয়ে গেল রানা, পরক্ষণে কাঁধের পুরো জোর দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার চোয়ালে। মেঝে ছেড়ে আধ ইঞ্চি উপরে উঠল লোকটার দুই পা।

ডানহাতের কব্জি বাম হাতে ধরল রানা। আরেকটু হলে মচকে যেত হাত। নিশাত ও ফেং ধরে ফেলেছে অজ্ঞান লোকটার দেহ। গুঁজে দিল ধাতব সিঁড়ির নীচে।

'মনে রাখতে হবে এ লোক সিঁড়ির নীচে থাকল, আপা,' বলল রানা। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা। স্বর্ণার কথা অনুযায়ী তিন মিনিট হলো হোল্ডে ঢুকেছে দালমার আলী। আশা করা যায় এখনও ড্রাম খোলেনি।

'লোকটা কী করে, স্বর্ণা?'

'পিকআপ ট্রাক দেখছে। ভাবটা এমন, চকলেটের দোকানে ঢুকেছে।'

'ঠিক আছে। সোহেল, আফতাবের সঙ্গে যোগাযোগ কর্। ধোঁয়া দিয়ে মশা দূর করুক। রায়হানের জল-কামান তৈরি?'

'তৈরি। হুড়মুড় করে নেমে যাবে লোকজন।'

'তা হলে কাজ শুরু করা যাক।'

মার্ভেলের বড় সুবিধা ওটার ইঞ্জিন সাধারণ কোনও মেরিন ডিজেল নয়। জাহাজ চলে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন দিয়ে। তরল হিলিয়াম স্ট্রিপ শীতল করে চুম্বকগুলোকে, সেগুলো সাগরের পানি থেকে মুক্ত করে অজস্র ইলেকট্রন। মেলে বিপুল পরিমাণে ইলেকট্রিসিটি। তা আবার শক্তি দেয় চারটে জেট পাম্পকে। ওই প্রচণ্ড ক্ষমতা সাগরের পানিকে বইয়ে দেয় জোড়া ডিরেকশনাল ড্রাইভের ভিতর দিয়ে। এগারো হাজার টনি জাহাজ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতি তুলতে পারে। মার্ভেল পুরনো জাহাজ, তা বোঝাতে রয়েছে দুটো জেনারেটার। প্রয়োজনে ওগুলো তৈরি করে ধোঁয়া, ভকভক করে বের হয় চিমনি থেকে। যে কারও মনে হবে, জাহাজের ইঞ্জিন অতি পুরনো, কোনও যত্ন নেয়া হয় না।

লেফটেন্যান্ট আফতাব আপাতত জেনারেটারের ধোঁয়া পাচার করবে ভেন্টিলেশন সিস্টেমে।

তিন নম্বর হোল্ডের সামনে পৌঁছে গেল রানা, ফেং ও নিশাত, চারপাশ দেখে নিল। ভেন্টিলেশন গ্রিল থেকে বেরুতে শুরু করেছে ধোঁয়া। নিচু সিলিঙে দ্রুত জমছে। জাহাজের ভিতর অংশে বিষাক্ত

ধোঁয়া তৈরি হতে কয়েক মিনিট লাগবে, পাগল করে দেবে সোমালিয়ানদের।

'ওই যে, হৈ-চৈ শোনা যায় হোল্ডের ভিতর,' বলল নিশাত।

'তৈরি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল ফেং ও নিশাত। দৌড়ে হোল্ডে ঢুকল ওরা।

'আগুন! আগুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

হেভি ডিউটি পিকআপগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী ও তার দলবল।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল দালমার।

'জাহাজে আগুন ধরে গেছে, খুব ধোঁয়া,' বলল রানা। জানে, আরবি শুনে অবাক হবে সোমালিয়ান গান-লর্ড। 'চারপাশে আগুন।'

ড্রাম ভরা অ্যামোনিয়ামের দিকে চাইল দালমার আলী। রানা নিশ্চিত নয় লোকটা কী ভাবছে। হয়তো আগুন ধরবার আগেই সরাতে চাইবে ড্রামগুলো। অথবা ভাবছে, একটু পর পুরো জাহাজ উড়ে যাবে। হোল্ডে ভেন্টিলেশন নেই, কিন্তু নাকে লাগছে ধোঁয়া। দরজার সামনে কুয়াশার মত ভাসছে। গুলবুদ্দীনের দিকে চাইল রানা। লোকটা টের পেয়েছে তার দিকে চেয়েছে কেউ। ঘুরে চাইল সে। যদি জানত ওই লোক জলদস্যুদের কতটা ঘৃণা করে, দেরি না করে পিস্তল বের করে গুলি করত গুলবুদ্দীন।

রেডিও করল স্বর্ণা, 'মাসুদ ভাই, মেয়েলোক আর বাচ্চারা যাচ্ছে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে। তবে ধোঁয়াকে একটুও পাত্তা দিচ্ছে না যোদ্ধারা।'

'তুমি নিজের চোখে আগুন দেখেছ?' জানতে চাইল দালমার।

'ঠিক তা-না, স্যর।'

কড়া চোখে রানার দিকে চাইল দালমার। 'আমি তো তোমাকে চিনি না! তোমার নাম কী?'

'জব্বার, স্যর।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

মহাবিরক্ত হলো রানা। আরে শালা, জাহাজে আগুন ধরেছে, দরজার কাছে ঝুলছে ধোঁয়া, আর আমার জীবনের ইতিহাস জানার সময় হলো তোর?

'স্যর, এখন কথার সময় না।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক এত ভয় কীসের। আমার তো ধারণা গ্যালিতে খাবার পুড়িয়ে ফেলেছে কেউ।'

ফেংকে হাতের ইশারা করল রানা, ভঙ্গি নিল আবার ফিরবে সিঁড়ির গোড়ায়।

দলবল নিয়ে হোল্ডের মাঝে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী। ভাব দেখে মনে হলো, নড়বে না। আবার ইশারা করল রানা। হোল্ডের ওয়াটার-টাইট দরজার ওপাশে গিয়ে থামল ফেং, ঘুরে চাইল। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। দালমার আলী দরজার কাছে আসতেই তাড়া দিল, 'দেরি করবেন না।' একহাতে লোকটার কনুই ধরল, অন্য হাত ধরেছে নিশাত।

দরজা পেরিয়ে গেল তিনজন। পিছু নিল দালমারের যোদ্ধারা। আর তখনই সিলিং থেকে সড়াৎ করে নামল স্টিলের প্যানেল। হাইড্রোলিক শক্তি মেঝের সঙ্গে আটকে দিল ওটাকে। সব এত দ্রুত ঘটল, ওপাশে রয়ে গেল দালমারের কয়েকজন লোক। এক সেকেণ্ড আগে ছিল খোলা পথ, পরমুহূর্তে ধাতব দরজা বন্ধ করে দিল করিডোর।

ট্র্যাপডোরের কারণে দালমারের অর্ধেক লোক আটকা পড়েছে হোল্ডের ভিতর। তবুও রয়ে গেছে অন্তত ছয়জন। মুখোমুখি গোলাগুলি হলে কে বাঁচবে আর কে মরবে, ঠিক নেই!

'কী হলো ওটা?' কাউকে নয়, যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করল দালমার আলী।

গুলবুদ্দীনের মনে পড়ল শাহিনের বলা বিদঘুটে কাহিনি। খালি পড়ে ছিল মেস হল। কুসংস্কার নিয়ে চারপাশে চাইল গুলবুদ্দীন, চোখে ভয়। এ জাহাজে ভুতুড়ে কিছু ঘটছে, কোনও সন্দেহ নেই। তার মনে হলো প্রথম কাজ হওয়া উচিত জাহাজ থেকে নেমে পড়া।

দুই দস্যু চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু স্টিলের পাত তোলা গেল না। ওপাশ থেকে চেঁচামেচি করছে সঙ্গীরা। এদিকে ঘন হয়ে উঠছে ধোঁয়া।

'ওরা থাকুক,' হঠাৎ গলা উঁচু করল দালমার। বুঝতে পেরেছে কোথাও বড় ধরনের গোলমাল দেখা দিয়েছে। আর দেরি না করে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ধাপ বেয়ে উঠছে, খেয়াল করল না, এক লোককে সিঁড়ির গোড়ায় রেখে গেছিল, কিন্তু সে নেই। হোল্ড থেকে দ্রুত হেঁটে বেরিয়েছে দালমার, কিন্তু এখন লাফিয়ে ধাপ পেরুচ্ছে। সুযোগ পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।

লোকটার সহজাত বোধ-বুদ্ধি ইঁদুরের মত, ভাবল রানা। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে টের পেয়ে গেছে, এবার তাকে পালাতে হবে। পিছু নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে তার লোক।

হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রানা, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল। 'স্বর্ণা, আমাদের ট্র্যাক করছ?'

'জী।'

'অত গার্ড থাকলে দালমারকে ধরা সম্ভব নয়। আমরা যখন ডেকে বেরুব, নবী যেন আমাদের দিকে জল-কামান তাক করে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল রানা। করিডোর পেরিয়ে সামনে পড়ল গোপন এক দরজা। ওটা পাশ কাটিয়ে বেরুল ডেকে। একটু দূরে গ্যাংপ্লাঙ্ক। ছায়াচ্ছন্ন সুপারস্ট্রাকচার থেকে সূর্যালোকে

বেরুতেই ওদের দিকে ছিটকে এল পানির শক্তিশালী ধারা। ফায়ার-সাপ্রেশন কামান সোজাসুজি লাগল দালমারের বুকে। পিছিয়ে নিজের লোকের উপর পড়ল সে। সেখান থেকে হুড়মুড় করে ডেকে। তিন সোমালিয়ান পড়েছে তার সঙ্গে। দু'জন এখনও পড়েনি। বিরাট দুই হাত দিয়ে তাদের ধরল ক্যাপ্টেন নিশাত, ঠাস্ করে ঠুকে দিল মাথা দুটো। ভোঁতা আওয়াজ হলো। আস্তে ঠুকেছে, চাইলে মাথা ফাটিয়ে মগজ বের করে দিতে পারত। তবে এতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দুই সোমালিয়ান।

গুলবুদ্দীনের দুই ঊরুর ফাঁক দিয়ে গেছে জল-কামানের ধারা। সেদিকে চোখ নেই তার, অবাক হয়ে গেছে রানাকে দেখে। সাগরের পানি ধুইয়ে দিয়েছে রানার মেকআপ। এখন আর ও আফ্রিকান নয়! চোখ থেকে খসে পড়েছে সানগ্লাস। জল-কামানের ধাক্কা খেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করেছে কিছু মেয়েলোক, কিন্তু তাদের চিৎকার ছাপিয়ে উঠল গুলবুদ্দীনের বেসুরো কণ্ঠ: 'আরে, আরে! এ ক্বে!' দু'হাতে কোমরের কাছে তুলে ফেলল একে-৪৭। কিন্তু সুযোগ পেল না, ওর বুকে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল রানা। ধাক্কা খেয়ে রেলিঙে গিয়ে পড়ল গুলবুদ্দীন। কোমরে ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু তর্জনী পেঁচিয়ে ধরল ট্রিগারটা।

এক পশলা বুলেট বেরিয়ে গেল রাইফেল থেকে। কপাল ভাল মেয়েমানুষ ও বাচ্চাদের মাথার উপর দিয়ে গেল গুলি। তবে ওটার কারণে পাগল হয়ে উঠল তারা। এমনিতেই নামছিল, কিন্তু এবার শুরু হলো স্ট্যাম্পিড। সশস্ত্র লোকগুলোর চোখে পড়ল এ দৃশ্য।

নিজের রাগ ঝাড়ল রানা গুলবুদ্দীনের পেটে, গেঁথে দিল এক কনুই। ডেকে ছিটকে পড়ল কালাশনিকভ। গলফ বলের মত হয়ে উঠল লোকটার দুই চোখ। ফুসফুস ফাঁকা হওয়ায় বিশাল হাঁ করল। দ্বিতীয়বারের মত হাত তুলল রানা, লোকটার চোয়ালে

নামল প্রচণ্ড ঘুসি। ধাক্কা সামলাতে পারল না গুলবুদ্দীন, রেলিং টপকে পড়ে গেল। সামনে বেড়ে নীচে চাইল রানা। গুলবুদ্দীনের কপাল মন্দ, এক চিলতে পানি নেই ওখানে, লোকটা নেমেছে একটা ট্রলারের ট্র্যানসমের উপর। ওই ট্রলার থেকেই মার্ভেলে উঠেছিল। এখন বেকায়দা ভাবে কাত হয়ে পড়ে আছে। ঘাড়ের ওই অ্যাঙ্গেল দেখেই বোঝা গেল, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

অখুশি হতে পারল না রানা। সোমালিয়ান মেয়েলোকদের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করল। জল-কামান থেকে বেরুচ্ছে শক্তিশালী ধারা। ছিটকে লাগছে জাহাজের গায়ে। চারপাশে এত জলকণা, যেন সাইক্লোন বইছে। চারপাশে ছেলে-মেয়েরা কাঁদছে মায়েদের সঙ্গে নেমে যেতে চাইছে জাহাজ থেকে।

ওদের কেউ দেখল না রানা কুচকুচে কালো নয়, বাদামী রঙের। কিন্তু ঠিকই লক্ষ্য করল এক লোক। মোটা এক তোড়া অফসেট কাগজ ও একটা প্লাস্টিকের টুল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল, কিন্তু এবার বিকট হাঁ করল চিৎকার দিয়ে লোক জড়ো করতে। এক লাফে তার পাশে পৌঁছুল রানা, কাঁধ ঘুরিয়ে ঘুসি মারল থুতনির নীচে।

ধপ করে ডেকের উপর পড়ল সে। কিন্তু পড়েই জড়িয়ে ধরল রানার বাম গোড়ালি। পা ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা, কিন্তু লোকটা যেন শক্তিশালী মোরে ঈল। দেরি করল না রানা, ধপাস্ করে ডান পা নামিয়ে আনল লোকটার মুখের উপর। বুটের চাপে মুড়মুড় করে ভাঙল আট-দশটা দাঁত। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা, গ্যাঁ-গ্যাঁ আওয়াজ করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ।

ঝটকা দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিল রানা, এক দৌড়ে হাজির হলো গ্যাং ফেং ও নিশাতের পাশে।

এদিকে উঠে দাঁড়াতে চাইছে দালমার আলী। প্রবল পানির ধারা সরিয়ে দিয়েছে গায়ের শার্ট। বুকে দেখা গেল কিছু

শ্র্যাপনেলের দাগ। দাড়ি থেকে চুইয়ে ঝরছে পানি। লোকটা যেন পানিতে চুবানি খাওয়া ইঁদুর। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যে করে হোক মার্ভেল থেকে নেমে পড়বে। টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল, পরক্ষণে শুরু করল দৌড়।

কিন্তু সোমালিয়ান ওয়ার লর্ডের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল ক্যাপ্টেন নিশাত। 'এত জলদি না, দোস্ত,' দালমারের ডানহাত পেঁচিয়ে উপরের দিকে ঠেলল সে, আরেক হাতে হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল।

'আমাকে বাঁচাও! তোমরা কোথায়!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

জল-কামান চালু হওয়ার পর দশ ফুট দূরেও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দালমারের চিৎকারে সাড়া দিল তার লোক। এক হাতে চোখ ঢেকে এদিকে আসছে, আরেক হাতে রাইফেল। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। পলকের নোটিসে গুলি করবে।

'জলদি!' নির্দেশ দিল রানা। নিশাতের পাশে সাহায্য করছে দালমারকে টেনে নিয়ে যেতে। সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল দলটি। পিছন দিক কাভার করছে ফেং।

জল-প্রপাতের মত পানির ধারা ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকজন জলদস্যু। আঁধার জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষা করল দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। আর তখনই খেয়াল করল, তাদের নেতাকে ধরে নিয়ে চলেছে তিন লোক। দালমারের নিরাপত্তার কথাও ভুলে গেল সোমালিয়ানরা, শুরু করল গুলি-বর্ষণ।

রানার ঘাড়ে গরম তাপ লাগল, বুলেটগুলো সিলিঙে পিছলে চলে গেল প্যাসেজওয়ে ধরে।

পিছানোর ফাঁকে গুলি করছে গ্যাং ফেং, ওর দুটো গুলি ফেলে দিল এক লোকের একে-৪৭, তারপর সিলেক্টর সুইচ অটোমেটিক ফায়ারে নিয়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন। তিন জলদস্যু মেঝের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে একটা বাঁক ঘুরল রানা, নিশাত ও ফেং।

সবার সামনে ছুটছে রানা, খেয়াল করে শুনছে স্বর্ণার সতর্ক-বাণী। জলদস্যুরা এখনও রয়ে গেছে জাহাজে। আরেকটা বাঁক ঘুরবে ওরা, তখনই জানাল স্বর্ণা ক' ফুট সামনেই এক সশস্ত্র সোমালিয়ান। থমকে গিয়ে উঁকি দিল রানা, লোকটার পিঠ ওর দিকে তাক করা। সামনে বেড়ে লোকটার মাথার পিছনে রাইফেলের বাঁট নামিয়ে নামল রানা।

হিসাবে ভুল করেছে, অথবা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত খুলি ওই লোকের। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল, কারবাইনের নল দিয়ে গুঁতো দিতে চাইল রানার পেটে। একবার পিছিয়ে গেলেই গুলি করবে।

বাম পা তুলে নলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দিল রানা। হ্যাঁচকা টানে ব্যারেল ছাড়িয়ে নিতে চাইল সোমালিয়ান, কিন্তু পারল না। হাতের একে-৪৭ বেস ব্যাটের মত চালাল রানা, দ্বিতীয়বারের মত রাইফেল নেমে এল লোকটার মাথার উপর। এবার ফট্টাশ্ আওয়াজ তুলে ফাটল মাথা, ধপাস্ করে পড়ল সে মেঝের উপর। অজ্ঞান।

এক সেকেণ্ড পর আবার সতর্ক-বাণী এল স্বর্ণার কাছ থেকে। করিডোরের দূরে চোখ পড়ল রানার। মেস হল থেকে বেরিয়ে আসছে দুই জলদস্যু, রাইফেলের নল থেকে বেরুচ্ছে কমলা ঝলকানি। একটা গুলি লাগল রানার পেটে, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। বুলেট-প্রুফ ভেস্ট না থাকলে মরত আজই। বেকায়দা ভাবে কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে রানা, কিন্তু বাহু ধরে সোজা করে দিল ফেং, একটানে সরিয়ে নিল বাঁকের এপাশে।

'আপনার কী অবস্থা, স্যর?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইল নিশাত।

পেটে হাত বোলাল রানা, ভীষণ ব্যথা করছে। 'কমে আসছে ব্যথা।' ওর কান থেকে খসে পড়েছে হেডসেট। ওটা ঠিক করে নিল। 'সামনে কী ঘটছে, স্বর্ণা?'

'ওই দু'জন মেস হলের দরজার আড়ালে কাভার নিয়েছে। এ দিকে পিছন থেকে আসছে আরও ছয়জন।'

'ফেং, তুমি পিছন করিডোর সামলাও।'

করিডোরের আরেক পাশে একটা কেবিনে ঢুকতে চাইল রানা। কিন্তু দরজা লক্ করা। সময় পায়নি বলে তালা ভেঙে লুটপাট করতে পারেনি সোমালিয়ানরা। হ্যাণ্ডেলের ভিতর মাস্টার কী ঢোকাল রানা, তালা খুলে ঢুকে পড়ল কেবিনে। এটা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নকল কেবিন, ক্যাপ্টেনের ঘরের থেকে ছোট। মার্ভেলকে ধচাপচা জাহাজ বোঝাতে বাইরের সব ফার্নিচার সস্তা কেনা হয়েছে। দেয়ালে বুল-ফাইটিঙের পোস্টার। আরেক দেয়ালে কয়েকটা সেইলিং বোটের ছবি। কেবিনের আরেক প্রান্তে পৌঁছে গেল রানা, থামল পোর্সেলিন বেসিনের সামনে। আয়নাটা বাল্কহেডের সঙ্গে গ্লু দিয়ে আটকানো। একে ৪৭-এর নল দিয়ে আয়নায় খোঁচা দিতেই ভেঙে পড়ল কাঁচ। টুকরোগুলো থেকে একটা বেনসনের প্যাকেটের সমান কাঁচ তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল করিডোরে।

বাঁক নেয়ার আগে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল, সাবধানে আয়নার টুকরো ওদিকে বের করল। হলওয়েতে দেখা গেল দুই সোমালিয়ানকে। প্রথমজন উবু হয়ে বসেছে মেস হলের দরজার পাশে। পিছনে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয়জন। এরা করিডোরের বাঁকের দিকে তাক করে রেখেছে রাইফেল। তবে স্বল্প আলোয় আয়না দেখতে পেল না।

অতি ধীরে বাঁকের ওপাশে পার করিয়ে দিল রানা ব্যারেলের আধ ইঞ্চি। একটু দূর থেকে চোখে পড়বে না। আরেকবার আয়না

দেখে নিল। আন্দাজের উপর নির্ভর করে কালাশনিকভের ব্যারেল আরও এক ইঞ্চি উঁচু করল। পরক্ষণে স্পর্শ করল ট্রিগার।

মেস হলের দরজার পাশে লেগে পিছলে গেল বুলেট, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। সরু ফাটলে বেকায়দা ভাবে আটকা পড়েছে লোকদুটোর রাইফেলের ব্যারেল। দরজা ঠিক ভাবে বন্ধ হওয়ার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। জলদস্যুরা অস্ত্র সরিয়ে নিতে পারল না, দরজা খোলা আর হয়ে উঠল না তার আগেই এক দৌড়ে পৌঁছে গেল রানা। সামান্য ফাঁক হওয়া দরজার পাশ দিয়ে ভরে দিল রাইফেলের নল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল এক পশলা। কবাটে ছলাৎ করে লাগল উষ্ণ রক্ত। এক টানে ব্যারেল বের করে নিল রানা। ভিজে গেছে ওটা। দরজা খুলতেই দেখা গেল চিত হয়ে পড়ে আছে দুই জলদস্যুর লাশ, বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

নিশাত ও ফেংকে হাতের ইশারা করে রওনা হয়ে গেল রানা। দালমার আলীকে প্রায় কোলে নিয়ে ছুটছে নিশাত। সঙ্গীদের দিকে পিঠ দিয়ে দৌড়ে পিছিয়ে আসছে ফেং।

'ওরা আসছে,' সাবধান করল স্বর্ণা।

ছ'জন সোমালিয়ান, জানে রানা। একে-৪৭ থেকে ম্যাগাজিন খুলে ফেলল, বদলে নতুন ক্লিপ আটকে নিল। চেম্বারে এখনও একটা বুলেট। নিয়ম এটাই, যতই লড়তে হোক, অস্ত্র পুরোপুরি খালি করা চলবে না। এর ফলে নতুন করে কক্ করতে হয় না অস্ত্র। করিডোরের বাঁকে ছায়া পড়তেই গুলি শুরু করল রানা। লোকগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। ওদের নিজেদের সময় লাগবে কাভার খুঁজে নিতে।

বদ্ধ পরিবেশে গুলির আওয়াজ কান ফাটানো। ভেন্টিলেটার থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে করডাইটের দুর্গন্ধ। বেশিদূর দেখা যায় না। দম আটকে আসছে।

পিছনে ফেলে আসা করিডোরে দেখা গেল কমলা ঝিলিক। লোকগুলো ওখান থেকে গুলি শুরু করেছে। হাত-পা ছড়িয়ে পড়তে লাগল ফেং। দেখে মনে হলো পিছন থেকে কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়েছে। দু'হাত দিয়ে পতন ঠেকাতে পারল না, পিছলে পড়ল রানার পায়ে। বাম হাতে খপ করে ওর কলার ধরল রানা, টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল মেস হলে। অন্য হাতে গুলি ছুঁড়ছে করিডোর লক্ষ্য করে।

শক্তিশালী দুই হাতের ভিতর ছটফট করছে দালমার আলী, ছুটে যেতে চাইছে, ঘাড়-পিঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে মেস হলে ঢুকিয়ে দিল নিশাত। এত বিপদের ভিতর এখনও দুই লোক কিচেনের দরজা দিয়ে স্টোভ বের করতে চাইছে, নিয়ে যাবে বাড়িতে। এক মুহূর্তে বুঝল আরেকদল ঢুকেছে ঘরে, এরা তাদের নিজেদের লোক নয়। হাত থেকে স্টোভ ফেলে দিল তারা, বার্নার পেরিয়ে তুলে নিতে চাইল অস্ত্র।

কোমরের কাছে রাইফেল তুলেই গুলি করল রানা, নিখুঁত হলো লক্ষ্য-ভেদ। বিস্ফোরিত হলো লোকদুটোর বুকের চামড়া, ছিটকে বেরুল রক্ত ও ছেঁড়া পেশি।

লুকানো ক্যামেরা থেকে মার্ভেল টিমকে দেখছে স্বর্ণা। খুলে গেল একটা বাল্কহেডের গোপন দরজা। সাহায্য করবার জন্য দু'জন ক্রুকে পাঠিয়ে দিয়েছে সোহেল। দশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই দালমার আলীকে ধাক্কা দিয়ে দরজা পার করিয়ে নিজেরাও ঢুকে পড়ল গোপন কক্ষে। নিচু স্বরে গোঙাচ্ছে ফেং। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। সাবধানে তাকে কাঁধে তুলে নিল রানা, ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। এরপর ঢুকল নিশাত সুলতানা, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। হাঁপাচ্ছে সবাই। টপ-টপ করে পানি পড়ছে দুর্লভ কার্পেটের উপর।

দুই মুহূর্ত বিশ্রাম নিল রানা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'এর

চেয়ে অনেক ভাল করা উচিত ছিল আমাদের।'

'ঠিক বলেছেন, স্যর,' সায় দিল নিশাত।

ফেঙের দিকে চাইল রানা। 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের একটা প্লেটে লেগেছে গুলি। ব্যথার চোটে জান খারাপ, তবে পাঁচ মিনিট পর লড়তে পারব।'

সিলভিও বেনেডিক্টোর পাশে হেঁটে এসে থামল ডাক্তার ফারা। পারনে সাদা ল্যাব কোট, ডান হাতে চামড়ার মেডিক্যাল ব্যাগ। মেয়েটির বয়স বড়জোর ছাব্বিশ, দক্ষ ডাক্তার না হয়ে সুপার মডেল হতে পারত।

'তোর মাল তো আস্ত পেলি,' সিলভিওর দিকে চাইল রানা।

মাথা দোলাল ইণ্টারপোল ইন্সপেক্টর। দৃষ্টি ফেলল দালমার আলীর উপর। 'আস্ত কে চেয়েছে? হাত-পা ভাঙা থাকলেও চলত। জান থাকলেই হলো।'

'আপনারা কারা?' বিশ্রী উচ্চারণে ইংরেজি বলল দালমার। 'আপনারা আমাকে বন্দি করতে পারেন না। আমি সোমালিয়ান নাগরিক, কাজেই আমার আইনগত অধিকার আছে।'

'কাস্টম্স্ পার হয়ে জাহাজে উঠবার পর তুমি সোমালিয়ায় নেই,' বলল সিলভিও। 'তুমি আছ অন্য আরেক দেশে।'

রানার মন চাইল, লোকটার কণ্ঠ থেকে নেকলেস ছিঁড়ে নিয়ে গিলিয়ে দেয়।

মেঝের উপর ব্যাগ রাখল ফারা, ভিতরে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর বের করল একটা সিরিঞ্জ ও সার্জিকাল কাঁচি। দু'হাতে দালমারকে পাকড়ে ধরেছে নিশাত। কাঁচি দিয়ে লোকটার আস্তিন কাটল ফারা, অ্যালকোহলে চোবানো তুলা দিয়ে পরিষ্কার করল ত্বক।

'আপনি কী করতে চাইছেন?' বিস্ফারিত হলো লোকটার চোখ। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে। কিন্তু নিশাতের দুই

হাত যেন লোহার পাত দিয়ে তৈরি। 'আপনারা আমাকে নির্যাতন করতে পারেন না!'

পাশে দাঁড়িয়েছে রানা। নিশাতের কাছ থেকে দালমারকে ছুটিয়ে নিল, এক হাত রাখল লোকটার গলার উপর। পরক্ষণে করিডোরের উল্টো দেয়ালে ঠেসে ধরেই উপরের দিকে তুলে ফেলল। দু'জনের চোখ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। শ্বাস আটকে যাওয়ায় ঘড়ঘড় শব্দ শুরু করল দালমার। কেউ সাহায্য করছে না তাকে। থমকে গেছে সিলভিও বেনেডিক্টো। ভাবতে পারেনি এত রাগ থাকতে পারে রানার মনে। থমথম করছে ওর মুখটা।

'নির্যাতনের কথা বলছ? নির্যাতনের কী দেখেছ তুমি?' বাম হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে দালমারের কাঁধের নার্ভে চাপ তৈরি করল রানা। লোকটা বুঝতে শুরু করেছে আগুনে ঝলসালে কেমন লাগতে পারে। কুকুরের বাচ্চার মত কিঁউ-কিঁউ করে উঠল দালমার। করিডোর ভরে উঠল কাতর ধ্বনিতে। চাপ আরও বাড়াল রানা। প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইল দালমার। যদিও সেটাকে মনে হলো কোনও বেসুরো বেহালার উপর ছড় বোলানো হচ্ছে। 'মানুষের এমনই লাগে, যখন তোমরা তাদের সব কেড়ে নাও।'

'যথেষ্ট, রানা,' কাঁপা স্বরে বলল ফারা।

হাত সরিয়ে নিল রানা। ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল দালমার আলী। এক হাতে ধরেছে গলা, অন্য হাতে কাঁধ। সশব্দে কেঁদে চলেছে। ঠোঁটের দুই কষায় জমে উঠেছে ফেনা।

'জানতাম,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'তোমার মত লোক আসলে ভিতু হয়।'

'এখন ওর চ্যালারা দেখলে অবাক হতো,' বলল নিশাত।

আত্ম-প্রচারকারী খুনির উপর ঝুঁকে পড়ল ফারা, বাহুতে গেঁথে

দিল নিডল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই মণি দুটো উল্টে গেল দালমারের। অচেতন।

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, রানা,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল সিলভিও। 'দারুণ একটা মিশন শেষ হলো।'

'এখনও শেষ হয়নি। এ দেশের জল-সীমা থেকে সরে যেতে হবে, আর ওই কুকুরটাকে মার্ভেল থেকে বিদায় করতে হবে।' রেডিওতে বলল রানা, 'সোহেল, আফতাবকে জানিয়ে দে ধোঁয়া বন্ধ করুক। ...স্বর্ণা, পরিস্থিতি বুঝিয়ে দাও সোহেলকে।'

'যে জলদস্যুরা পিছন থেকে এসেছিল, তারা মেস হলের ভিতর ঘুরঘুর করছে। একজন পরীক্ষা করছে লাশ। জল-কামান যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখিয়েছে ডেকে। দ্রুত নেমে পড়ছে লোকজন।'

'আন্দাজ কতজন রয়ে গেছে জাহাজে?'

'বিয়াল্লিশ। হোল্ডের খানিক আগে সিঁড়ির নীচে যে লোক ছিল, তাকে ধরে। তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পানিতে ফেলে দিলেই জ্ঞান ফিরবে।'

'মার্ভেলকে ডক থেকে সরানোর জন্য তৈরি থাকো, গগল।' বিরতি নিল সোহেল, তারপর রানার কাছে জানতে চাইল, 'যেসব জলদস্যু সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর ঘুরছে, তাদের কী করবি?'

'প্রতিটা দরজা বন্ধ করে দে। আর্মারারকে বল, এখানে পৌঁছে দিক ট্র্যাঙ্কুলাইযার গান। সঙ্গে নাইট ভিশন গগলস।'

অপারেশন্স সেন্টারে নির্দেশ দিতে শুরু করেছে সোহেল।

'বন্ধ করে দিচ্ছি দরজা,' ওঅর্ক স্টেশন থেকে জানিয়ে দিল রায়হান রশীদ। কি-বোর্ডে শেষ টোকা দিতেই সুপারস্ট্রাকচারের চারপাশের সমস্ত দরজা-জানালা ও হ্যাচ হারিয়ে গেল স্টিলের পাতের আড়ালে। কোথাও যাওয়ার পথ থাকল না। অন্ধকার বাক্সে পরিণত হয়েছে সুপারস্ট্রাকচার।

বিড়াল এই গাঢ় আঁধারে হয়তো দেখবে, কিন্তু নাইট ভিশন গগলস না থাকলে যে-কোনও লোক এখানে অন্ধ।

ইন্টারনাল ক্যামেরাগুলোর থার্মাল ইমেজিং চালু করল স্বর্ণা। ফিডগুলো স্ক্যান করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর প্রতিটি কমপার্টমেন্ট ও হলওয়ে দেখা হয়ে গেল। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর রয়ে গেছে তেরোজন লোক। ক্যামেরার লো-লাইট মোড দিতেই বোঝা গেল, প্রত্যেকে সশস্ত্র। স্পিকারে ভেসে আসছে তাদের আলাপ। ঘুটঘুটে আঁধারে নড়বার সাহস নেই কারও।

স্বর্ণা ওর ফাইনাল রিপোর্ট দিল সোহেলের কাছে।

রেডিওতে জানতে চাইল রানা, 'কী বুঝছিস, সোহেল?'

'ভিতরে তেরোজন। মেস থেকে বেরিয়ে গেছে জলদস্যুরা, এখন আছে হলওয়েতে। ...পরিস্থিতি খারাপ না। শিকারে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে পৌঁছে গেল আর্মারার।

সোহেলদের দুই ডেক উপরে হলওয়ের বাতি নিভিয়ে দিল রানা। পরে নিল থার্ড জেনারেশন নাইট ভিশন গগলস। হাতে আধুনিক চেহারার পিস্তল। ওয়ালনাট দিয়ে তৈরি বাঁট। ব্যারেলটা বেশ লম্বা। কমপ্রেস্‌ড্ গ্যাস দিয়ে চলে ট্র্যাঙ্কুলাইযার গান। ভিতরে রয়েছে ঘুমের ওষুধ মাখানো দশটি নিডল। স্বাভাবিক কোনও লোককে নয় সেকেণ্ডে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কেউ ভাবতে পারে অল্প সময়ে অচেতন করা যায়। কিন্তু ওই সময়ে অটোমেটিক অস্ত্রের পুরো ম্যাগাজিন খালি করবে যে-কোনও লোক। তাই আঁধারেই শিকার করতে হবে।

গ্যাং ফেং ও নিশাত অস্ত্র নিয়ে তৈরি।

আবারও গোপন দরজা খুলল রানা। গগলসের কারণে চারপাশ ভুতুড়ে সবুজ মনে হচ্ছে। কিছু জায়গা উজ্জ্বল সাদা লাগল চোখে। নাইট ভিশন গগলস পরে ট্রেইনিং করেছে বলে

সহজে কোনটা কীসের প্রভা বুঝতে পারছে ওরা। পিছনে দরজা আটকে যেতেই নিঃশব্দে এগুলো তিন শিকারি। মেস হলের দরজার সামনে একটু থামল রানা। বাতাসে ভাসছে ধোঁয়ার গন্ধ।

'আপনার ডানদিকে তিনজন, মাসুদ ভাই,' ট্যাকটিকাল নেটে বলল স্বর্ণা। 'করিডোরে, দশ ফুট দূরে। পা টিপে টিপে উল্টো দিকে এগুতে চাইছে।'

হাতের ইশারা করে তথ্য বিনিময় করল রানা। ভূতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একই সঙ্গে তাক করল তিন শিকারের উপর। ফিসফিস আওয়াজ তুলল ট্র্যাঙ্কুলাইযার গান। সুইগুলো লক্ষ্যে পৌঁছুবার আগেই আবার মেস হলে ফিরল ওরা।

অতি সূক্ষ্ম পিন কোনও সমস্যা না করেই পোশাক ভেদ করে বিঁধল কাঁধের মাংসে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি হওয়ায় পাঁই করে ঘুরল লোকগুলো। তাদের একজন ভয় পেয়ে ট্রিগার টিপে দিল। মাযল ফ্লাশ দেখিয়ে দিল করিডোর ফাঁকা। বারো ঘণ্টার ভিতর আবারও ভূতের কবলে পড়েছে শাহিন ও হাকিম।

'এই জাহাজ চালায় খুব খারাপ জিন,' কাতর স্বরে বলল শাহিন। পরক্ষণে তাকে ধরে বসল কড়া ড্রাগ। ঢলে পড়ে গেল। হাকিম তার চেয়ে শক্তিশালী, কয়েক সেকেণ্ড টলল সে, তারপর ধপাস্ করে পড়ল মেঝের উপর। তার উপর পড়েছে তৃতীয় লোকটা।

'আরও দশজন,' জানিয়ে দিল স্বর্ণা।

'আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে,' বলল সোহেল।

'বল্?' জানতে চাইল রানা।

'তীরে দালমারের লোক সংগঠিত হয়ে উঠছে। তাদের কেউ কেউ মার্ভেলে উঠে নেতাকে মুক্ত করতে চাইছে। ত্রিশজন মত লোক উঠে আসতে পারে।'

'কী করবি?'

'নবীকে বলছি ডেকের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান চালু করুক, ভয় পাইয়ে দিক ওদেরকে। এদিকে ডক থেকে মার্ভেলকে সরিয়ে নিক গগল।'

'আমি হলেও একই নির্দেশ দিতাম,' সায় দিল রানা।

নির্দেশের অপেক্ষা করেনি ক্যাপ্টেন নবী, ডেকে তেলের ড্রাম থেকে নাক বের করল মেশিনগান। সোজা তাক করল তীরের উপর। অস্ত্র বিশেষজ্ঞের কমপিউটার আদেশ দিতেই একটা ক্যামেরা ওদিকের দৃশ্য দেখাতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঝা গেল ঠিক কোথায় গিয়ে আঘাত হানবে বুলেট।

খ্যাট্-খ্যাট্ শব্দ তুলল মেশিনগান। ডেকে ছিটকে পড়ছে বুলেট কেসিং। ভিড় করা সোমালিয়ানদের মাথার উপর দিয়ে গেল প্রথম ধাতব শিলা-বৃষ্টি। মাটিতে ধুপধাপ শুয়ে পড়ল বেশিরভাগ লোক। একটা উঁচু বাঁধের ওপাশে লুকালো কয়েকজন। কেউ কেউ পাল্টা গুলি করল। ধূমায়িত মেশিনগানের চারপাশে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। ৭.৬২ এমএম রাউণ্ড গণ্ডার ঠেকাতে পারে না, ডেক ভেদ করা অনেক দূরের কথা।

এদিকে ডায়াল করে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনকে শক্তি দিল গগল। জলাভূমির ভিতর অংশ অত্যন্ত ক্লেদাক্ত, তবে তার সঙ্গে মিশেছে ভাল পানি। তা ছাড়া পানিতে রয়েছে যথেষ্ট লবণ, ফলে মার্ভেলের ইঞ্জিনের আশি ভাগ শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। রিভার্স থ্রাস্ট এনগেজ করল গগল। বিশাল হাইড্রো পাম্পগুলো কাজ শুরু করল। মার্ভেলের বো'র সামনে টগবগ করে ফুটছে পানি। কাঠের ডক থেকে পিছাতে শুরু করেছে বিশাল ফ্রেইটার।

জলদস্যুদের বেঁধে রাখা দড়িগুলো ধনুকের ছিলার মত টানটান হলো, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ছিঁড়ে গেল। ডক থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট পিছিয়ে গেল গগল, তারপর চালু করল

ডাইনামিক পজিশনিং সিস্টেম। এবার জিপিএস কোঅর্ডিনেটস পাবে মার্ভেল।

কিন্তু বাঁধের ওপাশ থেকে হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ উঠল।

পিছনে ধোঁয়ার দীর্ঘ লেজ রেখে একের পর এক আসছে রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড!

সাত

কলিশন অ্যালার্মের বাটন টিপে দিল খোরশেদ নবী। প্রতিটি ডেক ও কম্পার্টমেন্টে শুরু হলো ইলেকট্রনিক সতর্কসঙ্কেত। জাহাজের সবাই ভাল করে চেনে ওই আওয়াজ।

এত কম রেঞ্জে ২০ এমএম গ্যাটলিং গান চালু করে ফায়দা হবে না। তবে দ্বিতীয় দফা হামলার জন্য তৈরি থাকল নবী।

লক্ষ্য ভুল করে বেরিয়ে গেল কয়েকটা রকেট, পাক খেয়ে গিয়ে পড়ল ম্যানগ্রোভ বনভূমির ভিতর। তীরের দিকে মুখ করেছে মার্ভেলের বো, তারপরও জাহাজটা টার্গেট হিসাবে যথেষ্ট বড়। কয়েকটা আরপিজি এসে লাগল প্রাউ-এর উপর অংশে, ছিটকে পানিতে পড়ল রেলিং। একটা রকেট ছিঁড়ে ফেলল সামনের নোঙরের চেইন। অন্যগুলো বো'র উপর দিয়ে এল, বিস্ফোরিত হলো ব্রিজের জানালার উপর। কিন্তু পুরু স্টিলের পাত ঠেকিয়ে দিল সবই।

সাধারণ জাহাজ এ হামলায় বিপর্যস্ত হতো। তবে আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল মার্ভেলের আর্মার। ইস্পাতের পাতে তৈরি হলো

নতুন কয়েকটা ট্যাপ। কোনও গর্ত হয়নি, তবে সুপারস্ট্রাকচারের এদিকে ওদিকে পুড়ে গেল রং। মার্ভেলে দুর্বল কিছু জায়গা রয়েছে, ওখানে রকেট গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলে বিপদ হবে। যেমন চিমনি, ওটা আড়াল করেছে সফেসটিকেটেড রেইডার ডিশ, সেটা যে কোনও সময় বিধ্বস্ত হতে পারে।

প্রথম আরপিজি হামলা শুরু হতেই রেডিও ইয়ারবাডে শুনতে পেয়েছে রানা। 'ওগুলো আসছে!'

দেরি করেনি ওরা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই দু'হাতে কান ঢেকেছে। প্রতিটা বিস্ফোরণ ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদেরকে। সামনের কম্পার্টমেণ্টগুলোর ভিতর অনেক বেশি কনকাশন হয়। এক দস্যু দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ওপাশে এসে লাগল রকেট। প্রচণ্ড আওয়াজ ও বিস্ফোরণের ফলে জেলি হয়ে গেল লোকটার দেহ। দুই সোমালিয়ান ধড়াস্ করে পড়ল মেঝের উপর। বাকি জীবন কিচ্ছু শুনতে পাবে না ওরা।

'গগল্, রওনা হয়ে যাও!' সোহেলের কণ্ঠ শুনল রানা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী যেন বলছে স্বর্ণা।

খোরশেদ নবী কলিশন বাটন টিপে দেয়ার পর জিপিএস ডিজএনগেজ করে মেইন স্ক্রিনকে রিকনফিগার করেছে গগল। ওটা এখন দুই দৃশ্য দেখাচ্ছে। জাহাজের ফ্যানটেইল দেখছে একটা ক্যামেরা, অন্যটা দেখিয়ে চলেছে তীর। হাতে সময় বা যথেষ্ট জায়গা নেই যে পাঁচ শ' ষাট ফুটি জাহাজ ঘুরিয়ে নেবে গগল।

থ্রটল দ্বিতীয়বারের মত রিভার্সে নিল সে। বুঝতে পারছে এ চ্যানেল অনেক বেশি সরু। তবে কপাল ভাল, প্রথম একমাইল গেছে সোজা হয়ে। ইঞ্জিনের পাওয়ার আরও বাড়াল গগল, সাবধানে মার্ভেলকে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে। সমস্যা তৈরি করল ঝিরিঝিরি হাওয়া। জাহাজের খোল ও সুপারস্ট্রাকচার যেন পালের কাজ করছে।

ডক থেকে দুটো আরপিজি লঞ্চ করা হলো। এবার তৈরি ছিল নবী, ছয় ব্যারেলের গ্যাটলিং গান থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। বিশ্রী যান্ত্রিক আওয়াজ তুলল ভালক্যান, ওটার ব্যারেলগুলোর ঘুরবার গতি প্রায় এক হাজার আরপিএম।

২০ এমএম রাউণ্ডের তেরছা বৃষ্টির ভিতর ঢুকল রাশান রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড, সঙ্গে সঙ্গে গতি হারিয়ে পানিতে পড়বার সময় বিস্ফোরিত হলো। ওভারশট হওয়ায় বাঁধের মাটি খাবলে তুলল গ্যাটলিঙের বুলেট। নবী লক্ষ করেছে, জলদস্যুরা ট্রলার নিয়ে অনুসরণ করতে চাইছে। মার্ভেল একবার সাগরে বেরুতে পারলে কোনও ভয় নেই, কিন্তু জলাভূমির ভিতর অনেক বেশি সুবিধা পাবে জলদস্যুরা।

প্রথম ট্রলারের খোলের দিকে গ্যাটলিং গান তাক করল নবী, ট্রিগার টিপল এক সেকেণ্ডের জন্য। ট্রলারের পাশের পানি টগবগ করে উঠল, ভিজিয়ে দিল জলদস্যুদের। শেষবারের মত সতর্ক করা হলো তাদেরকে। ট্রলার থেকে লাফিয়ে ডকে নামল তারা, গ্রামের দিকে ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে। নবী আবার চালু করল অটোক্যাননন।

ছিন্নভিন্ন হলো ট্রলার, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা কাঠ, লোহা ও কাঁচ। বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। ওটার শকওয়েভ ডকের উপর শুইয়ে দিল জলদস্যুদের। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তেলতেলে ধোঁয়া।

ডক থেকে রওনা হয়ে গেছে দ্বিতীয় ট্রলার। দু' সেকেণ্ড পর লোকগুলো টের পেল, তাদের দিকে তাক করা হয়েছে গ্যাটলিং গান। দেরি না করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, সাঁতরে দূরে যেতে চাইছে। ক' মুহূর্ত সুযোগ দিল নবী, তারপর শুরু করল গুলি-বর্ষণ। যেন টর্নেডোর তোড়ে উড়ে গেল পাইলট হাউস। টুকরো টুকরো হয়ে গেল বো। তখনও চলছে ইঞ্জিন। হুড়মুড় করে

খোলের ভিতর ঢুকল পানি। দেখতে না দেখতে ডুবে গেল ট্রলার। মনে হলো যেন ডুব দিল সাবমেরিন।

মার্ভেলের সুপারস্ট্রাকচারে আবার শিকার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানা, ফেং ও নিশাত। স্বর্ণার কথা কানে আসছে না। বিস্ফোরণের আওয়াজে ঝনঝন করছে মাথার ভিতর। শিকারী চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। এক এক করে খুঁজে দেখছে কেবিন। বিধ্বস্ত এক কেবিনে ঢুকল ওরা। এখানে আঘাত হেনেছে রকেট। দুই বধির জলদস্যুর কাঁধে ডার্ট গেঁথে দিল রানা ও ফেং। তৃতীয় দস্যু পড়ে আছে ছেঁড়া কাঁথার মত, লাশ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ চলছে, ওরা টের পেল রওনা হয়ে গেছে জাহাজ। ভীত হয়ে উঠছে জলদস্যুরা, আঁধারে পরস্পর আলাপ করছে। সিল করা এক দরজার উপর আছড়ে পড়ল কয়েক দস্যু। দুই হাতে খামচি দিয়ে খুলতে চাইছে ধাতব কবাট। টেরও পেল না একে একে তাদেরকে শিকার করা হচ্ছে।

জাহাজ ডাকাতি না করলে এদের প্রতি সহানুভূতি থাকত রানার। কিন্তু এখন আছে শুধু ঘৃণা। দ্বিধা করল না শেষ ডার্ট খরচ করতে। লোকগুলো চলে গেল ঘুমের রাজ্যে।

'ঠিক আছে, সোহেল, আমাদের কাজ শেষ,' দু সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'সুপারস্ট্রাকচার আন সিল কর্। ক্রুদের আসতে বল। ফারা চিকিৎসা দিক, কিন্তু আধ ঘণ্টার ভিতর এদেরকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে চাই।'

নাইট ভিশন গগলস খুলল ওরা। সমস্ত দরজা-জানালা ও পোর্টের সামনে থেকে উঠে গেল ইস্পাতের প্লেট। জ্বলে উঠল ফ্লুরেসেন্ট বাতি। কিছুক্ষণ পর সুপাস্ট্রাকচারে এসে ঢুকল ক্রুরা, সরিয়ে নিতে লাগল জলদস্যুদের। তাদের সঙ্গে এসেছে সিলভিও, ঠাণ্ডা পানির বোতল এগিয়ে দিল রানার দিকে।

ওটার মুখ খুলে চুমুক দিল রানা।

'দোস্তো, আমার মনে হয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিলে খারাপ হয় না,' বলল সিলভিও।

'তোর সঙ্গে বাড়তি অ্যামনেশিয়া আছে?'

'আরও দু'জনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারব।'

'তা হলে নিতে পারিস।'

অপারেশন্স সেন্টারে এসে ঢুকেছে ওরা। পরিস্থিতি আন্দাজ করতে চাইল রানা। দালমার আলীর আখড়া থেকে সরে এসেছে মার্ভেল। এখন আর আরপিজির হামলা হবে না। কোনও ট্রলার পিছু নেয়নি ওদের। ওগুলো বোধহয় ডুবিয়ে দিয়েছে নবী। মার্ভেলকে পিছিয়ে নিয়েছে গগল, প্রায় পৌঁছে গেছে বাঁকের কাছে।

'কী অবস্থা, গগল?' জানতে চাইল রানা।

'খুব ভাল না। জোয়ার আসছে, এদিকে বাড়ছে হাওয়া। বাঁক নিতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে।'

'রকেট ইনকামিং!' হঠাৎ বলে উঠল নবী।

মার্ভেলের কেউ বুঝতে পারেনি, চ্যানেলের পাশে কাঁচা-মাটির রাস্তা তৈরি করেছে দস্যুরা। ধীরে ধীরে জলা থেকে বেরুনোর চেষ্টা করছে মার্ভেল, কিন্তু দালমারের দলবলও বসে নেই। কয়েকটা ট্রাক নিয়ে পিছু নিয়েছে তারা। চ্যানেলে বাঁক নেয়ার সময় গতি মন্থর হয়ে গেল মার্ভেলের, আর এ সুযোগে রাস্তা থেকে আরপিজি লঞ্চ করা হলো।

গ্যাটলিং গান তৈরি রেখেছে নবী, কিন্তু ব্যারেলগুলো এখন ঘুরছে না। নতুন করে চালু করল সে, বাটন টিপে শুরু করল গুলিবর্ষণ। ততক্ষণে প্রথম দুটো রকেট আঘাত হেনেছে খোলে। পরের দুটো বিধ্বস্ত হলো আকাশে।

বাঁকে পৌঁছে গেছে মার্ভেল, ইঞ্জিনের র‍্যাম্প বাড়িয়ে দিল

গগল, এনগেজ করল বো থ্রাস্টার। খেয়াল রেখেছে মার্ভেল পিছিয়ে চলেছে, উল্টো তীরে আটকে যেতে পারে স্টার্ন।

ভালক্যান থেকে আবারও যান্ত্রিক করাতের আওয়াজ উঠল। বাঁকের পাশে এক টেকনিকালের সামনের অ্যাক্সেল ভেঙে গেল। আকাশে উঠল গাড়িটা, একবার ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়ল, ছাত হয়ে গেল মেঝে। পাথুরে জমিতে ছেঁচড়ে থামল গাড়িটা। অস্ত্র ও ভাঙা কাঁচ নিয়ে ঝরে পড়ল লোকগুলো। পিকআপের পিছনের চাকা দুটো বনবন করে ঘুরছে।

পাশ থেকে গুলির তোড়ে পড়ল আরেকটা পিকআপ। টাংস্টেন বুলেটের প্রচণ্ড শক্তি কাত করে দিল দুই টনি ট্রাককে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। চারদিকে ছিটকে গেল আগুন ও ধোঁয়া। তৃতীয় ট্রাকের দিকে তাক করবার আগেই গাছের জটলার আড়ালে হারিয়ে গেল ওটা। আবারও বেরুবে সেজন্য অপেক্ষা করল নবী, তবে ওটা আর বেরুল না।

জুম ক্যামেরা লেন্সে চোখ রেখেছে নবী। হঠাৎ মনে হলো ওদিকে নড়াচড়া চলছে। তবুও গুলি করল না। গতি তুলতে শুরু করেছে মার্ভেল। বদলে গেছে গুলিবর্ষণের অ্যাংগেল। একটু পর খোলের পাশের ভালক্যান আর কাজে লাগবে না, তখন স্টার্নের অস্ত্রটা তৈরি রাখতে হবে। হাইড্রলিকগুলো অ্যাক্টিভেট করল নবী, খুলে গেল ফ্যানটেইলের দরজা। বেরিয়ে এল বহুনলা অস্ত্র। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত লাগবে ওটার তৈরি হতে, ক্যামেরা দৃশ্য বদলাতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখনই ছিন্নভিন্ন হলো পাশের বনভূমি। একটা ট্রাক থেকে ২০ এমএম অ্যান্টিক্রাফট কামানের গোলা এল একের পর এক। এগুলো আরপিজির মত সাধারণ জিনিস নয়, কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি রাউণ্ড। অনায়াসে স্টিলের আর্মার ভেদ করছে। দুটো গোলা একই জায়গা ভেদ করতেই শুরু হলো জাহাজের ভিতর ভয়ানক তাণ্ডব।

শুধু এটুকু সান্ত্বনা, মার্ভেলের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলো পুরোপুরি ভরা। পানিতে ডেবে রয়েছে জাহাজ, গোপন ডেকগুলোর একটি শুধু পানির উপর। একটা রাউণ্ড লণ্ডভণ্ড করল বোর্ডরুমটা, দুটো চেয়ার ফুটো করে বিঁধল দূরের দেয়ালে। আরেকটা ঢুকল প্যাণ্ট্রিতে, তিন বস্তা ময়দা খুন করে তারপর থামল। ঘরে ভাসতে লাগল পাউডারের মত সাদা গুঁড়ো। তৃতীয় গোলা বিস্ফোরিত হলো একটা কেবিনের ভিতর। এক অফ ডিউটি ইঞ্জিনিয়ার একটুর জন্য বেঁচে গেল। নিজ ডেস্কে বসে ছিল, লড়াই দেখছিল ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনে, তার পায়ের তলা দিয়ে গেল গোলা। পা রক্ষা পেল, কিন্তু গোলা লাগল দেয়ালে। ফলে পিঠ ও কাঁধে বিঁধল অজস্র শ্র্যাপনেল।

এসব হলো এক পলকে। অসহায় হয়ে দেখল নবী। আরও ক' মুহূর্ত পর কমপিউটার জানিয়ে দেবে দ্বিতীয় গ্যাটলিং গান তৈরি।

'নবী, কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

ফ্রেইটার পিছিয়ে নিয়ে চলেছে গগল।

'এক সেকেণ্ড, মাসুদ ভাই...' নবীর বোর্ডে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। দেরি না করে অস্ত্র ব্যবহার করল সে। যে গাছগুলোর আড়ালে টেকনিকাল, সেখানে শুরু হলো প্রচণ্ড তাণ্ডব। এক-দেড় ফুট চওড়া গাছ যেন করাত দিয়ে কেটে ফেলা হলো। গুঁড়ি কাটা পড়ায় প্রকাণ্ড গাছগুলো আছড়ে পড়তে লাগল। চারপাশে উড়ছে কাঠের কুচি। সরাসরি টেকনিকালের বেডের উপর পড়ল একটা বিশাল গাছ। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হলো দুইনলা অ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফট গান। গুলিবর্ষণ থামাল না নবী, কয়েক সেকেণ্ড পর চারপাশে একটা গাছও থাকল না। পড়ে রইল বিধ্বস্ত ট্রাক ও কুচি হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড।

বাঁকের অর্ধেক পেরিয়ে এল মার্ভেল। হিসাবে কোনও ভুল

করেনি গগল। ভাব দেখে মনে হলো ভিড় ভরা পার্কিং লট থেকে বের করে আনছে ট্রাক। স্টার্ন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকল কর্দমাক্ত তীর। কেউ জ্যাক স্টাফের কাছে দাঁড়ালে গাছের পাতা ছিঁড়তে পারবে। তারপর পুরো বাঁক ঘুরে এল মার্ভেল। পুবের দিকে তাক হলো ফ্যানটেইল, ওদিকে রয়েছে খোলা সাগর।

নবী শ্রদ্ধা নিয়ে চেয়ে রইল গগলের দিকে। ভাল করেই জানে, ওদের সাধ্য নেই এত সরু চ্যানেল দিয়ে এভাবে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। অথচ ওদের যথেষ্ট ট্রেইনিং রয়েছে।

'দারুণ দেখালেন, মিস্টার গগল!' মুগ্ধ হয়ে বলল নবী। 'এমনটা আর দেখিনি! দুনিয়ার সেরা ক্যাপ্টেন আপনি!'

'আগেও দেখেছ বাপু, চিনতে পারোনি,' বলল কট্টর গগল। 'রানা আমার চেয়ে ঢের ভাল চালায় যে কোনও জাহাজ।'

'তোমার মত অত বেশি চালাইনি আমি মার্ভেল,' আপত্তি তুলল রানা। 'তীরে ঠিক গুঁতো লাগিয়ে দিতাম। তারপর তোমার বকা শুনতাম।'

রানার দিকে চেয়ে রইল স্বর্ণা, রায়হান ও নবী। ভাবছে, সত্যিকারের নেতা পেয়েছে ওরা। গুণের কদর দিতে মুহূর্ত মাত্র দেরি নেই।

মার্ভেল স্বয়ংক্রিয় ভাবে জিপিএস স্যাটালাইট থেকে তথ্য পাচ্ছে। রেকর্ড করে রাখা হয়েছে সবই। এবার কি-বোর্ড টিপে দিতেই নাভা-কমপিউটার রিভার্স কোর্স ধরল। বিপজ্জনক জলাভূমির ভিতর দিয়ে পিছিয়ে চলেছে জাহাজ। এরইমধ্যে জানা গেল বেনেডিক্টোর ইয়ট কোথায় অপেক্ষা করছে। এর পরের কাজ দালমার আলীকে ইয়টে তুলে দেয়া।

সিলভিও বেনেডিক্টোর দিকে চাইল রানা। 'ঠিক করে ফ্যাল কাদের সঙ্গে নিবি। অন্যদের ফেলে যাব এখানে।'

বন্ধুকে নিয়ে অপারেশন্স সেন্টারের পিছন দরজায় চলে গেল

রানা, কয়েক ডেক পেরিয়ে চলে এল বোট গ্যারাজে। সাগরের দিকের প্রকাণ্ড দরজা এখন বন্ধ। ভিতরের অংশে ট্যাফলন দিয়ে মোড়ানো র‍্যাম্প, ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়া হয় বোট। নামানো যায় যোডিয়াক, জেট স্কি ও রিজিড হাল্ড্ ইনফ্লেটেবল বোট। শেষেরটা তৈরি করা হয়েছে নেভি সিলদের জন্য। হালের ভিতর রয়েছে বাতাসের ব্লাডার, ফলে যে-কোনও পরিস্থিতিতে ভাসতে পারে। সঙ্গে থাকে দুটো শক্তিশালী আউটবোর্ড ইঞ্জিন। প্রয়োজনে গতি তুলতে পারে পঞ্চাশ নট। আপাতত গ্যারাজের ভিতর ফ্লুরেসেন্ট বাতি জ্বলছে। তবে রাতের অপারেশনে গেলে জ্বেলে নেয়া হয় লাল ব্যাটল ল্যাম্প।

ক্রুরা বড়সড় এক কালো বোট তৈরি রেখেছে। ওটার উপর বেঁধে রাখা হয়েছে অচেতন জলদস্যুদের। জ্ঞান ফিরলে একে অপরের বাঁধন খুলবে, বৈঠা মেরে পৌঁছে যাবে তীরে। মেডিকেলে ফারার দায়িত্বে এখনও রয়ে গেছে আহত কয়েকজন। মৃতদের ফেলে দেয়া হবে সাগরে।

'এটা,' আঙুল দিয়ে দেখাল সিলভিও। 'আর ওদিকের লোকটাও।' হাকিম ও শাহিন। 'এরা যখন জাহাজে উঠল, মনে হলো নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এদের সঙ্গে নেব, হয়তো দেখা যাবে পেট থেকে প্রচুর তথ্য বেরুচ্ছে।'

'কমবয়সী লোকটা কাজে আসবে না। গাঁজা টেনে ভোম হয়ে থাকে।'

'তাও থাক্, ডিটক্সিফিকেশন করলে উপকার হবে ওর।'

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর বোট গ্যারাজে এল ফারা। তার সঙ্গে আর্দালি হিসাবে কয়েকজন ক্রু, সঙ্গে এনেছে কয়েকটা স্ট্রেচার। শুইয়ে রাখা হয়েছে আহত জলদস্যুদের।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'ভালই। তবে আমাদের একজন আহত,' বলল ফারা।

'আগে তো বলোনি! কে?'

'স্টেবল হওয়ার আগে বলতে চাইনি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, রাশেদ।'

'কী ভাবে আহত হলো?'

'একটা ট্রিপল-এ রাউণ্ড ঢোকে কেবিনে। পিঠে শ্র্যাপনেল বিঁধেছে। অনেক রক্ত হারিয়েছে। দুটো পেশির ক্ষতি হয়েছে। তবে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'আর এদের কী হাল?'

'দু'জন কালা হয়ে গেছে,' বলল ফারা। 'চিরজীবনের জন্য কি না, জানি না। আরও কয়েকজন সামান্য আহত। শ্র্যাপনেল বের করে ড্রেসিং করেছি। কিছু অ্যান্টিবায়োটিকও দিয়ে দিয়েছি। ইনফেক্টেড হলে ভুগবে। বিশ্রী পরিবেশে থাকে এরা।'

গুলি খেয়েছে দুই সোমালিয়ান, তাদের দেয়া হয়েছে একটা করে নাইলন স্ন্যাচেল। ভিতরে মেডিকেশন ও কীভাবে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার পরামর্শ। লোকগুলো ওষুধ খাবে না, আন্দাজ করল রানা, বিক্রি করে দেবে কালো বাজারে।

বোটে তুলে দেয়া হলো লোকগুলোকে। খটাং আওয়াজে খুলে গেল বোট গ্যারাজের কপাট। অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল রানা। দেখতে না দেখতে কমে এল গতি। র‍্যাম্পের নীচের দিকে ছল-ছলাৎ করে লাগছে সাগরের ঢেউ। দরজার পাশ থেকে সাগর দেখল রানা। জলাভূমি শেষ হয়ে এল। জোয়ার আসছে, পশ্চিমে ভেসে যাবে কালো বোট, ঢুকে পড়বে ম্যানগ্রোভ জলার ভিতর। আর এক ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙবে লোকগুলোর, সামান্য ডিহাইড্রেশন ছাড়া কোনও ক্ষতি হবে না।

ক্রুদের সঙ্গে হাত লাগাল রানা, র‍্যাম্প বেয়ে নেমে গেল কালো বোট। কোনও আওয়াজ ছাড়াই পানিতে নেমেছে। জাহাজ থেকে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে ভাসছে। ইন্টারকম বাটন টিপল

রানা। 'ঠিক আছে, গগল, চলো এবার। সিকি মাইল যাওয়ার পর গতি তুলবে। দ্রুত সিলভিওর ইয়টে পৌঁছতে চাই।'

'ঠিক আছে।'

আধঘণ্টা পর উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে রানা ও সিলভিও। আরপিজির তৈরি ক্ষতগুলো মেরামত করছে ক্রুরা। আবারও বসিয়ে নেয়া হয়েছে রেলিং। পোড়া দাগগুলো হারিয়ে গেছে মেরিন রঙের নীচে। কয়েকজন বোসান চেয়ারে বসে খোল মেরামত করছে। ওয়েল্ডিং করে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গোলার ক্ষত বুজিয়ে দেয়া হচ্ছে। আরও ক'জন ক্রু কেবিন গোছাতে ব্যস্ত। মার্ভেলের স্টোর-রুম থেকে নেয়া হয়েছে ম্যাট্রেস ও আসবাবপত্র। লিস্টি করছে সোহেল, লিখে রাখছে মার্ভেলকে আগের মত *অপরূপা* করবার জন্য কী কী কিনতে হবে।

শান্ত সাগরে ত্রিশ নট গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। নীলাকাশ ঝিকমিক করছে, বইছে মাঝারি হাওয়া। হঠাৎ ছোট্ট স্পিকারে স্বর্ণার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

'সামনে চার মাইল দূরে রেইডার কণ্ট্যাক্ট, মাসুদ ভাই।'

সাগরের দিকে বিনকিউলার তুলল রানা। খাঁ-খাঁ করছে সাগর, আশপাশে কোথাও কেউ নেই। কিন্তু বহু দূরে বিন্দুর মত কী যেন। আরও কিছুক্ষণ পর চেনা গেল সিলভিওর ইয়ট, সাদা ও নীল রঙা, যেন ময়ূরপঙ্খী।

'আমেরিকান ডেস্ট্রয়ার কখন আসছে?' বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'আগামীকাল ভোরে। ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে। এর আগে ঘুম ভাঙবে না দালমার আলীর। তা ছাড়া, সবার নেশা ছুটতে আরও কয়েক ঘণ্টা। আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোর। ধীরে সুস্থে যাব সুয়েজ ক্যানেলের দিকে।'

আরও কিছুক্ষণ পর ইয়টের পাশে ভিড়ল মার্ভেল। বোট

গ্যারাজের দরজা দিয়ে যে কেউ নামতে পারবে ইয়টে। দু'জন নেমে গিয়ে দড়ি বাঁধল। দালমার আলীকে পাইলট হাউসের নীচের এক কেবিনে নিয়ে গেল রানা ও সিলভিও। লোকটার হাত-পা বাঁধা। শুইয়ে দেয়ার সময় বাঙ্কের সঙ্গে খটাং করে লাগল মাথা। তাকে এক পলক দেখল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'জগতে এমন জেল নেই যেখানে যথেষ্ট শাস্তি হবে তোমার।'

ডেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, নবী আর রায়হান মিলে হাকিম ও শাহিনকে বসিয়ে দিয়েছে দুটো ফিশিং চেয়ারে। ডানহাতে ছিপ, বাঁ হাতে খালি বিয়ারের বোতল। ঘুমে বিভোর।

সিলভিওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোট গ্যারাজে উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, টেনে ধরল সে হাতটা।

'দোস্ত, তোর সাহায্য না পেলে...'

'রাখ্ তো ওসব!' ধমক দিল রানা। 'তা হলে কিন্তু আর কোনদিন কোনও সাহায্য নেব না তোর।'

হাসল সিলভিও, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, তারপর ছেড়ে দিল।

ক্রুরা পিছু নিল রানার। দড়িগুলো খুলে নেয়া হলো।

মিশরের দিকে রওনা হয়ে গেল সিলভিওর ইয়ট।

ইণ্টারকমে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনল রানা: 'মাসুদ ভাই, বিসিআই থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান।'

'লাইন দাও,' নিচু স্বরে বলল রানা। একটু চমকে গেছে। বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠছে উষ্ণ রক্ত।

'রানা,' ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠ। 'কাজ শেষ?'

'জী, স্যর। এইমাত্র শেষ হলো।'

'বেশ। রিপোর্ট পাঠাও।' সামান্য বিরতি। 'এবার কত দ্রুত ত্রিপোলিতে পৌঁছতে পারবে?'

'সুয়েজ খাল হয়ে ত্রিপোলিতে, স্যর? ট্রাফিক কম থাকলে চার

দিন।'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য প্রাথমিক আলাপ সারতে রওনা হন, কিন্তু তাঁর বিমানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ। ধারণা করছি, ভূ-পাতিত হয়েছে বিমানটা।'

'স্যাবোটাজ?'

'দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'তিন দিনের ভিতর পৌঁছতে পারব, স্যর।'

'ঠিক আছে। পরবর্তী নির্দেশ সময় হলেই পাবে। রওনা হয়ে যাও।' খুট্ করে কেটে গেল লাইন।

আট

অনেক নীচে তপ্ত সাহারা।

দশ হাজার ফুট উপরে গোঁ-গোঁ আওয়াজে ছুটছে বাংলাদেশ বিমানের এয়ারবাস। কয়েক ঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে। এখন চলেছে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে। পৌঁছুতে বড়জোর আর এক ঘণ্টা।

এইডরা ফিসফিস করে আলাপ করছেন।

সামনে, বাঁ পাশের সিটে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুক্ষণ আগে পড়ে শেষ করেছেন মহাসম্মেলনের জন্য তৈরি কাগজপত্র। তারপর চোখ বুজে মনে মনে সুরা ইউনুস পাঠ করলেন পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল কামনা করে। মনে পড়ছে তাঁর, সেই ছোট বেলায় বাবা বলতেন, 'আম্মু, আল্লাহ্ ও রাসুলের উপর বিশ্বাস

রাখবি। সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবি, ইনশাল্লাহ্।'

বাবার সেই কণ্ঠ এখনও মনে পড়ে তাঁর। সত্যি, এই জীবনে মস্ত সব বিপদে পড়েছেন। কখনও হাল ছেড়ে দেননি। ভরসা রেখেছেন আল্লাহর উপর। তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে অনেকে। বারবার নিজ বাড়িতে গৃহ-বন্দি হয়েছেন। গুলি করা হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য করে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সন্ত্রাসীরা। মনে মনে বারবার বলেছেন, 'রাব্বুল আলামিন যা চান তা-ই ভাল। আমি শুধু তাঁর উপর ভরসা রাখলাম।'

এখনও স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলেন, ওই মহাসম্মেলন যেন সফল হয়। বহুকিছু রয়েছে দেয়ার, বহুকিছু রয়েছে পাওয়ারও।

বাস্তবে ফিরলেন তিনি, গ্রীবা ডানদিকে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন, 'আশরাফ ভাই, কতক্ষণ লাগবে ত্রিপোলিতে পৌঁছতে?'

'পাইলট বলেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নামছি। ওয়েট্রেস আপনাকে কিছু এনে দেবে?'

'এক গ্লাস পানি।'

চেয়ারের বাটন টিপে দিলেন সালাম বিন আশরাফ, আসতে বলছেন এয়ার ওয়েট্রেসকে।

এক তোড়া কাগজ তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলো বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ডোশিয়ে। সঙ্গে বায়োগ্রাফি ও ফটোগ্রাফ। এঁরা আসছেন মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। বহুবার এসব কাগজ পড়েছেন তিনি। তবুও নিশ্চিত হতে চাইছেন কিছু যেন বাদ না পড়ে। কার কী অভ্যাস, কারা মন্ত্রী, ক'টা স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কিছুই বাদ পড়েনি।

এখন কেউ জানতে চাইলে গড়গড় করে বলে দিতে পারবেন তিনি।

সুন্দরী ওয়েট্রেস এসে ট্রেসহ পানির গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

'ধন্যবাদ।' ওটা নিলেন প্রধানমন্ত্রী, এক চুমুক পানি খেয়ে

পাশে রেখে দিলেন গ্লাস। প্রথম কাগজটা পড়ছেন। লিবিয়ার নতুন ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী যে কারও মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ছোটখাটো ডোশিয়ে। লেখা হয়েছে মোহাম্মদ ফতে আলী নিচু পর্যায়ের সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন। তারপর মনোযোগ কাড়েন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির। মাত্র একটিবার মিটিং শেষে গাদ্দাফি তাঁকে ফরেন মিনিস্টার করেন। এবং এরপর গোটা বিশ্বে চরকির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন ভদ্রলোক। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শীতল ব্যবহার পান। পরে দেখা গেল তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্ব সবাইকে আকর্ষণ করছে। মধ্য-প্রাচ্য জয় করে এশিয়ার অন্য দেশগুলো, ইউরোপ, আমেরিকা— সবখানে গেছেন। শুরু থেকেই শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য তাঁর চেষ্টায় আন্তরিকতার কোনও অভাব দেখা যায়নি।

পাশের সারির সিটে বসেছেন সালাম বিন আশরাফ।

মোহাম্মদ ফতে আলীর ছবি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ফরেন মিনিস্টার রয়ে গেছেন নিউ ইয়র্কে, নইলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। 'ছবি দেখে কী মনে হয়, আশরাফ ভাই?'

ছবিটা নিয়ে জানালার পাশে চলে গেলেন ভদ্রলোক, মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। অফিশিয়াল ফটোগ্রাফ, মোহাম্মদ ফতে আলীর পরনে পশ্চিমা সুট। চমৎকার মানিয়েছে। ফুটে বেরিয়ে আসছে সুস্বাস্থ্য। চুলগুলো কাঁচা-পাকা। গোঁফে পাক ধরেছে। মানানসই ঠোঁটে মৃদু হাসি।

ছবিটা ফিরিয়ে দিলেন আশরাফ। 'ভুল লোকের কাছে জানতে চাইছেন, আপা। তবে অভিনেতা ওমর শরিফের সঙ্গে মিল আছে চেহারার। মনে হয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক। দেখতে রীতিমত ভাল।'

'কিন্তু চোখ দুটো?'

'চোখ?' দ্বিধার মধ্যে পড়লেন আশরাফ। 'খেয়াল করিনি।

চোখে কী, আপা?'

'ঠিক জানি না। কী যেন আছে। বা থাকা উচিত, কিন্তু নেই।'

'ছবিটা হয়তো ভাল তুলতে পারেনি ফটোগ্রাফার।'

'হতে পারে।'

'আপা...' কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেলেন আশরাফ, চারপাশে জোরালো আওয়াজ শুরু হয়েছে। মনে হলো ধাতব কী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। পরস্পরের দিকে চাইলেন তাঁরা। শত ঘণ্টার বেশি থেকেছেন বিমানে, দু'জনই বুঝলেন বড় কোনও সমস্যা হয়েছে। অজান্তে আটকে ফেলেছেন শ্বাস।

তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া বাড়তি কোনও শব্দ থাকল না।

ক' মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, পাইলটের কাছে গিয়ে জানতে চাইবেন কী ঘটেছে। পাঁচ পা যেতে না যেতেই হঠাৎ ভীষণ দুলে উঠল বিমান, আকাশ থেকে খসে পড়তে লাগল। সিলিঙের দিকে উঠে গেলেন সালাম বিন আশরাফ, তারপর ধপ করে পড়লেন সিটে। দু'হাতে মোল্ডেড প্লাস্টিক ওভারহেড ধরে সামলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। পিছন থেকে চিৎকার শুনতে পেলেন। সবাই ওজন-শূন্য হয়ে যাওয়ায় চমকে গেছেন। কেউ কেউ পড়ছেন কলেমা।

'জানি না কী ঘটল,' ইণ্টারকমে বলে উঠলেন এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন, 'তবে দেরি না করে সবাই সিট বেল্ট বেঁধে নিন।' ইণ্টারকম খোলা রইল, আর এর ফলে শোনা গেল কো-পাইলট ও পাইলটের আলাপ। ঝরা পাতার মত খসে পড়ছে বিমান, নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন তাঁরা। 'কী বলছ! রেডিও নষ্ট? এই তো দু'মিনিট আগে ত্রিপোলির সঙ্গে কথা বললাম!'

'এর কোনও ব্যাখ্যা নেই,' বললেন কো-পাইলট। 'তবে রেডিও কাজ করছে না।'

'এখন এ নিয়ে ভাবলে চলবে না, আমাকে সাহায্য করো... ধুশ্‌শালা! পোর্ট ইঞ্জিন থেমে গেছে! আবার চালু করার চেষ্টা করো।' এরপর বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকম।

'আমরা ক্র্যাশ করছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আশরাফ। সিট ধরে ধরে চলে এলেন প্রধানমন্ত্রীর পাশে, চোখে ভীষণ দুশ্চিন্তা।

'আমরা পড়ে যাচ্ছি কি না জানি না,' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। টের পেলেন ঘামতে শুরু করেছে দু'হাতের তালু। 'তবে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।'

'কিন্তু হলোটা কী?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইলেন এক এইড।

'জানি না। মনে হয় মেকানিকাল কিছু নষ্ট হয়েছে।' অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। নীচের দিকে ধেয়ে চলেছে বিমান, অথচ এমন যাওয়ার কথা নয়। ঠিক ভাবে চলছে দুটো ইঞ্জিন। মাত্র একটি ইঞ্জিনই ওড়াতে পারে এসব বিমানকে। গোলমাল হয়েছে অন্য কোথাও, নইলে এভাবে নামত না বিমান। ধাতব আওয়াজটা কীসের ছিল? প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, আঘাত হেনেছে কোনও মিসাইল, নষ্ট করে দিয়েছে কলকজা? এখনও তো চলছে বিমান।

এয়ারবাসের নেমে যাওয়ার গতি খানিক কমল, সোজা হলো মেঝে। বোধহয় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছেন ক্যাপ্টেন। তবে এখনও নেমে চলেছে প্লেন। এভাবে নীচে পড়লে কেউ বাঁচবে না।

সাবধানে যে যার সিটে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী ও এইড, বেঁধে নিলেন সিট বেল্ট। প্রধানমন্ত্রী নিচু কণ্ঠে সাহস দিলেন সবাইকে। একটু কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ।

নীরবে কাঁদতে শুরু করেছেন দুই মহিলা এইড।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহাদয়,' শোনা গেল কো-পাইলটের কণ্ঠ: 'আমরা জানি না কী ঘটেছে। এইমাত্র থেমে গেছে একটা ইঞ্জিন। অন্যটাও যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে না। মরুভূমিতে নামতে হবে

আমাদের। তবে কেউ দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের ক্যাপ্টেন আগেও ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং করেছেন, কোনও ভয় নেই। আমি বললেই ক্র্যাশ পজিশনে বসে পড়বেন। দুই হাঁটুর মাঝে রাখবেন মাথা। দুই হাত দিয়ে বেঁধে রাখবেন দুই হাঁটুকে। বিমান থেমে যাওয়ার পর স্টুয়ার্ডেস কেবিনের দরজা খুলে দেবে। সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল প্রথমে বিমান থেকে নামিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রীকে।'

বিমানে বিসিআইয়ের মাত্র একজন এজেন্ট। অন্যরা প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ ও এইড়। এজেন্টের নাম সাদাত হোসেন, নিজ সিট বেল্ট খুলে ফেলল যুবক। বিমানের ঝাঁকি কমে আসতেই চলে এল প্রধানমন্ত্রীর কাছে, পাশের সিটে বসে বেল্ট বেঁধে নিল। ঠিক তখনই আবার প্রবল ঝাঁকি খেল বিমান। পাথরের মত নীচে পড়ছে। একবার বালিতে নামলে প্রধানমন্ত্রীকে সিট থেকে তুলবে সাদাত হোসেন, নিয়ে যাবে দরজার কাছে। নামিয়ে দেবে বিমান থেকে। তাতে সময় লাগবে বড়জোর দশ সেকেণ্ড।

চুপচাপ বসে রইলেন প্রধানমন্ত্রী, নীরবে প্রার্থনা করছেন। নিজের বা কোনও নির্দিষ্ট মানুষের জন্য নয়। ভাবছেন সামনের কনফারেন্স যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তা যেন গ্রহণ করে মানব-সভ্যতা। বোধহয় আর কখনও বিশ্বশান্তির জন্য এতবড় সুযোগ মিলবে না।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন তিনি। নীচে রুক্ষ মরুভূমি। এখানে ওখানে ছোরার মত টিলা-টক্করের চূড়া। তিনি পাইলট নন, তবে পরিষ্কার বুঝলেন কো-পাইলট যাই বলুক কোনও আশা নেই। আসল কথা: তাঁদের বাঁচবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।

'ঠিক আছে, আপনারা তৈরি হোন,' ঘোষণা দিল কো-পাইলট। 'আমরা নামতে শুরু করেছি। সবাই চলে যান ক্র্যাশ পজিশনে।'

যাত্রীরা শুনলেন পাইলট বলছেন: 'তুমি কি ওটা দেখেছ...'

তারপর বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকমের স্পিকার। কেবিনে নেমে এসেছে নিচ্ছিদ্র নীরবতা। কেউ জানেন না কী দেখেছেন পাইলট। আর তা না জানাই বোধহয় সবার জন্য ভাল।

নয়

ড্রিল ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছে স্মৃতি, পাশে আসাদ চৌধুরি, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। পুরনো নদী-খাতের মেঝে গোলাকৃতি পাথরে ভরা। কিছু সহজে নাড়ানো যায়, অন্যগুলো সরাতে চাইলে গায়ের জোর লাগে। এই এবড়োখেবড়ো পথে আসা-যাওয়া করতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে পিঠের ত্বক ছিলে গেছে স্মৃতির।

গতরাতে ক্যাম্পে ফিরে তিউনিশিয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে আলাপ করেছে। লোকটার ধারণা, ওরা রোমান মিল ও ওয়াটার হুইল খুঁজছে। স্মৃতি জানিয়েছে, প্রতিরাতে ক্যাম্পে ফিরতে না হলে ভাল হয়। কয়েক দিনের জন্য মরুভূমিতে ক্যাম্প করতে চায়। সবুর রহমানের স্যাটালাইট ফোন দেখিয়ে বলেছে, দরকার পড়লে যে-কোনও সময়ে সে আর্কিওলজিকাল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

স্মৃতি ভাবছে, মূল আর্কিওলজিকাল টিম রোমান সাইটে ভাল কাজ দেখিয়েছে, কিন্তু ওরা নিজেরা কিছুই পায়নি। হয়তো কিছু পাবে, যদি ক' দিনের জন্য মরুভূমিতে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বড় এলাকা নিয়ে খুঁজতে পারবে। বলা যায় না, হয়তো খুঁজে

পাবে পুরনো বারবারি দস্যু ইউনুস আল-কবিরের আখড়া।

বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেণ্টেটিভ মানা করে দিচ্ছে দেখে লোকটাকে একটু দূরে নিয়ে গেছে সবুর রহমান, দু'মিনিট কী যেন বলেছে। এরপর যখন ডাইনিং টেণ্টে ফিরল দু'জন, তখন লোকটার চোখদুটো চকচক করছিল। খুশি মনে বলল, স্মৃতি চাইলে মরুভূমিতে এক বছর থাকতে পারে। শর্ত মাত্র একটা, প্রতি তিনদিন পর একবার করে ক্যাম্পে ফিরতে হবে।

লোকটা বিদায় নেয়ার পর সবুরকে ধরল স্মৃতি।

সে নির্বিকার মুখে বলল, 'সব কিছু নির্ভর করে বকশিসের উপর।'

'কিন্তু লোকটা যদি ঘুষ না নিতে চাইত?' জানতে চেয়েছে স্মৃতি। 'যদি কর্তৃপক্ষকে জানাত?'

'কী যে বলেন, এটা মধ্যপ্রাচ্য। এখানে টাকার ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। ঘুষ এখানে জায়েজ।'

'কিন্তু...' আর কিছু বলতে পারেনি স্মৃতি। নিজে কখনও ঘুষ দেয়নি। জীবন কেটেছে নিয়ম মেনে। কখনও কোনও পরীক্ষায় নকল করেনি। নিয়মিত আয়কর দিয়েছে। গাড়ির স্পিড মিটার মেনে চলেছে। কখনও আইনের বাইরে যায়নি। ফলে পরিষ্কার থেকেছে মন। কখনও মেনে নেবে না দুনিয়া জুড়ে চলছে ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতি। কিন্তু গত রাতে নিজের কাছে হেরে গেছে। একটা বাড়তি সুযোগ পেয়ে তা হারাতে চায়নি।

আজও রওনা হয়েছে নদী-খাতের দিকে। আগামী তিন দিন পর ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। ঠিক হয়েছে, জলপ্রপাতের ওপাশে কী আছে তা জানতে হবে। হয়তো ওদিকেই ছিল ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা, ঢেউ খেলানো টিলা ও বালির ঢিবির ভিতর।

ট্রাকে পর্যাপ্ত পানি ও খাবার নিয়েছে ওরা। তাতে চলবে চার

দিন। সঙ্গে এনেছে মাত্র একটা তাঁবু। ঠিক হয়েছে পুরুষ সঙ্গীরা ট্রাকে ঘুমাবে, আর তাঁবু থাকবে স্মৃতির জন্য। ট্রাকে তোলা হয়েছে পঞ্চাশ গ্যালনের ডিজেল ড্রাম। ওটার কারণে তিন শ' মাইল চলবে ট্রাক। অবশ্য ড্রিল বেশি ব্যবহার না করলে, তবেই।

এই ছোট্ট দলের কেউ আশাবাদী নয়। ওই জলপ্রপাত বেশ উঁচু, টপকে যেতে পারবে না কোনও জাহাজ। তবু একবার অন্তত ওদিকটা ভাল করে দেখতে হবে। আর করবেই বা কী? ঘনিয়ে এসেছে শান্তি মহাসম্মেলন। সবুর ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল, তখন স্মৃতি জেনেছে, আজই নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সবার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে নেবেন তিনি। কোণঠাসা বোধ করছে স্মৃতি। বারবার মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

'আরে ভাই, বারবার গর্তে ফেলতে হবে চাকা?' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল সবুর। পিছনের বেঞ্চ সিটে বসেছে সে।

'আপনি চালালেও এ-ই হয়,' বলল গম্ভীর আসাদ।

আজ ঝকমকে একটা দিন। দুপুরের দিকে তাপমাত্রা হলো এক শ' আশি ডিগ্রি। কুলার থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করল স্মৃতি, দুই সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিল। এবার দিল ক্যাম্প থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ। ওডোমিটার বলছে সত্তর মাইল পেরিয়েছে। তার মানে আর ত্রিশ মাইল গেলে জলপ্রপাত।

'ওদিকটা দেখে কী মনে হয়?' জানতে চাইল আসাদ চৌধুরি। চিবিয়ে চলেছে স্যাণ্ডউইচ। বাকি অংশ তাক করল একদিকে। বেশির ভাগ সময় নদী চলেছে খাড়া টিলার মাঝ দিয়ে। কিন্তু সামনে বাঁক নিয়েছে। একদিকে ঢালু পাড় গিয়ে উঠেছে মরুভূমির মেঝেতে।

'ষাট পার্সেন্ট ঢাল, বা আরও খাড়া,' বলল সবুর।

'যদি উপরে বড় পাথর পাই, তার সঙ্গে ট্রাক বেঁধে মরুভূমিতে

উঠতে পারব।'

'ভাবতে ভালই তো লাগছে,' বলল স্মৃতি।

খাবার শেষে ঝিমানি ধরল তিনজনের দলটিকে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। ট্রাক নিয়ে নদীর এক ধারে থামল আসাদ। সাবধানে দেখল সামনের পাড়। দূর থেকে অনেক কম ঢালু মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রীতিমত পাহাড়। বেয়ে উঠতে হলে কমপক্ষে ত্রিশ ফুট পেরুতে হবে। ট্রাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল আসাদ, খানিক উঠবার পর পিছলাতে লাগল পিছনের চাকা। ছিটকে পিছনে পড়ছে পাথর ও বালি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল স্মৃতি ও সবুর। ট্রাকের বাম্পারের সঙ্গে লাগানো উইঞ্চের সামনে থামল ওরা। উইঞ্চ থেকে স্টিলের কেবল নিল স্মৃতি। দলের ভিতর সবচেয়ে শক্তপোক্ত সবুর, সে কেব্‌ল্‌ নিয়ে উঠতে লাগল। বুট জুতোর পিছন থেকে শুরু হলো ছোটখাটো অ্যাভালাঞ্চ। প্রতি পদক্ষেপে ঝুরঝুর করে পড়ছে নুড়ি পাথর ও বালি। দশ ফুট উঠতে না উঠতেই চার হাত-পা ব্যবহার করতে হলো। দমকা বাতাসে মাথা থেকে উড়িয়ে নিল শনের হ্যাট, নীচে গিয়ে পড়ল ওটা। বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল সবুর। বেল্টের পিছন অংশে আটকে নিল কেবলের হুক। পাথর খামচে ধরে উঠতে হচ্ছে। দুই হাতের নখ জ্বলছে।

দশ মিনিট লাগল সবুরের মরুভূমির প্রান্তে উঠতে। ততক্ষণে দরদর করে ঘামছে। ভিজে গেছে শার্টের পিঠ। পাড় থেকে সরে গেল সে, আর দেখা যাচ্ছে না। পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে কেবল।

তিন মিনিট পর আবারও দেখা দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'বড় একটা পাথরের সঙ্গে আটকে দিয়েছি কেবল। আসাদ, চেষ্টা করে দেখুন। এবার বোধহয় উঠে আসবে ট্রাক।'

ক্যাবের ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় উইঞ্চ। সবুরের হ্যাট

কুড়িয়ে নিল স্মৃতি, উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। গিয়ার ফেলল আসাদ, চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটারে। সেইসঙ্গে চালু করল উইঞ্চের টগল। খুব শক্তিশালী নয় উইঞ্চের মোটর, তবে তিনটি গিয়ার দেয়ার পর উঠতে লাগল। রাজকীয় ভঙ্গি নিয়ে ধীরে উঠছে ট্রাক। পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল আসাদ ও স্মৃতি। উপর থেকে বিজয়ের চিৎকার দিল সবুর। ওরা জিতছে।

মুখের উপর কীসের ছায়া পড়তে উপরের দিকে চাইল স্মৃতি। ধারণা করেছে, ওটা শকুন বা বাজপাখি।

কিন্তু বিদঘুটে শোঁ-শোঁ আওয়াজ কীসের?

চমকে গেল স্মৃতি। মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে পেরুল প্রকাণ্ড বিমান। আওয়াজ নেই, ইঞ্জিনগুলোকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। চিলের মত গ্লাইড করছে।

কিন্তু বিমান এখানে কেন?

স্মৃতি জানে, আশপাশে তিউনিশিয়ার কোনও এয়ারপোর্ট বা রানওয়ে নেই। থাকলে থাকতে পারে লিবিয়া সীমান্তের ওদিকে।

ওর মন বলে দিল, মস্ত বিপদে পড়েছে ওই বিমান।

নিঃশব্দে ভেসে চলেছে বিমান। দুটো বিষয় লক্ষ্য করল স্মৃতি। বিমানের লেজে গোল একটা গর্ত। ওখান থেকে ঝরে পড়ছে হাইড্রলিক ফ্লুইড। তার চেয়ে বড় কথা, বিমানের ফিউজেলাজে বড় করে লেখা: *বাংলাদেশ বিমান*।

হৈ-চৈ থামিয়ে দিয়েছে সবুর রহমান। কপালের উপর হাত রেখে দেখছে আকাশ। দূর থেকে দূরে সরছে বিমান। দ্রুত নেমে আসছে মরুভূমি ও টিলার দিকে!

হাঁ হয়ে গেল স্মৃতি। টের পেয়েছে ওই বিমানে কে থাকতে পারেন!

পাথুরে মরুভূমিতে উঠবার জন্য পুরো মনোযোগ দিয়েছে আসাদ চৌধুরি। কিছুই দেখতে পায়নি। স্মৃতি কাতরে ওঠায়

ভাবল টো কেবলে সমস্যা। 'কী হয়েছে বলুন তো?'

'যত দ্রুত সম্ভব উঠুন।'

'সে চেষ্টাই তো করছি। কিন্তু অত তাড়াহুড়ো কীসের?'

'এইমাত্র যে বিমান পেরিয়ে গেল, ওটা বাংলাদেশ বিমানের। ওটার ভিতর রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী!'

কিন্তু কিছুই করবার নেই আসাদের। উইঞ্চটা খুব ধীরে কেবল টেনে উপরে তুলছে ট্রাককে।

সবুরের দিকে চেয়ে জানতে চাইল স্মৃতি, 'কিছু দেখছেন?'

'না,' রিগের মোটরের উপর দিয়ে বলল সবুর। 'কয়েকটা টিলার ওপাশে চলে গেছে। জায়গাটা এখান থেকে কয়েক মাইল হবে। কোনও ধোঁয়া দেখছি না। বোধহয় নিরাপদে নামতে পেরেছে।'

পরের এগারো মিনিট বড় ধীরে কাটল, মরুভূমির দিকে উঠে এল ট্রাক। বার কয়েক তথ্য দিল সবুর, চারপাশে কোনও ধোঁয়া নেই।

এটা একটা বড় সান্ত্বনা।

শুকনো নদী থেকে মরুভূমির মেঝেতে উঠে এল ট্রাক। টো হুক খুলে নিল সবুর। গুটিয়ে নিতে চাইল কেবল। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত প্রকাণ্ড এক পাথরে বেঁধেছে কেবল। নরম পাথরে গেঁথে গেছে ওটা। পাথরে পা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে কেবল বের করে নিতে হলো।

'বিমানটা বোধহয় লিবিয়ায় নেমেছে,' বিড়বিড় করে বলল আসাদ।

'কী বললেন?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'বলছি বিমান নেমেছে লিবিয়ার জমিতে,' এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল সে।

স্মৃতি দলের নেত্রী, কিন্তু চাইল সবুরের দিকে। ওর ধারণা

হয়েছে সবুর রহমান এনএসআই বা এ ধরনের কোনও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সে হয়তো বলবে এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

'এমন হতে পারে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর আমরা একমাত্র মানুষ,' বলল সবুর। 'বিমান যদি নেমে থাকে, হয়তো ওখানে অনেকে আহত হয়েছে। আমাদের উচিত ট্রাক নিয়ে যাওয়া।'

'কাদের হয়ে কাজ করেন আপনি?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমরা সময় নষ্ট করছি।'

'সবুর, ব্যাপারটা জরুরি। যদি লিবিয়ার সীমান্তের ওপাশে যাই, তার আগে জানতে চাই আপনি কী ধরনের কাজ করেন।'

'আমি সরকারী সংস্থার সঙ্গে আছি। ওটার নাম আপনি শোনেননি। বিসিআই। আমার কাজ আপনাদের উপর চোখ রাখা। ডক্টর ব্রাম ট্যাগার্ট তো ক্যাম্প থেকে বের হন না, কাজেই আমি আপনাদের দু'জনের উপর চোখ রাখছিলাম। স্মৃতি, আপনি তো ওই বিমান দেখেছেন?' আস্তে করে মাথা দোলাল আর্কিওলজিস্ট। 'আপনি কি জানেন ওই বিমানে কে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ, বোধহয় জানি।'

'আপনি বা আসাদ নিশ্চয়ই চাইবেন না উনি মারা যান? আমাদের দায়িত্ব তাঁকে উদ্ধার করা। এখন ভয় পেলে চলবে না। দরকার পড়লে লিবিয়ান বর্ডার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করব। লিবিয়ার সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আশা করি সরকার আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।'

আসাদ চৌধুরির দিকে চাইল স্মৃতি। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। নির্বিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবক। 'আপনার কী মনে হয়?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমি নায়ক নই, তবে মনে হয় গিয়ে দেখা উচিত।'

'তা হলে চলুন,' তাড়া দিল স্মৃতি।

খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে এল ট্রাক। চাঁদের মাটির মত

ফাটল ধরা জমিন। কোথাও কোনও গাছ নেই। শুষ্ক প্রান্তর। কিছু দূর যাওয়ার পর শুরু হলো টিলাময় অঞ্চল। চারপাশে বড় বড় বোল্ডার। মরুভূমির এই গভীর অংশে টিকে থাকে শুধু গিরগিটি ও পোকা-মাকড়। সন্ধ্যা নেমে এলে শিকারে বের হয়।

ট্রাক চলেছে। সবুর রহমান স্যাটালাইট ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। খানিক পর টের পেল তার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল আরেকটা রিচার্জেবল ব্যাটারি, কিন্তু ওটা ঠিক থাকলেও বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না সান স্পটের কারণে।

'শুনুন, এটা প্রায়োরিটি মিশন,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল সে। 'আমরা যদি ইউনুস আল-কবিরের ফতোয়া আবিষ্কার করতে পারি, খুব ভাল। কিন্তু যদি না পারি, তা-ও চলবে কনফারেন্স।'

'তাই ধারণা করছি,' বলল আসাদ চৌধুরি।

'কিন্তু কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের একজন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে ঠিক চলবে না কিছুই।'

সবুরের কথাগুলো মিলিয়ে গেল, চুপ করে থাকল স্মৃতি ও আসাদ। থমথম করছে পরিবেশ। খ্যারর-খ্যারর আওয়াজে চলছে ডিজেল ট্রাক। সবাই ভাবছে: বিমান যেখানে নেমেছে, সেখানে পৌঁছে কী দেখবে? ভয়ঙ্কর কোনও দৃশ্য? কখনও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি ওদের। তবে শুনেছে, ভদ্রমহিলা মুহূর্তে সবাইকে আপন করে নেন। উনি নানা দেশে শান্তি বজায় রাখবার জন্য বহুবার বক্তব্য দিয়েছেন জাতি-সংঘে। বলতে গেলে তাঁর উদ্যোগেই সংঘটিত হচ্ছে শান্তি মহাসম্মেলন। দিনের পর দিন কাজ করেছেন দেশগুলোর প্রধানদের একত্রিত করতে। ...উন্নত দেশের তৈরি গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরীব দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সংগঠিত করেছেন। উন্নয়নশীল

দেশের সমস্যা তুলে ধরেছেন সবার কাছে। ...ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এক কথায় বললে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এমনই একজন নেত্রী দরকার ছিল। আর এ মানুষটি বিমান ক্র্যাশে হারিয়ে গেলে তা সবার জন্য মস্ত ক্ষতি।

টিলার ভিতর এঁকেবেঁকে গেছে এক ক্যানিয়ন। ওটা ধরে চলল ট্রাক। এখানে খোলা মরুভূমির চেয়ে তাপমাত্রা একটু কম। সাপের মত পেঁচিয়ে সামনে বেড়েছে ক্যানিয়ন, তারপর বেরিয়ে এল ওরা উল্টো মুখে। এখন পর্যন্ত বিমানটার দেখা নেই। কোথায় ক্র্যাশ করেছে বোঝা গেল না। আকাশে কোথাও ধোঁয়ার আভাস নেই। যত নীচ দিয়ে গেছে বিমান, তাতে ধারণা করা যায় এতক্ষণে মাটিতে নেমে পড়েছে।

মনে মনে প্রার্থনা করল স্মৃতি, নিরাপদে থাকুন মানুষগুলো।

আরও একঘণ্টা এগোলো ট্রাক। ওরা সবাই জানে অনেক আগেই লিবিয়া সীমান্ত পেরিয়েছে, এখন ওরা সম্পূর্ণ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। স্মৃতি ও আসাদের ভরসা সবুর, সে ভাল আরবি জানে। কোনও বর্ডার প্যাট্রল টিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে হয়তো নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

বারবার উঁচু-নিচু হচ্ছে মরুভূমির মেঝে। নুড়ি পাথরের ঢিবির পর ঢিবি। সেখান থেকে আসছে প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ। দূরে চাইলে মনে হয় থরথর করে কাঁপছে সব। আরেকটা ঢিবির উপর উঠল ট্রাক। উল্টোদিকে নামতে শুরু করেছে আসাদ, এমন সময় হঠাৎ ব্রেক কষল। দ্রুত ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছন দিক দেখে নিল, ট্রাক পিছিয়ে নিতে চাইছে।

'কী হলো?' ভড়কে গেল স্মৃতি। ঢাল বেয়ে পিছন দিকে নামতে চাইছে ট্রাক।

আসাদের বদলে জবাব দিল সবুর, 'লিবিয়ান প্যাট্রল!'

ঢিবির উপর উঠে এসেছে মিলিটারি ভেহিকেল। উপরের হ্যাচ থেকে মাথা তুলেছে এক সৈনিক, হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন মেশিনগান। গাড়ির সাসপেনশন উঁচু, টায়ারগুলো বেলুনের মত ফোলানো। বাক্সের মত ক্যাব। গাড়িটা মরুভূমিতে চলার জন্য তৈরি।

'ভুলেও পিছাবেন না, আসাদ,' ইঞ্জিনের শব্দের উপর দিয়ে বলল সবুর, 'সে চেষ্টা করলে ওরা গুলি করবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধার ভিতর পড়ল আসাদ, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। ঠিকই বলেছে সবুর। অ্যাক্সেলারেটার থেকে পা সরিয়ে নিল সে, চেপে ধরল ব্রেক। একটু হড়কে গিয়ে থামল ট্রাক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

লিবিয়ান ট্রাক বিশ গজ দূরে থেমেছে। ছাতের গানার পরিষ্কার দেখছে তিনজনকে। পিছন-দরজা খুলে লাফিয়ে নামল চার সৈনিক, পরনে মরুভূমির ফেটিগ। একে-ফোরটিসেভেন বাগিয়ে ধরে ছুটে আসছে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে।

জীবনে এত ভয় পায়নি স্মৃতি। সব যেন ঘুমের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত আগে ওরা নিশ্চিন্ত মনে একা চলছিল, আর পরমুহূর্তে অস্ত্র হাতে ধেয়ে এল সৈনিক। চারটে রাইফেল তাক করে আছে ওদের দিকে!

চিৎকার করে কী যেন বলছে লিবিয়ান সৈনিকরা, সঙ্গে হাতের ইশারা। বোধহয় ট্রাক থেকে নামতে বলছে। আরবি ভাষায় তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়তে চাইল সবুর। কিন্তু লোকগুলো শুনতে রাজি নয়। এক সৈনিক পিছিয়ে গেল, এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ট্রাকের পাশে। ছিটকে উঠল বালি ও পাথর। বাতাসে ভেসে গেল বালিকণা। পাথরগুলো ছিটিয়ে গেল চারদিকে।

প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল স্মৃতি, নিজেও জানে না কখন কাঁদতে শুরু করেছে।

ওরা তিনজন মাথার উপর দু'হাত তুলল। বোঝাতে চাইছে

আত্মসমর্পণ করছে। এক সৈনিক খপ করে ধরল স্মৃতির হাত, হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল ক্যাব থেকে। এই দুর্ব্যবহার দেখে আপত্তি তুলতে চাইল আসাদ, কিন্তু পাশ থেকে তার কাঁধের উপর নামল একে-৪৭-এর বাঁট। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল ওর, বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

টান খেয়ে বালির উপর আছড়ে পড়ল স্মৃতি। ব্যথা তো আছেই, তার চেয়ে বেশি লাগল মনে। এত অপমান কী করে সইবে?

পিছন সিট থেকে লাফিয়ে নামল সবুর, দু'হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে। 'দয়া করে শুনুন,' আরবিতে বলল। 'আমরা জানতাম না লিবিয়ার ভিতর ঢুকে পড়েছি।'

'বিমানটার কথা বলুন,' বলল স্মৃতি। উঠে দাঁড়াল। পোশাক থেকে ঝাড়তে শুরু করেছে বালি।

'ঠিক আছে, বলছি,' সৈনিকদের দিকে চাইল সবুর। 'আমরা একটা বিমান দেখতে পাই। ওটা ক্র্যাশ করছিল। তাই কী হয়েছে দেখতে আসি।'

সৈনিকদের পোশাকে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। তবে মনে হলো একজন এদের নেতা। লোকটা জানতে চাইল, 'এসব কোথা থেকে দেখেছ?'

কথা বলবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো সবুর। 'আমরা একটা আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে এসেছি। তিউনিশিয়ার ভিতর সীমান্তের পাশেই ক্যাম্প। কাজ করছিলাম, এমন সময় দেখি মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমানটা। অর্থাৎ, ধরুন, তিন শ' মিটার উপর দিয়ে।'

'তোমরা প্লেন ক্র্যাশ করতে দেখেছ?' সৈনিকদের নেতার গালে চাপ দাড়ি।

'না। দেখিনি। ধারণা করেছি যে-ভাবেই হোক, মরুভূমিতে

নেমে গেছে। কোনও ধোঁয়া দেখিনি।'

'এটা তোমাদের জন্য একটা ভাল সংবাদ,' নির্বিকার সুরে বলল লোকটা।

'কী বলতে চাইছেন?' নরম স্বরে জানতে চাইল সবুর।

পাত্তা দিল না লিবিয়ান, ঘুরে চলে গেল প্যাট্রল ভেহিকেলে। এক মিনিট পর ফিরে এল। বাঙালিরা বুঝতে পারল না তার হাতে কী। তারপর এক সৈনিকের হাতে দেয়া হলো। জিনিসগুলো হ্যাণ্ডকাফ!

'আমাদের আটক করছেন কেন?' ইংরেজিতে বলল স্মৃতি। কিন্তু এক সৈনিক পিছন থেকে খপ্ করে ওর কাঁধ ধরল। 'আমরা তো কোনও অপরাধ করিনি!'

ওর দুই কবজি আটকা পড়ল হ্যাণ্ডকাফে। অপমানে লাল হয়ে গেল স্মৃতি, থুতু ছুঁড়ল লোকটার মুখ লক্ষ্য করে। ঠিক লেগেছে! এতে ভীষণ রেগে গেল লিবিয়ান, উল্টো হাতে প্রচণ্ড এক চড় দিল স্মৃতির গালে। বেচারি হোঁচট খেয়ে পড়ল বালির উপর।

ধাক্কা দিয়ে সামনের সৈনিককে সরিয়ে দিল আসাদ, লোকটা হ্যাণ্ডকাফ পরাতে চাইছে ওর হাতে, কিন্তু পাত্তাই দিল না। দু' পা সামনে বাড়ল স্মৃতিকে তুলতে, বালির উপর প্রায় অচেতন মেয়েটি। ঠিক তখনই নড়ে উঠল সৈনিকদের নেতা। ওয়েইস্ট হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে বের করে ফেলেছে পিস্তল, পরক্ষণে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করল আসাদের ডান চোখ লক্ষ্য করে।

ছিটকে পিছনে গেল আসাদের মাথা, স্মৃতির কয়েক ফুট দূরে ধপ্ করে পড়ল লাশ। বিবশ হয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি, আসাদের কপালে তৈরি হয়েছে রক্তাক্ত আরেকটা চোখ! ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘন লাল রঙের ধারা।

স্মৃতি টের পেল, উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনও বোধ কাজ করছে না। কাউকে বাধা দিল না, ওকে টেনে নিয়ে চলেছে দুই সৈনিক,

তুলে দিল ট্রাকে।

দরদর করে অশ্রু ঝরছে স্মৃতির দুই গাল বেয়ে।

থমকে গেছে সবুর রহমান। নীরবে স্মৃতির পাশে গিয়ে বসল। ট্রাকের ভিতরটা ভ্যাপসা গরম। খোলা মরুভূমি এর চেয়ে অনেক শীতল ছিল।

এক সৈনিক কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল ওদের দু'জনকে।

দশ

বাংলাদেশ এম্বেসি। ত্রিপোলি।

নিজ অফিসে বসে আছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। তাঁর সেক্রেটারি ঘরের দরজা খুলে দিতেই সচেতন হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দামি কার্পেট মাড়িয়ে চললেন দরজার দিকে। ঘরের মাঝ পর্যন্ত চলে এলেন।

অফিসে ঢুকেছেন লিবিয়ান ফরেন মিনিস্টার, মোহাম্মদ ফতে আলী।

'আসুন, মাননীয় মন্ত্রী, জরুরি শিডিউল রেখে এসেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদ,' থমথম করছে অ্যাম্বাসেডারের মুখ।

'গুরুতর এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেণ্ট গাদ্দাফি চেয়েছেন আমাদের সরকারের তরফ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সমবেদনা জানাতে। সত্যিই, দেশের কাজ ফেলে রাখা কঠিন। তবে নিশ্চয়ই আমার উপস্থিতি থেকে বুঝছেন, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনায় আমরা সত্যি গভীর সমবেদনা জানাতে চাই?' অ্যাম্বাসেডারের দিকে হাত

বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন নাহিদ কামাল। হাতটা ছেড়ে দিলেন না, নিয়ে চললেন ভদ্রলোককে সোফার দিকে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল ঝিকমিকে নীল ভূমধ্যসাগর। বহু দূরে পশ্চিমে চলেছে এক সুপার ট্যাঙ্কার।

বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার মাঝারি আকৃতির মানুষ। তাঁর পাশে ঝাড়া ছ' ফুটি লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন রীতিমত পাহাড়। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো তাঁর। পরনে স্যাভিল রো-র দামি সুট। আয়নার মত ঝিকঝিক করছে শু জোড়া। নিখুঁত ইংরেজি বলেন। প্রায় ধরাই যায় না তিনি আরব। মুখোমুখি সোফায় বসে বাম ঊরুর উপর ডান ঊরু রাখলেন, ঠিক করে নিলেন সুটের প্যাণ্টের ভাঁজ।

'আমাদের সরকারের তরফ থেকে বলতে পারি, ইতিমধ্যে ওই এলাকায় তল্লাশী ও উদ্ধারের জন্য তিনটি দল পাঠানো হয়েছে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রিকনেসেন্স বিমান। ওই বিমানের কী ঘটেছে তা জেনে যাব আমরা শীঘ্রিই, তার আগে ক্ষান্ত দেব না।'

'সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী।' আনুষ্ঠানিক ভাবে বললেন অ্যাম্বাসেডার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কূটনীতিক, তাঁর জানা আছে শুধু মূল বক্তব্য শুনলে চলবে না; তা কী সুরে কীভাবে বলা হলো, তা বুঝতে হবে। 'এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার কোনও সাহায্যে আসতে পারে? আপনি উপস্থিত হওয়ায় ধারণা করছি লিবিয়ান সরকার ভাবছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনার ভিতর পড়েছেন।'

'বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না,' বললেন লিবিয়ান মন্ত্রী। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'এ ছিল দু' দেশের মানুষের জন্য দুঃখজনক। আপনারা স্বাধীনতা পাওয়ার পরও আমাদের ভিতর সম্পর্ক বিরূপ ছিল। তবে পরে আলাপের

মাধ্যমে বিরোধগুলো নিষ্পত্তি হয়। এ দেশে হাজারো বাংলাদেশি লোক চাকরি নিয়ে আসে। হয়তো এ থেকে প্রমাণ হয় আমরা আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আপনি তো জানেন আমরা চেয়েছি শান্তি মহাসম্মেলন আমাদের দেশে আয়োজিত হোক। সেজন্য আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে একই সাথে কাজ করে গেছেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন অ্যাম্বাসেডার। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী। আমরা চাই জগতে শান্তি ফিরে আসুক।' নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'এবার ফিরি বিমান দুর্ঘটনা বিষয়ে। আমাদের সরকার থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিমানে কোনও সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। তবে আপনাদের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও তদন্ত করে দেখতে চাই।' কামাল সাহেব বুঝতে পারছেন জবাব কী হতে পারে। 'আপনারা অনুমতি দিলে আমাদের তদন্ত দল এ দেশে আসতে পারে।'

'খুবই খুশি হতাম, যদি অনুমতি দেয়া যেত,' বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'তবে লিবিয়ান সরকারের ধারণা আমাদের নিজস্ব মিলিটারি এবং সিভিলিয়ান সার্চ ইউনিটগুলো এ কাজে যথেষ্ট পারঙ্গম।'

থম মেরে রইলেন অ্যাম্বাসেডার।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন মোহাম্মদ ফতে আলী। 'আমরা সত্যিই দুঃখিত। তবে ভাববেন না। আমাদের ইউনিটগুলো ওই বিমান খুঁজে বের করবে। ...এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। কনফারেন্সের বিষয়ে প্রতিটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা। আমাদের অনুরোধে সবাই জানিয়েছে, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার পরও তাঁরা পীস সামিটে যোগ দেবেন। আপনারা কী ভাবছেন?'

'আজ সকালে আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বললেন নাহিদ কামাল। 'তিনিও ওই একই কথা বলেছেন।

আমরা পীস সামিটে যোগ দেব। খোদা মাফ করুন, সত্যিই যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খারাপ কিছু ঘটে থাকে, তারপরও আমরা বলব, তিনি নিজেও চাইতেন এই মহাসম্মেলন সফল হোক। আগে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠার এত বড় সুযোগ আসেনি। হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বোধহয় অন্য সবার চেয়ে বেশিই চেয়েছেন শান্তি সম্মেলন।'

'ভাল বলেছেন। খারাপ কিছু না হোক। তবুও বলতে হয় তা-ই বলছি তিনি সম্মেলনে যোগ না দিতে পারলে সেক্ষেত্রে আপনাদের সরকারের তরফ থেকে কে আসছেন?'

'এখনও জানি না। আমাদের সরকার এই মুহূর্তে বিমূঢ়।'

'বুঝতে পারছি। খবরের কাগজে যা পড়েছি, সত্যিই আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনও রিপ্লেসমেন্ট নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'মিস্টার অ্যাম্বাসেডার, আপনার বাড়তি সময় নেব না। অন্তর থেকে বলছি, এ ঘটনায় আমি দুঃখিত। কথা দিতে পারি, যে মুহূর্তে কোনও খবর পাব, তা দিন হোক বা রাত, আমি নিজে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'জানি না কেন এ ধরনের খেলা খেলেন আল্লাহ।'

'ধন্যবাদ,' আর কিছু বললেন না কামাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিজে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতে বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, একটা কথা। যদি ওখানে কোনও ধ্বংসাবশেষ থাকে, আমাদের কর্তব্য কী হবে?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'বিমান যদি ভূ-পাতিত হয়, বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ করবে আমাদের নিজেদের গবেষক টিম যেন ওখানে যেতে পারে। তারা খুঁজে বের করবে কী কারণে বিমান পতিত হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।' চোয়াল ঘষলেন আলী। 'ওই একই কাজ

করবার জন্য আমাদের গবেষক দল রয়েছে। তবে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে করি না। তারপরও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলাপ করে তাঁর মতামতটা পরে জানিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

দু'মিনিট পর নিজের অফিসে ফিরলেন নাহিদ কামাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টোকা পড়ল দরজায়।

'কাম ইন।'

'আপনার কী মনে হলো?' জানতে চাইল বিসিআইয়ের সলীল সেন। গদিমোড়া সোফায় বসল রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। আট ঘণ্টা আগে পৌঁচেছে সে এ-দেশে। বিসিআইয়ের তুখোড় স্পাই ছিল সে, শারীরিক কিছু অসুবিধার জন্য বর্তমানে ডেস্কে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিল। ডেস্ক ওঅর্কের জন্য ওকে আবারও বিসিআই-এ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'এরা যদি কিছু করেও থাকে, মোহাম্মদ ফতে আলী সেসবের সঙ্গে জড়িত না,' বললেন কামাল।

'যা শুনেছি, এই লোক গাদ্দাফির প্রিয় পাত্র। বিমান যদি পড়ে গিয়ে থাকে, ফতে আলি তা জানে।'

'আমার মন বলছে লিবিয়ানরা কিছুই করেনি। যা ঘটেছে সেটা নেহায়েতই দুর্ঘটনা।'

'আমরা এখনও নিশ্চিত নই। ধ্বংসাবশেষ পেলে আমাদের তদন্ত দল বলতে পারবে কী ঘটেছে।'

'তা তো বটেই।'

'মোহাম্মদ ফতে আলীর কাছে জানতে চেয়েছেন আমাদের ছেলেদের আসতে দেবে কি না?'

'জানতে চেয়েছি। মনে হলো আপত্তি নেই। তবে আগে গাদ্দাফির সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। বুঝলাম দ্বিতীয়বার এ কথা শুনবার জন্য তৈরি ছিল না। জবাব দিতে সময় নিয়েছে।

তবে কূটনৈতিক ভাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার।'

'আমাদের নিজেদের লোক ঠিকই বুঝবে কী হয়েছে,' বলল সলীল। 'কী ধরনের লোক মোহাম্মদ ফতে আলী?'

'আগেও দেখা হয়েছে। তবে এই প্রথম মনে হলো কূটনৈতিক ভদ্রতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক, আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। তবে খানিক বিচলিত মনে হলো। গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে শান্তি মহাসম্মেলনের সঙ্গে। যেন ওটা সফল হওয়ার উপর নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত সম্মান। টপ সামিটের আগেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। খুব বিব্রত মনে হলো। বিশ্বাস হয় না গাদ্দাফির মত লোকের সরকারে এ ধরনের ভদ্রলোক থাকবে।'

'গাদ্দাফি ভাল করেই বুঝছেন সব। আমেরিকা দখল করে নিয়েছে ইরাক। মারা গেছেন সাদ্দাম হোসেন। বোধহয় এর পর তাঁর নিজের উপর হামলা আসবে। তাই শান্তি সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর এই আগ্রহ।'

'সত্যিই আর বেশি দিন নেই, পশ্চিমারা লেলিয়ে দেবে সরকার-বিরোধীদের।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন কামাল, 'নতুন কোনও তথ্য পেলেন?'

'আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি আমেরিকার ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস তাদের এক স্পাই স্যাটালাইটকে গালফ কাভার করতে পাঠিয়েছে। তবে ওটার ছবি পেতে দেরি হবে। বিমান যদি ওদিকে থাকে, ছবি আমরা পাবই।' রানা ও তার জাহাজ মার্ভেলের কথা অ্যাম্বাসেডারকে বলল না সলীল।

'লক্ষ লক্ষ স্কয়্যার মাইল কাভার করতে হবে,' বললেন কামাল। 'তার ভিতর রয়েছে পাহাড়ি এলাকা।'

'শুনেছি ওসব স্যাটালাইট হাজার মাইল উপর থেকে যে-কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট পড়তে পারে।'

বেশ মুষড়ে পড়েছেন অ্যাম্বাসেডার, বললেন না ওই এলাকা বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বড়। 'আর কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু নয়। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা।' সলীল বুঝে নিয়েছে ভদ্রলোক একা থাকতে চাইছেন। উঠে দাঁড়াল সে।

'আমার সেক্রেটারিকে একটু আসতে বলবেন?'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সলীল।

থম মেরে বসে রইলেন অ্যাম্বাসেডার। প্রার্থনা করছেন প্রধানমন্ত্রী সুস্থ থাকুন।

'এই যে আপনার অ্যাসপিরিন,' এক হাতে গ্লাস ও অন্য হাতে মাঝারি একটা বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সেক্রেটারি।

মুখ তুলে চাইলেন অ্যাম্বাসেডার। 'দু'চারটা ট্যাবলেটে কিছুই হবে না, হারুন। পুরো বোতল রেখে যাও। ওটা লাগবে।'

এগারো

দ্য মার্ভেল অভ গ্রীস।

অপারেশন্স সেন্টার।

রায়হান রশিদ ও খোরশেদ নবী দেখছে ভিডিও ডিসপ্লে, খেয়াল নেই কোনও দিকে। দু'জন মিলে সিআইএ ও আমেরিকান ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাক করছে। মিলছে কাঁচা স্যাটালাইট ইমেজারি। ওরা জানে না কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মাসুদ ভাই। একটু আগে মেজর জেনারেল

(অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে মিটিং হয়েছে রানার। তখনই ঠিক হয়েছে ওরা সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম তৈরি করে ঢুকে পড়বে লিবিয়ার ভিতর। খুঁজে বের করবে কোথায় রয়েছে ওই ভূ-পাতিত বিমান। কেউ যদি বেঁচে থাকেন, সম্ভব হলে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে ওই দেশ থেকে।

বেসিক প্যাটার্ন রিকগনিশন সফটওয়্যার দিয়ে ইমেজারি সার্চ করছে রায়হান ও নবী। আশা করছে, শিঘ্রি জানা যাবে কোথায় পড়েছে বিমান। ওদের মত একই কাজ করছে আমেরিকানদের একটি দল। তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রায়হানদের চেয়ে অনেক বেশি সফেসটিকেটেড। তবে অন্তর থেকে জানে রানা, ওর ছেলেরা অন্যদের অনেক আগেই আবিষ্কার করবে এয়ারবাসটা।

'এবার তোর ছাগলা দাড়িটা কেটে ফ্যাল,' কাজের ফাঁকে বলল রায়হান।

মাথা নাড়ল নবী। 'ফেসবুকে যে মেয়ের সঙ্গে খাতির হয়েছে, তুই তো চিনিস, ও কিন্তু বলেছে দাড়িতে আমাকে দারুণ লাগে।'

'তা হলে ওকে বিয়ে করে ফ্যাল। আর কেউ চান্স দেবে না। ওদিকটা দ্যাখ্। ওদিকে ওটা কী?'

'দাঁড়া, ভাল করে দেখি।'

দু'জন ঝুঁকে পড়ল স্ক্রিনের উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর ওভারহেড বাতি জ্বেলে দিল রানা। স্ক্রিন থেকে চট্ করে মুখ তুলল রায়হান ও নবী।

তারা একই ব্র্যাণ্ডের জিন্স পরেছে। একই প্রিণ্টেড শার্ট। দেখে মনে হয় যমজ। দারুণ খাতির দু'জনের। বিসিআইয়ে আসবার পর গত দু'বছরে বুজম ফ্রেণ্ড হয়ে গেছে।

'মাসুদ ভাই, এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন,' লাজুক স্বরে বলল নবী। লালচে হয়ে গেছে মুখ। ধারণা করছে তিনি ওদের কথা শুনে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি স্ক্রিনের মানচিত্রের দিকে আঙুল

তুলল। ওখানে ভূমধ্য সাগর মিশেছে সাহারা মরুভূমিতে। ত্রিপোলি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। লিবিয়ার তীর গেছে টানা লাইনের মত, কিন্তু এখানে এসে ঢুকেছে সাগর। জায়গাটা নিখুঁত এক ত্রিকোণের মত। আন্দাজ করা যায় ওটা তৈরি হয়েছে মানুষের কল্যাণে। মনিটরের স্কেল বলছে ওই ত্রিকোণ বিশাল আকৃতির।

'নতুন টাইডাল পাওয়ার স্টেশন,' বলল রায়হান। 'মাত্র এক মাস আগে কাজ শেষ করেছে।'

'জানতাম না ভূমধ্য সাগরে জোরালো জোয়ার হয়,' আপন মনে বলল রানা।

'হয় না তো,' বলল নবী। 'তবে জোয়ার বা ভাটা লাগে না ওই পাওয়ার স্টেশনের। জায়গাটা একটা উপসাগরের সরু মুখ। ভিতর অংশ ভাল ভাবে খনন করেছে। উপসাগরের সরু মুখে প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়েছে। তারপর শুকিয়ে নিয়েছে ওই এলাকা। চারদিকের চওড়া জমি গিয়ে মিশেছে মরুভূমিতে। বাঁধের উপর বসিয়েছে অসংখ্য স্লুইস গেট। ওগুলো ঢালু ভাবে বসানো। যখন জোয়ার আসে, গেটের ভিতর দিয়ে আসতে থাকে সাগরের পানি, ঢুকে পড়ে ঢালু পাইপের ভিতর। ঘুরতে শুরু করে টারবাইন, তৈরি হয় ইলেকট্রিসিটি।'

'ভাল বুদ্ধি না,' বলল রায়হান। 'ওই উপসাগর যত বড়ই হোক, শেষ পর্যন্ত ভরে উঠবে সাগরের পানিতে।'

'ওই এলাকার কথা মাথায় রাখো,' বলল রানা। যখন প্রথম ওই প্রজেক্টের কথা শোনে, তখনই বুঝেছে ওটার রহস্য কোথায়। রানার দিকে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রায়হান। 'ওই মরুভূমি হচ্ছে আসল রহস্য।'

চট্ করে বুঝে নিল রায়হান। 'দারুণ তো! নিয়মিত শুকিয়ে যাবে পানি!'

‘রিযারভয়ের প্রকাণ্ড ও চওড়া হতে হবে, তবে গভীর না হলেও চলবে,’ বলল নবী। ‘ওরা টিপিকাল ইভাপোরেশন রেট ক্যালকুলেট করেছে, ঠিক করে নিয়েছে কী পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করবে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যায় প্রায় খালি হয়ে গেছে নকল হ্রদ। তারপর আবারও আসে জোয়ার, বাঁধের ওপাশে উঁচু হয় পানি, স্লুইস গেট খুলে দিলেই পাওয়ার হাউস পায় ইলেকট্রিসিটি। দিনের পর দিন চলবে এ-ই।’

‘কিন্তু...’ আপত্তি তুলল রায়হান।

‘বাড়তি লবণ?’ হাসল নবী। ‘প্রতি রাতে ট্রাক দিয়ে সরিয়ে নেয়। বিক্রি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে। রাস্তার জন্য ব্যবহার হয় এই লবণ। কমপ্লিট রিনিউয়েবল, পরিষ্কার এনার্জি আর বোনাস হিসাবে প্রতি বছর লিবিয়ান সরকার পকেটে পুরবে কয়েক মিলিয়ন ডলার।’

‘কিন্তু সমস্যা তো রয়েই গেল,’ বলল রায়হান। ‘বছরের পর বছর ইভাপোরেশন হলে ওই সাইট থেকে শুরু করে পিছনের সমস্ত এলাকা বদলাতে থাকবে। পরিবেশ দূষণ হবে।’

‘রিপোর্টে লিখেছে ক্ষতির পরিমাণ খুব কম,’ বলল নবী।

‘ওই রিপোর্ট তৈরি করেছে এক ইতালিয়ান কোম্পানি। ওরাই কিন্তু তৈরি করেছে ওই প্লান্ট।’ মৃদু হাসল রানা।

‘ওরা তো বলবেই ক্ষতি নেই, আসলে এটা ষড়যন্ত্র,’ বলল রায়হান। পশ্চিমা বিশ্বের চক্রান্ত ধরে দেয়ার পর থেকে অতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

‘ওসব নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে,’ বলল রানা। ‘আমাদের প্রথম কাজ প্রধানমন্ত্রীর বিমান খুঁজে বের করা।’

‘মাসুদ ভাই, আপনি জানতে চাইছেন কিছু পেলাম কি না,’ বলল নবী। ‘কয়েকটা সিনারিয়ো নিয়ে ভেবেছি আমরা। প্রথম কথা, ওই বিমান মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হতে পারে। এমনও

হতে পারে মেশিনারিজে বড় ফেলিওর ছিল। কোনও মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হতে পারে। যদি তা-ই হয়, ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়বে কয়েক শ' স্কয়্যার মাইল জুড়ে। সব নির্ভর করে বিমানের গতি ও উচ্চতার উপর।'

'সেক্ষেত্রে টুকরোগুলো খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে,' বলল রায়হান। 'মিসাইল কোথায় আঘাত হেনেছে তা না জানলে কিছুই বুঝব না।'

'আমরা জানি বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার ও কমিউনিকেশন কখন বন্ধ হয়েছে,' বলল নবী। 'তাদের কোর্স, স্পিড ও কখন ত্রিপোলি এয়ারপোর্টে পৌঁছাত, এসব থেকে বেরিয়ে আসে অনেক তথ্য। ধারণা করা যায় বিমান পৌঁচেছে তিউনিশিয়ার সীমান্তে। তবে বিধ্বস্ত হয়েছে লিবিয়ার বর্ডার পেরিয়েই।'

'তোমরা ম্যাপে সেখানে গেছ?' মাল্টিপ্যানেল ডিসপ্লেতে মরুভূমির ইমেজারি দেখছে রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'এটা ওখানকার ছবি নয়। ওদিকটা আগেই দেখেছি আমরা। প্রায় কিছুই নেই। ছিল শুধু একটা পরিত্যক্ত ট্রাক। ওদিকে চাকার অনেক দাগ। আমার ধারণা ওগুলো এসেছে সীমান্ত প্রহরীদের তরফ থেকে। তবে ওদিকে বিমান নেই।'

'ভাল,' বলল রানা। 'হয়তো প্রধানমন্ত্রীর বিমান আকাশে বিস্ফোরিত হয়নি।'

'এটা ভাল, আবার একই সঙ্গে খারাপ,' বলল নবী। 'আমরা জানি না ঠিক কী ঘটেছিল। কাজেই বোঝা কঠিন। অক্সিজেন সিস্টেম ফেইল করে সবাই মরল, নাকি ফিউয়েল শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল বিমান? হয়তো আরও পাঁচ শ' মাইল গেছে, হয়তো পড়েছে ত্রিপোলির পুবে। কে বলবে ভূমধ্যসাগরে পড়েনি? আসলে হয়তো ইঞ্জিন নষ্ট হয়। সেটা হলেও, বিমান গ্লাইড করে

মাইলের পর মাইল যেতে পারে, তারপর পড়তে পারে।'

'তা হলে রেডিও বন্ধ হলো কেন?' জানতে চাইল রানা। 'ওরা তো যোগাযোগ করত।'

'আমরা এ নিয়ে ভেবেছি,' বলল রায়হান। 'আসলে প্রতিটি দিক বুঝে এগুতে হবে, নইলে বেরুবে না কোন এলাকায় পড়েছে বিমান। এটা খুব অস্বাভাবিক যে ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো রেডিও। কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এফবিআই তদন্ত করছে। নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্টের গ্রাউণ্ড টিমের সঙ্গে কথা বলেছে। শেষবার ওখানে সার্ভিস করা হয় ওই বিমান।'

'হ্যাঁ, তাদের তদন্ত শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'এদিকে বিসিআই ফ্লাইট ক্রুদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। প্রত্যেকে ছিল বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের। কেউ সিকিউরিটির বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না।'

'এয়ারফোর্সের কাউকে কিনে নেয়া যাবে না, তা ধরে নেয়া ঠিক হবে?' বলল রায়হান। 'হয়তো গোপন কোনও লিবিয়ান বেসে গিয়ে নেমেছে। আর সে লোক আল-কায়েদার মত কোনও দলের হতে পারে। এ মুহূর্তে নির্যাতন করছে প্রধানমন্ত্রীকে।' চকচক করছে ওর দুই চোখ। আবেগ এসে গেছে। ভাবতে গিয়ে বহু কিছু আসছে মনে।

'কল্পনার ডানায় চড়ে ভাসতে হবে না,' ধমক দিল নবী।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' নাখোশ হয়ে বলল রায়হান। 'ধরে নিই দুই ইঞ্জিন বন্ধ হলো। আমরা জানি গতি ও উচ্চতা কী ছিল, আন্দাজ করা যায় প্রতি মিনিটে পনেরো শ' ফুট নেমে এসেছে। তা হলে পাই আশি নটিকাল মাইল। তার ভিতর নেমেছে বিমান।'

'স্ক্রিনে তা-ই দেখছ?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল নবী।

রায়হান বলল, 'আমরা দেখছি ইঞ্জিন ও রেডিও নষ্ট হওয়ার সিনারিয়ো। এসব খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগেনি। আর তাই আরও ভাল কিছু পেয়েছি।'

ধৈর্য হারাল না রানা। তখনই কিছু বলল না। ওর জানা আছে, সুযোগ পেলে দুই তরুণ এজেন্ট বুদ্ধিমত্তা দেখাতে চায়। ক' মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'বললে আরও ভাল কিছু পেয়েছ, কী সেটা?'

'বিমানের লেজ খসে পড়ে, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান।

'বা লেজের বড় একটা অংশ,' সায় দিল নবী।

'লেজের স্ট্রাকচারাল ফেলিওর হলে রেডিও অ্যান্টেনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর সে-কারণে যোগাযোগ করেনি,' বলল রায়হান। 'একই সঙ্গে নষ্ট হয়েছে বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার।'

'যে ধরনের ক্ষতি, তারপরও বহু দূর যেতে পারে,' শুরু করল নবী। 'আনস্টেবল থাকবে বিমান, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ পাবে না পাইলট। তবে ইঞ্জিনগুলোর অল্টারনেটিভ থ্রাস্ট দিয়ে সরতে পারবে।'

'আমরা জানি বিমানে যথেষ্ট ফিউয়েল ছিল। হয়তো ফেলে দিয়েছে, নইলে ওই ওজন নিয়েই নামতে শুরু করেছে। কী ঘটেছে জানা নেই।' মাথা দোলাল রায়হান। 'ভাবতে দোষ কী ওটা কয়েক শ' মাইল গেছে?'

'কিন্তু তা করেনি, নইলে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং করতে পারত ত্রিপোলিতে।'

'গুড পয়েন্ট, নবী,' বলল রানা। 'কিন্তু তারা কোথায়?' বিরক্ত বোধ করছে। বোঝা যাচ্ছে, রায়হান ও নবী কিছু পেয়েছে।

'আমরা আমাদের দুই ধরনের সিনারিয়োকে একত্র করেছি,' বলল নবী। 'ইঞ্জিন ফেলিওর আর লেজ খসে পড়া ছিল মূল সমস্যা। ওসব হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু হতেই পারে। আর

সেক্ষেত্রে আমরা পাই এক শ' স্কয়্যার মাইল। আমরা বিশেষ এলাকা বাছাই করে পেলাম বিমান আকৃতির জিওলজিকাল ফর্মেশন।'

কি বোর্ডে টোকা দিল রায়হান। স্ত্রিনের মাঝখানে আঙুল রাখল। 'আর এই যে, এটা মিলল।'

ঝুঁকে দেখল রানা। স্ক্রিনে পাহাড়ি এলাকা। হেলিকপ্টার ছাড়া ওখানে নামা প্রায় অসম্ভব। হয়তো যেতে পারবে ফোর হুইল জিপ। প্যানেলের কণ্ট্রোলে কয়েকটা কি টিপল রায়হান। জুম হয়ে এল ছবি।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ওটাই,' বলল রানা।

'বিধ্বস্ত বিমান, আমাদেরও তা-ই ধারণা,' একসঙ্গে বলল রায়হান ও নবী।

যোগ করল নবী, 'তবে নিশ্চিত না হয়ে বলি কী করে!'

'এখন নিশ্চিত হয়েছ?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রানা। 'ভবিষ্যতে আগেই বলবে কী পাওয়া গেছে।'

লজ্জা পেয়ে বলল দুই বন্ধু, 'জী, মাসুদ ভাই।'

একটা পাহাড়ের উপর পড়েছে বিমান। কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। পাহাড়ি ঢালের উপর আধ মাইল জুড়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রথম যখন বিমান মাটিতে নেমে আসে, সে জায়গা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লাফিয়ে ওঠে বিমান, তারপর পেট দিয়ে আবারও পড়ে। গতি কমবার সঙ্গে ছিঁড়তে থাকে। দ্বিতীয়বার নেমে আসবার পর টুকরো টুকরো হয়। সেগুলোর মাঝে মাটি পুড়ে গেছে। ফিউজেলাজের তিন ভাগের দুই ভাগ একইসঙ্গে রয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে কালো। দু'পাশে পড়ে আছে ডানার টুকরো। এয়ারক্রাফট থেকে এক শ' ফুট দূরে একটা ইঞ্জিন। দ্বিতীয়টা দেখতে পেল না রানা।

'জীবিত কেউ নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান।

'নতুন স্যাটালাইট ইমেজারি পাব আবার দশ ঘণ্টা পর,' বলল নবী। 'তখন দুটো মিলিয়ে দেখব। কিছু বদলে থাকলে, তা ধরা পড়বে। কিন্তু মনে করি না ওই ক্র্যাশের পর কেউ বাঁচবে। আগুন ধরে গিয়েছিল বিমানে।'

থমথম করছে রানার মুখ। বলল, 'অনেক দেরি করিয়ে দিলে, তবে গুড ওঅর্ক বয়েজ। আমার কমপিউটারে নোট সহ পাঠিয়ে দাও কোঅর্ডিনেট্স্। আমাদের চিফ চাইবেন আমরা তদন্ত করি। ধরে নিতে পারো ওই সাইটে যেতে হবে। এবং পৌঁছুতে হবে লিবিয়ানদের আগেই। এবার দেখো ওরা কোথায় খুঁজছে।'

'প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে,' বলল রায়হান। 'আমার ধারণা ভান করছে। ভাল করেই জানে আমেরিকানদের স্যাটালাইট খুঁজে বের করবে বিমান। লিবিয়ান সরকার তথ্য পেলে নিজেদের লোকদের বলবে কোথায় পড়েছে এয়ারবাস।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদের আগেই হাজির হতে হবে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারব না, কাজেই ম্যাপ দেখে পথ বেছে রাখো।' বিমান দুর্ঘটনার কথা ভাবতে তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। মানুষগুলো কতটা ভয় পেয়েছিল? পাহাড়ের কাঁধে নেমে আসছে বিমান! কী ছিল মানুষগুলোর শেষ ভাবনা?

এক ঘণ্টা পর। নিজের কেবিনে বসে আছে রানা, হাতে জ্বলছে সিগারেট। কুণ্ডুলি পাকিয়ে সিলিঙের দিকে উঠছে ধোঁয়া। ঠিক হয়েছে আজ রাতে ত্রিপোলি বন্দরে ভিড়বে মার্ভেল। এক লিবিয়ান ডিআইজিকে ঘুষ দিয়ে কাস্টমসের কড়াকড়ি এড়িয়ে গেছে বিসিআইয়ের স্থানীয় এজেন্ট। জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া হবে বিশেষ একটি ট্রাক। ওটা তৈরি করেছেন বিসিআইয়ের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর শামশের আলী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স গবেষণাগারে। মাস দুয়েক আগে ওটা তুলে দেয়া হয়েছে জাহাজে। এদিকে

লিবিয়ান ডিআইজির মাধ্যমে জোগাড় হয়েছে রানা-স্বর্ণা-নিশাত-ফেং-নবী ও কাশেমের ভিসা।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান জানিয়ে দিয়েছেন, ওদের খুঁজে দেখতে হবে কেন ধ্বংস হলো বিমান। কেউ বেঁচে থাকলে তাঁকে সরিয়ে নিতে হবে।

স্যাটালাইট ইমেজের হার্ড কপির দিকে চাইল রানা। বিমান পতিত হওয়ার প্যাটার্ন দেখবার পর থেকে খচ্ খচ্ করছে মন। কী যেন মেলে না। কিন্তু কী মিলছে না, জানে না। ইন্টারনেট থেকে নানা বিমানের ধ্বংসাবশেষের ছবি ডাউনলোড করেছে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে এয়ারবাসের তফাত খুঁজে পায়নি। অবশ্য কোনও ধ্বংসাবশেষ একই রকম হয় না। এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হয় অস্বাভাবিক। তবু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে।

আরবদের মতই গড় গড় করে আরবি বলে রানা। বেশ কয়েকবার এসেছে লিবিয়ায়। ওর ধারণা খুব সচেতন নয় লিবিয়ার জনতা, রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে ভীষণ দ্বিধা তাদের। দেশে স্বৈর-শাসক থাকলে যা হয়। তবে বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এখন একদল লোক চাইছে মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। তাদের সহায়তা দিয়ে চলেছে পশ্চিমা বিশ্ব।

শেষে হয়তো লাভ হবে শুধু শ্বেতাঙ্গদেরই।

এয়ারবাসের বিষয়টি জেঁকে বসেছে রানার মনে। বুঝতে পারছে এ মিশনে নিজ লোক ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা মস্ত ভুল হবে। ওই পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে নেবে ওরা ফ্লাইট ভয়েস রেকর্ডার, সংগ্রহ করবে লাশের ডিএনএ। ডিএনএ-র ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নেয়ার কারণ নেই প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন।

এয়ারবাস ধ্বংসাবশেষে কী যেন অস্বাভাবিক, কিন্তু তা ঠিক কী, ধরতে পারছে না রানা।

বারো

দেখা গেল, মার্ভেলকে যে বন্দরে ভিড়াবে, সেই হার্বার পাইলটই ওদের কণ্ট্যাক্ট। হাসিখুশি, মাঝারি উচ্চতার লোক সে। কোঁকড়া চুলগুলো এখানে-ওখানে ধূসর হচ্ছে। উঁচু কপাল, নীচে ঘন জোড়া ভুরু। ডান দিকেরটা খানিক কাটা পড়েছে। বোধহয় ছুরি বা বাসনের কানার আঘাতে। যখন চুপ থাকে, মাড়ির ফোকর বুজে রাখে জিভ দিয়ে। সামনে বেড়ে থাকে চিবুক। বোধহয় গত কিছুদিনের ভিতর ভেঙেছে দুই দাঁত। ঠোঁটের এক কোণে কালসিটে। মারধর খাওয়ার চিহ্ন।

রানাকে বলেছে, এ কাজ নিয়েছে শুধু বাড়তি টাকা পাওয়ার জন্য। তার পরিবারের সদস্য বারোজন। আট ছেলে-মেয়ে, বুড়ো বাবা-মা এবং তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু তাই নয়, তার এক শালা দুবাইয়ে কনস্ট্রাকশনের চাকরি খুইয়েছে, ফলে ওই পরিবারও এসে উঠেছে তার বাড়িতে। এদিকে বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। সব মিলে বিপদের ভিতর রয়েছে সে।

এসবই জানা গেল বোর্ডিং ল্যাডার বেয়ে উঠবার সময়। তাকে সুপারস্ট্রাকচারে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে এল রানা।

'কোনও সন্দেহ নেই আপনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ, জনাব হারিস,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। যা বলছে নিজে তার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, শহরে কোথাও উপ-পত্নী রাখতে গিয়ে চুরি-বাটপাড়ি করে লোকটা। আর সে কারণেই স্ত্রী

বা উপ-পত্নীর হাতে নিগৃহীত হয়ে তার দাঁত ভেঙেছে।

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল সারেং। প্রায় অন্ধকার কেবিনে জ্বলজ্বল করছে তার সিগারেটের ডগা। দিগন্তে হারিয়ে গেছে সূর্য, নেমে এসেছে আঁধার। বন্দর এলাকা থেকে বেশ দূরে থেমেছে মার্ভেল। লবণ ভরা পোর্টহোল দিয়ে শহরের মৃদু আলো আসছে। রং-জ্বলা ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে দিয়েছে রানা। নিজে মেকআপ করে সামান্য পাল্টে নিয়েছে চেহারা। কাঁধ ছেয়ে যাওয়া নকল চুলগুলো কালো। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। তুলার কারণে ফুলে আছে দুই গাল। চায় না হারিস ওকে ভাল করে চিনে রাখুক। অবশ্য ওর অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের লোক কখনও কারও দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে না।

'আমরা সবাই বাধ্য হয়ে কত কিছুই না করি,' বলল কণ্ট্যাক্ট হারিস। একটা অতি ব্যবহৃত লেদার ব্রিফকেস ডেস্কের উপর রেখে ঢাকনি খুলে ফেলল। 'আমাদের উভয়ের কমোন বন্ধু বলেছে একটা ট্রাক নামাতে হবে জাহাজ থেকে। সেই সঙ্গে লাগবে কয়েকজনের ভিসা। পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দিতে হবে।' কয়েকটা কাগজ বের করল সে। উপরেরটা কাস্টমসের স্ট্যাম্প। এই রুটিন ভাল করেই জানে রানা, পাসপোর্টগুলো বাড়িয়ে দিল। মোফিজ বিল্লাহ্‌র জাদুর দোকান থেকে এসেছে এগুলো। ছবি ছাড়া সব তথ্য মিথ্যা।

কয়েক মিনিট ধরে নাম ও তথ্যগুলোর রেকর্ড টুকল হারিস, তারপর প্রতিটি পাসপোর্টে বসিয়ে দিল স্ট্যাম্প। কাজ শেষে রানার হাতে দিল। এবার আরও কয়েকটা কাগজ বের করল। 'এগুলো দেবেন কাস্টম্‌স্ ইন্সপেক্টরকে। এসব ট্রাকের জন্য। আর এগুলো...' ব্রিফকেস থেকে দুটো লাইসেন্স প্লেট বের করে ডেস্কের উপর রাখল। 'এ দুটো রাখুন। কেউ প্রশ্ন তুলবে না, অনায়াসে যেতে পারবেন দেশের যে-কোনও জায়গায়।'

ভালই হলো, শহরতলী থেকে কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট চুরি করতে হবে না। রানা বলল, 'দেখছি, নিখুঁত কাজ করেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।'

চওড়া হাসল লিবিয়ান। 'সব ব্যবসা, বুঝলেন? কাস্টমারকে সেরা সেবা দিই আমি। সব সময়।'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আর ওই প্লেটের জন্য লাগছে আপনার মাত্র পাঁচ শ' ডলার।'

শালা ক্ষুধার্ত কুমিরের মত মস্ত হাঁ করেছে, মনে মনে বলল রানা।

'নম্বর কেমন মনে রাখেন?' জানতে চাইল হারিস।

'নম্বর?'

'হ্যাঁ, নম্বর। আমার মোবাইল ফোনের নম্বরটা দিতে চাই। কিন্তু ওটা আবার কাগজে টুকে রাখবেন না।'

'বলুন, মনে থাকবে।'

একের পর এক ডিজিট বলে গেল হারিস। 'এই নম্বরে যোগাযোগ করলে এক লোক ধরবে। সে খবর দেবে আমাকে। এক ঘণ্টার ভিতর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।' হাসি ফুটল তার মুখে। 'অবশ্য আমার বউয়ের সঙ্গে বিছানায় থাকলে... বুঝতেই তো পারছেন!'

বাধ্য হয়ে ওর হাসিতে যোগ দিল রানা। 'মনে করি না আপনার সার্ভিস আবার লাগবে, তবে ধন্যবাদ।'

মুখের হাসি হাসি ভাব বদলে গেল হারিসের, জোড়া ভুরুর নীচে সরু হয়ে গেল দুই চোখ। 'আমার ধারণা ক'জন লোক বা মেয়েলোক এ দেশের বড় কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কোনও সংবাদপত্রে অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখি, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠব। আর সেক্ষেত্রে দেরি না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার জানা আছে কী ভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা

যায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী বলতে চাই?'

এ সতর্কবাণী শুনে রাগল না রানা। এ শুনবার জন্য তৈরিই ছিল। প্রতিবছর কমপক্ষে এক ডজন লোক ওকে বলে এসব। তাদের কারও কারও ক্ষমতা নেই, তা-ও নয়। হয়তো হারিস তাদের একজন। দেখে প্যাঁচালো লোক মনে হয় না, কিন্তু হতে পারে অন্য রকম। এ যদি ওদেরকে বিপদে ফেলে, বদলে বিপদ হবে তার নিজেরই। ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে ওরা।

'নিশ্চয়ই তাদের প্রধানমন্ত্রী মারা যাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিচলিত,' মন্তব্য করল হারিস।

'হওয়ারই কথা,' বলল রানা। 'তবে আমার পাসপোর্টে নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমি ভারতীয় নাগরিক। পুবের ওই দেশের সরকার কী করছে তার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'ওরা নিশ্চয়ই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে চাইছে?'

'তা-ই তো মনে হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল রানা।

'আর আপনারা ঠিক কোথা থেকে এসেছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল হারিস।

'নেপ্‌ল্‌স্।'

'তার মানে ইতালি?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হারিস। এবার বলল, 'আপনি তো ভারতীয়। হয়তো আপনাদের সরকার চাইছে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে?'

রানা বুঝল লোকটা আসলে নিশ্চয়তা চাইছে ওরা ওই বিমান খুঁজতে এসেছে, এর চেয়ে খারাপ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। লোকটাকে খানিক স্বস্তি দিতে বলল, 'নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকার ওই বিমান খুঁজতে লিবিয়ার সরকারকে সহায়তা দিতে চাইবে।'

হাসি ফিরল সারেঙের মুখে। 'গতরাতে টেলিভিশনে বক্তৃতা

দিয়েছেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আলী। তিনি বলেছেন ওই হারিয়ে যাওয়া বিমানের ব্যাপারে কেউ কিছু জানলে, যেন দেরি না করে জানায়। ওটা পাওয়া গেলে কারও ক্ষতি নেই, কী বলেন?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল রানা। বিরক্ত বোধ করছে। লোকটা একের পর এক প্রশ্ন করছে। ডেস্কের ড্রয়ার টেনে খুলল রানা। ঝুঁকে এল হারিস। পেট-মোটা এনভেলপ বের করল রানা, থপ্ করে রাখল ডেস্কের উপর। বুক পকেট থেকে বের করল কয়েকটা নোট, পাঁচটা এক শ' ডলার বের করে এনভেলপের সঙ্গে যোগ করল। 'এই যে আপনার সম্মানী।'

খামটা খপ্ করে তুলে নিল হারিস, রেখে দিল ব্রিফকেসের ভিতর। ধপ্ করে বন্ধ হলো ঢাকনি। 'আমার যে বন্ধু আমাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আপনি খুব সম্মানিত, ভদ্র লোক। তাঁর কথা মেনে নিয়েছি বলেই আর গুণব না টাকাগুলো।'

এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না রানা। ওর ধারণা এ লোক মার্ভেলকে বার্থে রাখবার আগে কমপক্ষে দু'বার গুণবে ডলারগুলো। 'আপনি আগেই বলেছেন, ব্যবসা হচ্ছে কাস্টমারকে সন্তুষ্ট রাখা,' বলল রানা। 'সেই সঙ্গে নিজের সুনাম বজায় রাখা।'

'ঠিক কথা।' উঠে দাঁড়াল দু'জন, করমর্দন করল। 'এবার, ক্যাপ্টেন রানা, দয়া করে ব্রিজে চলুন। আর দেরি করাতে চাই না আপনাকে।'

'চলুন, যাওয়া যাক।'

রানা শুনেছে, সংগঠিত অপরাধ চক্রের শুরু প্রাচীন ফিনিশিয়ান বন্দরগুলোতে। ক'জন মজুর মিলে একটা মদের বোতল চুরি করে। কাজটা করতে গিয়ে কয়েক চুমুক গিলতে দেয় প্রহরীদেরকে। এবং দেখে ফেলে কেউ, সে লোকই মজুরদের

উৎসাহিত করে আরও জিনিস চুরি করতে। একটা চুরির জন্য লাগে তিনটি জরুরি জিনিস, চোর, অপরাধপ্রবণ প্রহরী এবং ওই এলাকার দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ। হাজারো বছর পেরিয়ে গেলেও সব একই রকম চলছে, তবে চুরির মাত্রা বেড়েছে কোটি গুণ। বন্দর এলাকা মানেই চোর-বাটপার ও ডাকাতের আস্তানা। কেউ সরকারী পদে আসীন ডাকাত, কেউ বেসরকারী ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

কণ্টেইনার আবিষ্কার হওয়ার পর কমে গেল চুরি-ডাকাতি। জিনিস থাকত তখন বাক্সের ভিতর। তারপর নানা ধরনের মাফিয়া ডন বুঝল, কী করতে হবে। তারা পুরো কণ্টেইনারই লোপাট করতে লাগল।

একটু দূরে ডক। এ মুহূর্তে উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পাশে প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদ, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। তবে ধোঁয়া দিয়ে ভাগাতে পারছে না ডকের বাঙ্কার অয়েল ও পচা মাছের দুর্গন্ধ। মার্ভেল যে বার্থে থেমেছে, তার পাশ দিয়ে গেছে মোবাইল ক্রেন। ক্রলার ট্রেডগুলো থেকে ঝুলছে কণ্টেইনার। ওটা তুলে নেয়া হয়েছে এক কোস্টাল ফ্রেইটার থেকে। ক্রেনে কোনও বাতি জ্বলছে না। বন্ধ রাখা হয়েছে গ্যাণ্ট্রি লণ্ঠনগুলো। ট্র্যাকটর ট্রেইলার অপেক্ষা করছে মাল বহন করতে। ওটার হেডলাইট নেভানো। কণ্টেইনারের পাশে দাঁড়িয়েছে এক কর্মী, হাতে একটু পর পর জ্বলছে টর্চ। সেই আচমকা আলো-আঁধারিতে খানিক দেখা যায়। মিস্টার হারিস মার্ভেলকে এখানে রেখেই ছুটে গেছে আনলোডিং দেখতে। ডকে তাকে দেখছে রানা। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী যেন বলছে সে। এত আলো নেই যে খাম বদলের দৃশ্য চোখে পড়বে। অবশ্য মার্ভেলের লো লাইট ক্যামেরা সবই ধরছে।

'আমাদের কণ্ট্যাক্ট ভাল মক্কেলই ধরেছে,' বলল সোহেল।

'খুব ব্যস্ত লোক এই হারিস!'

'ক্যাসাব্লাঙ্কায় ক্লড রেইন্স বলে, "আমি শুধু বেচারা এক দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ।"'

ওয়াকি-টকিতে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'হ্যাচের ঢাকনি খুলে নেয়া হয়েছে। আমরা তৈরি।'

'ঠিক আছে। হারিস জানিয়েছে আমরা চাইলে মার্ভেলের ক্রেন দিয়ে ট্রাক আনলোড করতে পারি। সবাই কাজে নেমে পড়ুক।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

রহস্যময় জাহাজের উল্টো ডকে থেমেছে মার্ভেল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে। দূরে বিশাল এক কন্টেইনার শিপ থেকে মাল নামিয়ে চলেছে উঁচু ক্রেনগুলো। সোডিয়াম-ভেপার আলোয় দিন হয়ে গেছে ওদিক। সিকিউরিটি ফেন্সের ওপাশে আলোর বাইরে অন্ধকারে শত শত কন্টেইনার। ওখানে রয়েছে একের পর এক ওয়্যারহাউস ও বিশাল উঁচু অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।

দিগন্তের দিকে বাহু বাড়িয়ে কাজ শুরু করেছে মার্ভেলের ডেক ক্রেন। ড্রাম থেকে বেরুচ্ছে স্টিলের কেবল। খোলা এক হ্যাচের উপর গেল ক্রেনের বাহু। স্টিলের তার নেমে গেল হোল্ডের ভিতর। দু' মিনিট পর ট্যাকলের মাধ্যমে উঠে আসতে লাগল মাল। সহজেই ওজন নিল বুম।

আঁধারে বিস্তারিত কিছু দেখা গেল না। তবে বোঝা গেল উঠে আসছে ডক্টর শামশের আলীর গর্বের সেই বস্তু। যে-কেউ দেখে বলবে ওটা অতি সাধারণ এক মাল-টানা ট্রাক। এক পাশে নকল অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির নাম। ট্রাকের বাইরের অংশ যেমন তেমন, কিন্তু চেসিসটা মার্সিডিজ ইউনিমগ। ওটাই একমাত্র জিনিস যা মডিফায়েড নয়। নানা দিক দিয়ে বদলে নেয়া হয়েছে টার্বোডিজেল ইঞ্জিন, ঠিক ভাবে টিউন্‌ড্‌ থাকলে শক্তি মেলে আট শ' হর্সপাওয়ার। আর নাইট্রিয়াস অক্সাইড বুস্ট দেয়া হলে ইঞ্জিন

দেবে এক হাজার হর্সপাওয়ার। পুরু সেলফ সিলিং টায়ারগুলোর উপর আর্টিকিউলেটিং সাসপেনশন। প্রয়োজন পড়লে উঁচু-নিচু করবে ট্রাককে। উঁচু করলে তখন দুই ফুট নীচে থাকবে মাটি। অর্থাৎ আমেরিকান আর্মির দোতলা হামভির চেয়ে ছ' ইঞ্চি উঁচু। চারজন আরোহী অনায়াসে বসতে পারে ক্যাবে। পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে রাইফেলের গুলিতে কিছুই হয় না সামনের চাকার। বাক্সের মত ক্যাব একই ভাবে আর্মার্ড।

প্রথম যখন বিসিআইয়ের সবাই জানল ডক্টর শামশের আলী কী পরিকল্পনা করেছেন, মেজর জেনারেল, রানা ও সোহেল ছাড়া অন্যরা পেট কাঁপিয়ে হেসেছে। পাগলা বৈজ্ঞানিকের নাম দিয়েছে "কিউ", জেমস বণ্ড বই বা সিনেমার সেই বিখ্যাত আর্মারার। ট্রাকের সামনের বাম্পারে রয়েছে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। যন্ত্র-দানবের দু'পাশে র‍্যাকের ভিতর রয়েছে গাইডেড রকেট। রয়েছে জেনারেটার, এতই ঘন ধোঁয়া তৈরি করে, চারপাশ আঁধার করে দেয়। ছাতে রয়েছে একটা হ্যাচ, ওখান দিয়ে ছোঁড়া যায় একের পর এক মর্টার। ওটার বদলে রাখা যায় .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান বা অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার। মিশন বুঝে কার্গো এরিয়া বদলে নেয়া যায়। ওটা হয়ে উঠতে পারে মোবাইল সার্জিকাল সুইট, হতে পারে লুকানো রেইডার স্টেশন। সেসব যদি না লাগে, পিছন অংশ ব্যবহার করা যায় ট্রুপ ক্যারিয়ার হিসাবে। সেখানে বসতে পারে পুরোপুরি সশস্ত্র দশজন সৈনিক।

ট্রাকের চাকা স্বাভাবিকের চেয়ে খানিক বড়, এটুকুই তফাত, এ ছাড়া কেউ সন্দেহ করবে না এই জিনিস ব্যতিক্রম কিছু। ডক্টর শামশের আলী ট্রাকের নাম দিয়েছেন 'সুন্দরী'। মার্ভেলের মতই শক্তপোক্ত, তফাৎ শুধু সুন্দরী মাটিতে চলে। কোনও ইন্সপেক্টর পিছনের দরজা খুললে দেখবে ঠাসা ছয়টি পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রাম। লোকটা যদি সন্দেহের বশে পিছনের সারি ড্রাম সরায়, সেক্ষেত্রে

বেরুবে দ্বিতীয় সারি ড্রা...। পিছনেরগুলো সত্যিই বাড়তি ফিউয়েল। ওগুলোর কারণে সুন্দরী আট শ' মাইল চলতে পারে। দ্বিতীয় সারির ড্রামগুলো আড়াল দিয়েছে ট্রাকের ভিতর অংশকে। আশা করা হয়েছে কেউ এই সারির ড্রাম সরাবে না।

'দেখা যাক পাগলা প্রফেসরের প্রেমিকা কেমন কাজের,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'আমার পুরো বিশ্বাস আছে তাঁর উপর,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'তোরা মার্ভেলকে কখন সরিয়ে নিবি?'

'তোরা ত্রিপোলি থেকে সরে গেলেই। গগলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বন্দর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে যাব। বিমান যেখানে ক্র্যাশ করেছে, ঠিক তার উত্তরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বসে থাকব। দশ মিনিটের নোটিসে আকাশে উঠবে হেলিকপ্টার।'

'তোরা যেখানে থাকবি, তাতে হেলিকপ্টারের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। তবুও ভাল। হাতের পাঁচ থাকল। সব যদি পরিকল্পনা মত চলে, তোরা সাগরে থেকে আমাদের অনুসরণ করবি। এদিকে আমরা ঢুকে পড়ব তিউনিশিয়ার জমিতে।'

'আশা করা যায় তোর "সি প্ল্যান" প্রয়োজন পড়বে না।'

হুইলহাউসের স্পিকারে স্ট্যাটিকের আওয়াজ শুরু হলো। ঘরে ঢুকে মাইক্রোফোন নিল রানা, 'রানা বলছি।'

'সুন্দরীকে ডকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'রায়হান ভাইয়ের কাছে জানলাম লিবিয়ানদের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম কাজ করছে ক্র্যাশ এলাকা থেকে তিন শ' মাইল দূরে।'

'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট পর গ্যাংওয়ের উপর দেখা হবে,' বন্ধুর পাশে এসে ফ্লাইং ব্রিজে থামল রানা।

ফুরিয়ে আসা সিগারেট টোকা দিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিল সোহেল। একটু দূরে গিয়ে সাগরে পড়ল আগুন। সঙ্গে সঙ্গে নিভে

গেল। 'আমার ভাল লাগছে না, রানা। তোদের মিশন আছে। কিন্তু আমি? জাহাজের পাহারাদারের মত শুধু বসে থাকব।'

'জাহাজের পুরো দায়িত্ব তোর হাতে,' বলল রানা। 'আর কখন তোকে লাগবে কেউ জানে না।'

'কয়েক মাস পেরুল কোনও অ্যাকশনে নেই। এতে মন ছোট হয়।'

'বুঝি। প্রথম সুযোগেই উড়াল দিবি তুই।'

'যদি কোনও মিশন পাই।'

'হয়তো পাবি,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'আপাতত চললাম রে। দুই থেকে তিন দিন পর দেখা হবে।'

'চল, তোকে পৌঁছে দিই ডক পর্যন্ত।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুই অকৃত্রিম বন্ধু।

সুন্দরীকে নিয়ে চলেছে রানা, পাশে শটগান হাতে খোরশেদ নবী। পিছনের বেঞ্চ সিটে পাশাপাশি লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা ও ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। প্রত্যেকের পরনে খাকি জাম্পসুট। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যে অয়েল ওঅর্কারদের ইউনিফর্ম বলতে, এ-ই। চুলগুলো বেসবল ক্যাপের নীচে গুঁজে রেখেছে স্বর্ণা। একই কাজ করেছে নিশাত। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে ওভারসিজ কাজের জন্য এসেছে দুই তরুণ, এখনও গোঁফ-দাড়ি গজায়নি।

ভোরের ধূসর আলো ফুটতে বেশ দেরি। ওরা পিছনে রেখে এসেছে ত্রিপোলি শহরের ঝলমলে আলো। উপকূলবর্তী সড়কে ট্রাফিক নেই বললেই চলে। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে কোনও রোডব্লকের সামনে পড়েনি। সাইরেন বাজিয়ে গেছে এক পুলিশ ক্রুজার। মাথার উপর জ্বলছিল আলো। তবে ট্রাক থামায়নি, দ্রুত গতিতে চলে গেছে। তারপর থেকে কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি।

নকল কাগজপত্রের বিষয়ে পুরো নিশ্চিন্ত রানা। এখন যতক্ষণ পারা যায় এগুতে চাইছে। নিয়ম মাফিক তল্লাসী নিয়ে ভয় নেই, যত চিন্তা দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিশ নিয়ে। এরা রোডব্লক তৈরি করে ঘুষ দাবি করে। কখনও থানায় ধরে নিয়ে যেতে চায় ঝগড়াটে পুলিশ। সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে। পরিস্থিতি প্যাঁচালো হতে পারে, কাজেই পকেটে লিবিয়ান দিনার রেখেছে রানা।

আরও দুই মাইল গেলে ডানে মরুভূমিতে যাওয়ার সরু পথ। সুন্দরীর ইণ্টিগ্রেটেড ন্যাভিগেশন সিস্টেম ওদের নিয়ে যাবে ভূ-পাতিত বিমানের কাছে।

নীরবে পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

দূরে রোডব্লক দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেখানে ওরা হাইওয়ে ছেড়ে মরুভূমিতে প্রবেশ করবে, তার মাত্র দুই শ' ফুট এদিকে রোডব্লক! চেক করা হচ্ছে একটা সিভিলিয়ান গাড়ি। পাশের লেন ব্লক করা হয়েছে দুটো ক্রুজার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। বোঝা যাচ্ছে, রানাদের নয়, থামাতে চাইছে মরুভূমির দিক থেকে আসা গাড়ি। কিন্তু তাই বলে সতর্কতায় ঢিল পড়ল না রানার। এটা পুলিশের ধোঁকা দেবার একটা কৌশলও হতে পারে।

ব্রেক কষে গতি কমাতে শুরু করেছে রানা।

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

রিফ্লেকটিভ ভেস্ট পরনে এক পুলিশ ঝুঁকে পড়েছে সেডানের জানালায়। ভিতরে ফেলছে ফ্ল্যাশলাইট। একটা ক্রুজারের ভিতর আরও দু'জন পুলিশকে দেখল রানা। ওর ধারণা হলো, চতুর্থ আরেকজন আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছে।

গতি আরও কমিয়ে এনেছে রানা। জানতে চাইল, 'নবী, রোডব্লক এড়িয়ে আর কোনও রাস্তায় মরুভূমিতে ঢোকা সম্ভব?'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'না, মাসুদ ভাই। স্যাটালাইটের ইমেজ থেকে রুট ঠিক করেছে রায়হান। রোডব্লক পেরুলে খানিক বাদেই সরু পথ। ওই পথেই যেতে হবে, নইলে শুরু হবে খাড়া টিলা। তবে কিছুদূর পিছিয়ে গেলে পাব আরেকটা কাঁচা ট্রেইল, ওটা পৌঁছে দেবে টিলার উপর। ওখান দিয়ে মরুভূমিতে নামা যেতে পারে।'

'এখন আর পিছানো সম্ভব নয়। তার মানে আমাদের সামনেই এগুতে হবে।'

'আসলে তা-ই।'

রোডব্লকের বিশ ফুট দূরে রাস্তার বাম ঘেঁষে থামল ট্রাক। সিভিলিয়ান গাড়িটা ছাড়া পেলে ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সহজেই যেতে পারবে।

সিটের পাশের পকেটে হাত রাখল রানা, একবার স্পর্শ করে নিল প্রিয় ওয়ালথার পি.পি.কে-টা। প্রয়োজন পড়লে বের করবে। রোডব্লকের দিকে চাইল, সেল্ফ্-ড্রিভেন ওই গাড়িতে রয়েছে মালিকের গোটা পরিবার। স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে মহিলা। টর্চের আলোয় দেখা গেল চাঁদের মত গোল মুখ। মহিলা কাঁধের উপর দুলিয়ে চলেছে এক শিশুকে। ভেসে এল বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। ব্যাক সিটে তার ভাই, বছর চারেকের। চালক বা পুলিশের বক্তব্য বুঝল না রানা। তবে মনে হলো উত্তপ্ত কথা চলছে। গলা উঁচিয়ে কী যেন বলছে ছেলের বাবা।

'কী অপরাধে আটকালো?' আপন মনে বলল স্বর্ণা।

রানা জবাব দেয়ার আগেই, জানালা থেকে এক পা পিছিয়ে গেল পুলিশ, ঝটকা দিয়ে বের করল পিস্তল। তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, কাঁদছে ব্যাকসিটের বাচ্চাটাও। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার উপর দু'হাত তুলেছে মহিলার স্বামী।

পুলিশ ক্রুজারের দুই দরজা খুলে গেল, ছিটকে বেরিয়ে এল

গাড়িতে বসা দুজন। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। একজন চলল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা লক্ষ্য করে। আর তার সঙ্গী অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটে এল রানাদের দিকে। পিস্তল তাক করেছে ক্যাবের উইণ্ডশিল্ড বরাবর।

সবই বুঝল রানা, তবে দেরি করে। আসল টার্গেট ওরাই, এতক্ষণ অভিনয় চলছিল। প্রচণ্ড রেগে গেল ও নিজের উপর।

সুইচ টিপে গ্লাভস কম্পার্টমেণ্ট খুলে ফেলেছে ক্যাপ্টেন নবী, স্বয়ংক্রিয় ভাবে বেরিয়ে এসেছে ট্রে। উপরে ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে, কি-বোর্ড ও খুদে জয়স্টিক। আঁধারে কি-বোর্ড টিপতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল নবী, অথচ এখনই চালু করতে হবে মেশিনগান।

সামনের সিভিলিয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে গুলি করল পাশে দাঁড়ানো পুলিশটা। লাল কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেল চালকের মাথা, আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে। উইণ্ডশিল্ডে ছিটকে লাগল চটচটে রক্ত ও হলদেটে মগজ। ভিতরের দৃশ্য হারিয়ে গেল রানার চোখ থেকে। আরও দু'বার গুলি করল লোকটা। মহিলা ও শিশুর কান্না থামল মাঝপথে। চতুর্থবার গুলি হলো। রানা নিশ্চিত, মেরে ফেলেছে পিছন সিটে দাঁড়ানো ছেলেটিকেও!

ঘুষ না দেয়ার অপরাধে? আশ্চর্য!

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেছে রানার, যন্ত্রের মত চলছে হাত-পা, গিয়ার দিয়েই চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। দ্রুত গতি তুলবার ক্ষমতা নেই সুন্দরীর, তবে ক্রুদ্ধ সিংহীর মত গর্জে উঠে হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল। ওদের দিকে ছুটে আসছিল ক্রুজারের দ্বিতীয় জন, হঠাৎ থমকে গেল মাঝপথে, ট্রাকের মতলব ভাল না বুঝে পিস্তল তুলে গুলি শুরু করল। প্রথম দুটো বুলেট লাগল সেফটি গ্লাসে, তৈরি হলো খুদে গর্ত। পরেরগুলো ছিটকে গেল ট্রাকের আর্মার্ড প্লেটে লেগে।

'পেয়েছি!' বলল নবী।

চট্ করে ওদিকে চাইল রানা। ভিডিও স্ক্রিনে দেখা গেল ক্যামেরা, গোপন মেশিনগানের নীচে। এইমিং রেফারেন্স দেবে নবীকে। নীচে নেমে গেল মেশিনগান, বাম্পারের তলা থেকে বেরুল ব্যারেল।

'জলদি, নবী!' তাড়া দিল রানা।

কি-বোর্ডে টোকা দিল ক্যাপ্টেন। বিশ্রী খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ শুরু হলো, মৃদু কাঁপতে লাগল পুরো ট্রাক। ক্যাবের নীচ থেকে বেরুল কমলা আগুনের শিখা। সামনে রাস্তার পিচ বিস্ফোরিত হলো। ঘুরেই বামদিকে ছুটতে চাইল লোকটা, তবে বেশি তাড়াহুড়ো করেছে। বাম গোড়ালির ভিতর ঢুকল দুটো গুলি। অন্যগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিল গোটা দেহ। মেশিনগান থেকে প্রতি মিনিটে বেরোয় চার শ' গুলি। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অ্যাসফল্টের উপর চিত হয়ে পড়ল লোকটা। যেন হামলা করেছে সিংহ, খাবলে নিয়ে গেছে বুকের মাংস।

যে লোকটা এইমাত্র ওই পরিবারটাকে খুন করেছে, মূর্তির মত জায়গায় জমে গেল সে। ট্রিগার থেকে আঙুল তুলেছে নবী, ব্যারেল তাক করেছে সিভিলিয়ান গাড়ির বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটার দিকে। অজস্র বুলেট বিঁধল তার গায়ে, শরীর ভেদ করে বিস্ফোরিত করল উইণ্ডশিল্ড ও পাশের জানালা। স্টিলের বডিতে ঠকাঠক লাগল বুলেট। দুই চাকা ফেটে যেতেই নিচু হয়ে বসে গেল গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড মন্ত্রমুগ্ধের মত আধ খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল খুনি লোকটা। টের পেল, এখন এখানে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ধপ করে পড়ল সে রাস্তার উপর, খানিক দূরেই তার ক্রুজার, হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল গাড়ির সামনের চাকার আড়ালে। এবার বৃষ্টির মত ক্রুজারের দিকে আসতে শুরু করল বুলেট।

আপাতত আশ্রয় ছাড়বে না লোকটা।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্রুজারের দিকে চলল রানা। খুনি প্রায় উঠে পড়েছে সামনের সিটে, কিন্তু তার উপর পড়ল সুন্দরীর শক্তিশালী হ্যালোজেন বাতি। দিন হয়ে গেল গাড়ির ভিতরের অংশ। টার্গেট পেয়েও হারাল নবী। পিস্তল উঁচু করে দ্রুত ট্রিগার টিপছে খুনি। কিন্তু ট্রাকের পুরু আর্মারে একটা বুলেটও বিঁধল না।

শীতল রাগ ছাড়া কিছু নেই রানার মনে। সোজাসুজি চলল গাড়িটার দিকে। 'শক্ত হয়ে বসো সবাই,' চাপা স্বরে বলল।

দু' সেকেণ্ড পেল রায়হান-স্বর্ণা-নিশাত, তারপর ক্রুজারের উপর চড়াও হলো ট্রাক। শুরু হলো ভয়ঙ্কর ধাতব মুড়মুড়ে আওয়াজ। ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল ক্রুজারের দরজা। চ্যাপ্টা করে দিল লোকটাকে। তার বাম পা ও কব্জি কাটা পড়েছে ডোর ফ্রেমে। একটা গুলি ঢুকল কপালে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হেঁচড়ে চলল ক্রুজার, চাকাগুলো পিচের উপর হোঁচট খেল। তারপর কাত হয়েই চিত হয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'প্রথম ক্রুজার, মাসুদ ভাই!' পিছন থেকে বলল স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে ঢুকে পড়েছে ক্রুজারের ভিতর, বোধহয় পুলিশ স্টেশনে রেডিও করতে চাইছে। ট্রাক ঘুরিয়ে মেশিনগান তাক করার সময় নেই। সিটের পাশের পকেট থেকে ওয়ালথার বের করে পিছনে স্বর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা ডানহাতে নিল লেফটেন্যান্ট, বাম হাতে নামাচ্ছে বুলেট প্রুফ জানালার কাঁচ। সেফটি ক্যাচ নামানো হতেই জানালা দিয়ে বের করল ওয়ালথার। ফিল্ড অভ ফায়ার দেয়ার জন্য উবু হয়ে গেল নিশাত সুলতানা।

তবে সঠিক অ্যাংগেল পেল না স্বর্ণা, গানম্যানকে পাওয়ার জন্য জানালা দিয়ে কোমর পর্যন্ত বের করে দিল। বামহাতে শক্ত

করে ধরেছে বড়সড় সাইড মিরর। পরক্ষণে গুলি করল। এত দ্রুত ট্রিগার টিপছে, যেন একের পর এক পটকা ফুটছে।

স্বর্ণাকে সাবধান করতে চাইল রানা, এই চেক পয়েন্টে আরও কেউ থাকতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার আগেই দেখা গেল একটা বালির ঢিবি থেকে ছুটে আসছে পঞ্চম লোকটা দু' হাতে ধরেছে মেশিন পিস্তল। তবে দূরত্বের কারণে লক্ষ্যভেদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো সে। ওই অস্ত্র প্রতি মিনিটে পাঁচ শ' রাউণ্ড বর্ষণ করে, ঠিক চার সেকেণ্ড লাগল ম্যাগাজিন খালি হতে। ট্রাকের উইণ্ডশিল্ড ও আর্মারে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। কাঁচের উপর তৈরি হয়েছে কয়েকটা খুদে নক্ষত্র। স্বর্ণার উপর দিয়ে ভিতরে ঢুকল একটা রাউণ্ড, এখানে-ওখানে ঠোকর খেয়ে থামল ওর মাথার ঠিক পাশে, ট্রাকের জানালার ফ্রেমে। ইস্পাতের চল্টা উঠল ওখান থেকে, লাগল নিশাতের ঘাড়ে। ওই শ্র্যাপনেল একটু এদিক-ওদিক গেলে কাটা পড়ত জাগিউলার ভেইন।

বামহাতে ঘাড় চেপে ধরল নিশাত, ডানহাতে শক্ত করে ধরেছে স্বর্ণার গোড়ালি পড়তে দেবে না। বনবন করে হুইল ঘোরাল রানা, মেশিন পিস্তলওয়ালার এপাশে রাখতে চাইছে ট্রাকের বাম পাশ। ফলে রাস্তার উপর পড়ার উপক্রম করল স্বর্ণা। ওকে দ্রুত টেনে নিল নিশাত।

'আপনার গুলি লেগেছে, আপা!' সোজা হয়ে বসেই জানতে চাইল স্বর্ণা। এইমাত্র দেখেছে রক্তে ভেজা নিশাতের হাত। 'কোথায় লাগল?'

'ঘাড়ে। আলু ছিলতে গিয়ে হাত কাটলেও এর চেয়ে বেশি রক্ত বের হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল নিশাত। তবে স্বর্ণা সিটের নীচ থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করছে দেখে আপত্তি তুলল না।

রানা ঘুরিয়ে নিয়েছে ট্রাক, সুযোগ করে দিল মেশিনগান ব্যবহার করবার। কয়েক সেকেণ্ড বাড়তি এনে দিয়েছে স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা লুকিয়ে পড়েছে ক্রুজারের আড়ালে, দুই হাতে খুঁজছে রেডিওর মাইক।

সুযোগ পেয়ে মেশিনগান চালু করল নবী। ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্টের দিকে খেয়াল নেই। ওদিকটা দুর্গের মত। তার বদলে বেছে নিয়েছে ক্রুজারের পিছন অংশ। অজস্র বুলেট বিঁধল ট্যাঙ্কে, সঙ্গে সঙ্গে ছলকে বেরিয়ে এল গ্যাসোলিন। মেশিনগানের প্রতিটি সপ্তম রাউণ্ড ম্যাগনিযিয়াম-টিপড ট্রেসার, এক সেকেণ্ড লাগল অকটেনের পুকুরে আগুন ধরতে। ক্রুজারের নীচে তৈরি হলো আগুনের বিশাল কুণ্ডুলি। হুউশ্ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। ক্রুজারের পিছন অংশ অ্যাসফল্ট থেকে উপরে উঠল।

অবস্থা বেগতিক দেখে রেডিওর পিছনে সময় নষ্ট না করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে খুনি লোকটা, মরুভূমির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে।

অকটেন ও বাতাসের কারণে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। দশ ফুট উপরে উঠল ক্রুজার, পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল বড়সড় উল্কার মত। রাস্তার পাশে বালির উপর পড়ল ওটা, পলায়নরত পুলিশের এক ফুট দূরে। আগুন ও ধুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুলো সরে যেতে দেখা গেল, মশালের মত জ্বলছে তার পোশাক। ধপ করে বালির উপর পড়ল সে, নিভাতে চাইছে আগুন। কিন্তু সারা শরীর অকটেনে ভেজা, নিভবে কেন। আগুনের ভিতর ছটফট করতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মত।

দয়া করল নবী, এক সেকেণ্ডের জন্য ট্রিগার টিপল।

'পঞ্চম লোকটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মনে হলো মরুভূমির দিকে ছুটছে,' বলল নিশাত। ওর ঘাড়ে গজ প্যাড আটকে দিয়েছে স্বর্ণা, পরিষ্কার করছে হাত।

মনে মনে কপালের দোষ দিল রানা। এখন হোক বা একটু

পর কোনও না কোনও গাড়ি আসবে, কাজেই সাক্ষী রাখা চলবে না। হুইল ঘুরিয়ে সড়ক থেকে মরুভূমিতে নামল রানা। কঠিন সাসপেনশন সহজেই বালির উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড ট্রাককে। দেখতে না দেখতে গতি উঠল চল্লিশ মাইলে। হ্যালোজেন বাতির কারণে পরিষ্কার চোখে পড়ল লোকটার পদচিহ্ন। প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

লোকটাকে খুঁজে বের করতে মাত্র এক মিনিট লাগল, ভীত খরগোশের মত ছুটছে সে। পিছন থেকে তেড়ে আসছে বিশাল ট্রাক, তারপরও আত্মসমর্পণ করছে না। দৌড়ে চলেছে। তার ঠিক পিছনে পৌঁছে গেল রানা। পিঠের কাছে ইঞ্জিনের গরম অনুভব করে ঘাড় কাত করে চাইল, তারপর নতুন উদ্যমে ছুটতে লাগল।

'একে নিয়ে কী করব আমরা?' জানতে চাইল নবী। চিন্তিত।

কোনও জবাব দিল না রানা। মানুষের নানা ধরনের মৃত্যু দেখেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করতে চায় না। প্রার্থনা করছে, লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি শুরু করুক।

কিন্তু তা করবে না সে। হাত থেকে পড়ে গেছে অস্ত্র।

অন্য উপায় বের করতে হবে। পিছু নিয়ে চলেছে সুন্দরী। তিন ফুট সামনে লোকটা।

ঘাড়ের কাছে প্রকাণ্ড ট্রাক ভীত করে তুলেছে তাকে, হঠাৎ করেই ডজ দিয়ে অন্য দিকে সরতে চাইল—কিন্তু নরম বালিতে সড়াৎ করে পিছলে গেল বাম পা। ব্রেক কষল রানা, একই সঙ্গে বনবন করে ঘোরাল হুইল। চাইছে না ট্রাক লোকটার উপর উঠুক। দু' সেকেণ্ড পর থামল যন্ত্রদানব। তার আগেই বিশ্রী ঝাঁকি লাগায় টের পেল ওরা কী ঘটেছে।

সাসপেনশনের দুলুনি থামবার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। এক পলক দেখল দেহটা। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। আবারও উঠল ক্যাবে, গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মনে পড়ল লোকটা

ট্রাকের দিকে গুলি করছিল। জানালা থেকে ঝুলছিল স্বর্ণা। ঘাড়ের উপর ক্ষত তৈরি হয়েছে নিশাতের। কিন্তু এসব ভেবে মন থেকে দূর করতে পারল না লোকটার এই পরিণতি। আবার সড়কে এসে উঠল সুন্দরী, সিভিলিয়ান গাড়ির সামনে গিয়ে থামল। এখনও জ্বলছে একটা পুলিশ ক্রুজার।

স্বর্ণার কাছ থেকে ওয়ালথার নিল রানা, নতুন ম্যাগাজিন ভরে টেনে নিল স্লাইড। অস্ত্র হাতে ক্যাব থেকে নামল, চার দিকে নজর রেখেছে। চলে গেল প্রথম ক্রুজারের পাশে। ওটার ভিতর থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল রেডিওর মাইক্রোফোন, ছুঁড়ে মারল মরুভূমির দিকে। এখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না কেউ। দ্বিতীয় ক্রুজারের ভিতরের মাইক্রোফোন প্লাস্টিকের কাদা হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ফ্যামিলি সেডানের পাশে থামল রানা, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরে চাইল। গাড়ির ভিতর রক্তের আঁশটে গন্ধ। স্বামী-স্ত্রী ও দুই বাচ্চা, চারজনই মারা গেছে। একমাত্র সান্ত্বনা: এদের আঘাত ছিল গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

এসব অহেতুক মৃত্যু সবসময় ছোট করে দেয় মনটা। পরিবার কর্তার কোলে সরু ওয়ালেট দেখল রানা, ওটা তুলে নিল। ড্রাইভারের নাম আলী আহাম্মেদ। ত্রিপোলিতে থাকত। আইডি কার্ড অনুযায়ী সে হাই-স্কুলের শিক্ষক। মানিব্যাগে মাত্র কয়েকটা দিনার।

হঠাৎ রানার মনে হলো পাঁচ দুর্নীতিবাজ পুলিশ মারা যাওয়ায় কারও ক্ষতি হয়নি।

এই তরুণ পরিবার মরল, কারণ তারা গরীব ছিল, যথেষ্ট ঘুষ দিতে পারেনি।

তেরো

লিবিয়ার এদিক মরুভূমিময় রুক্ষ প্রান্তর ও উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকা। চারপাশে বড়বড় বোল্ডার। একটানা সাত ঘণ্টা চলছে সুন্দরী। অনেক আগেই দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশাত। এর ভিতর রানাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে স্বর্ণা ও নবী, ট্রাক চালাবে ওরা; কিন্তু রাজি হয়নি রানা। ওর মনে জেঁকে বসেছে নানা ভাবনা।

পাহাড়ি মরুভূমির ভিতর দারুণ রুট বাছাই করেছে রায়হান। কোনও সমস্যা না করে চলছে ডক্টর শামশের আলীর প্রিয়তমা। খাড়াই জমি বেয়ে উঠতে সামান্যতম আপত্তি তুলছে না ইঞ্জিন। চূড়া থেকে নেমে যাওয়ার সময় ঠিক ব্রেক কষছে। ডক্টর পিছন চাকাগুলোর পর বসিয়েছেন এক সারি চেইন। ওগুলো জমিতে আঁচড় বুলিয়ে চলেছে। চাকার চিহ্ন থাকছে না।

কারও বুঝবার কথা নয় ওরা চেক পয়েন্ট থেকে এদিকে এসেছে। তারপরও তাড়া অনুভব করছে রানা। হাইওয়েতে কী ঘটেছে বুঝবে লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ। ওই পুলিশ অফিসাররা ঘুষখোর হোক বা না হোক, তাদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে চাইবে তারা।

মার্ভেল থেকে নিয়মিত আপডেট পাঠিয়ে চলেছে সোহেল। আমেরিকান নেভি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তীর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এক স্কোয়াড্রন ই-২সি হওকি বিমান চক্কোর মারছে, নজর

রাখছে লিবিয়ান সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিমগুলোর উপর।

একটু আগে ভোর হয়েছে। তার মানে লিবিয়ান *সার* টিমগুলোর এয়ারক্রাফট আকাশে উঠে পড়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এদিকে আসেনি। সমস্ত মনোযোগ ক্র্যাশ সাইট থেকে এক শ' মাইল দূরে।

'জিপিএস অনুযায়ী আর মাত্র দুই ক্লিক বাকি ক্র্যাশ সাইটে পৌঁছুতে,' বলল নবী। 'ট্রাক লুকাবার জন্য ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রায়হান।'

চারপাশ দেখে নিল রানা। ওরা আছে পাহাড়ের উপর এক উপত্যকায়, সাগর সমতল থেকে চার হাজার ফুট উপরে। কোনও গাছ জন্মেনি। ন্যাড়া পাথুরে জমিন। মাঝে মাঝে ঘাসের চাপড়া।

'বামে চলুন, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আর পাঁচ শ' গজ যেতে হবে।'

ওর দেখানো পথে চলল সুন্দরী, সামনে উঁচু জমি। তবে ঢাল বেয়ে উঠতে হলো না, চোখে পড়ল সরু পাথুরে ফাটল। আগেই স্যাটালাইট ইমেজে দেখেছে রায়হান। ফাটলটা যথেষ্ট গভীর ও চওড়া, অনায়াসে রাখা যাবে ট্রাক। আকাশ থেকে সরাসরি না তাকালে আশপাশ থেকে কেউ বুঝবে না।

'ভাল জায়গা,' বলল রানা। ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক, খানিকদূর গিয়ে থামল। সুন্দরীর ট্যাঙ্কে এখনও দুই তৃতীয়াংশ ফিউয়েল রয়েছে। ডক্টর শামশের আলী যতটা ভেবেছেন, তার চেয়ে ঢের ভাল করছে তাঁর প্রেমিকা।

ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যেতেই চারপাশ থমথম করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল ওরা নিথর নীরবতায়।

'আমরা পৌঁচেছি?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিশাত।

'প্রায়,' বলল স্বর্ণা। 'এবার উঠুন, আপা।'

হাই তুলে সোজা হয়ে বসল নিশাত, হাত বাড়িয়ে টিপে দিল

গোপন এক সুইচ। কিরকির আওয়াজ তুলে সরে গেল পিছনের দেয়াল, বেরিয়ে এল কার্গো হোল্ড। এ মিশনের জন্য যথেষ্ট কম গিয়ার এনেছে ওরা। সাবমেশিন গান ও গ্রেনেড লঞ্চার ছাড়া রয়েছে চারটে ন্যাপস্যাক। তার ভিতর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট। ব্যাগগুলো বিলি শুরু করল নিশাত। নিজেরটা নিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা, টের পেল শিরশির করছে মেরুদণ্ড।

খাতের ভিতর অংশে গাঢ় ছায়া, কিন্তু বাতাস গরম ও শুকনো। নাকে এল ধুলোর গন্ধ। আন্দাজ করা কঠিন এ অঞ্চলে বাস করে মানুষ। কিন্তু হাজারো বছর ধরে সাহারা মরুভূমিতে টিকে রয়েছে তারা। এ থেকে বোঝা যায় সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয় মানুষ।

কয়েক মুহূর্ত পর রানার পাশে থামল সবাই। হাতের জিপিএস ডিভাইস পরীক্ষা করল নবী, তারপর উত্তর দিক দেখিয়ে দিল।

ট্রাকে প্রায় কোনও কথাই হয়নি ওদের। এখনও আলাপ করবার ইচ্ছে রইল না কারও। রানার পিছনে রওনা হয়ে গেল ওরা, উঠতে লাগল নামহীন এক টিলার উপর। সবার চোখে সানগ্লাস। সূর্য পুড়িয়ে দিতে চাইছে ঘাড়। হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে গলায়-ঘাড়ে বেঁধে নিল রানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বদ্ধ পরিবেশে থাকবার পর এখন হাঁটতে অবশ্য ভালই লাগছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল এক পাহাড়ের ঢালে। এখানেই প্রথমবারের মত দেখা গেল বিমানের অংশ। অ্যালুমিনিয়ামের ট্র্যাশক্যানের মত দুমড়ে গেছে। ডানার ওই অংশ দেখে এভিয়েশন এক্সপার্ট বলবে, ওটা ফ্রন্ট গিয়ার এসেম্বলির হ্যাচের অংশ।

ঢালের উপর দিকে চাইল রানা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জঞ্জাল। টিলার চূড়ার কাছে ফিউজেলাজের বড় এক অংশ। মনে

হচ্ছে যেন এখান দিয়ে বয়ে গেছে ভয়ঙ্কর টর্নেডো।

আকাশ থেকে প্রায় খাড়াভাবে আছড়ে পড়েছিল বিমান। ভাঙা ফিউজেলাজ আগুনে পুড়ে যায়। নানাদিকে মুঠোর চেয়ে ছোট ধাতু ও প্লাস্টিকের টুকরো। নীচে পড়েই খুবলে নিয়েছে পাথুরে জমি, যেন দু' হাতে আঁচড় কেটেছে কোনও বিশাল দানব। এভিয়েশন কেরোসিন বিস্ফোরিত হয়ে পুড়িয়ে দেয় চারপাশের জমি। শুরু হয় দাবাগ্নি, তবে আশপাশে কোনও গাছ ছিল না বলে ঝোপঝাড় ও আগাছা জ্বালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে।

এতক্ষণ পিছন থেকে এসেছে হাওয়া, ফলে পোড়া ফিউলের দুর্গন্ধ আসেনি। খানিক চলবার পর কেরোসিনের ভারী গন্ধে আটকে আসতে চাইল শ্বাস। কাপড় দিয়ে নাক ঢাকল ওরা, একটু কমল ফিউলের ধক।

চারদিক দেখবার জন্য ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বড় টুকরোগুলোর ছবি তুলছে নবী। বুঝতে চাইছে জিনিসটা কোথা থেকে এসেছে। ছিঁড়ে যাওয়া কয়েকটা বল্টু তুলে নিল, রেখে দিল প্লাস্টিকের ব্যাগে। এসব বল্টু কেবিনের মেঝেতে আটকে রাখত সিটগুলোকে। নবী এরইমধ্যে খুঁজতে শুরু করেছে বিমানের লেজ। ওদের দুই বন্ধুর ধারণা, ওটার কারণে ধ্বংস হয় বিমান। আর তাই যদি হয়, ওই জিনিস পাওয়া যাবে কয়েক মাইল দূরে।

'মাসুদ ভাই,' ডাকল স্বর্ণা। বাঁ দিকে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমানের সিএফএম ইণ্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনের পাশে।

দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা। নীরবে জমির দিক দেখিয়ে দিল স্বর্ণা। ধুলোর ভিতর ডুবে আছে জিনিসটা।

হাত থেকে কাটা কবজি, বিশ্রী ভাবে পোড়া। থাবা দেখে বোঝা যায় পুরুষের। দু'হাতে লেইটেক্স গ্লাভস্ পরে নিল রানা, ঝুঁকে তুলে নিল হাতটা। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল প্লাস্টিকের

টিউব, এক দিকের অংশ খুলে কাটা কব্জি থেকে রক্তের স্যাম্পল নিয়ে রেখে দিল এভিডেন্স কালেকশন টিউবে। লোকটার অনামিকা থেকে খুলে নিল আঙটি। পাতের ভিতর অংশে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর।

চোখ সরু করে পড়ছে স্বর্ণা। 'তনিমা ও সাদাত। ১/১/২০০৮ ইং।' রানার দিকে চাইল স্বর্ণা। 'বিবাহিত। আট সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন বিয়ে হয়। আমি প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট পড়েছি। সাদাত হোসেন ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল।'

একটু থমকে গেল রানা। ছেলেটি কয়েক বছর আগে যোগ দেয় বিসিআইয়ে। হাসিখুশি ছেলে। নিজের বিয়েতে দাওয়াত দেয়। নিজেই নিয়ে যায় ওদেরকে। খুব হুলুস্থুল করে বিয়ে করে প্রেমিকাকে।

দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল রানা। একটু আগে মনের ভিতর আশা ছিলঃ মানুষগুলো যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকবে। কিন্তু এখন সব আশা শেষ। কেউ নেই। প্লেনের সবাই মারা গেছে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। গম্ভীর চেহারায় এদিকে আসছে নিশাত সুলতানা।

'পোর্ট ইঞ্জিনের এক অংশে আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগের টুকরো পেয়েছি। সিরিয়াল নম্বর মিলে গেছে। এটাই বাংলাদেশের বিমান এয়ারবাস।'

কোনও এভিয়েশন এক্সপার্ট টিম না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কী কারণে ভূ-পাতিত হয়েছে বিমান। এখন আর না খুঁজলেও চলে। রানা একবার ভাবল সবাইকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবে, ওদের কারণে নষ্ট হতে পারে প্রমাণগুলো। কিন্তু মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ওদের কাছ থেকে সব শুনতে চাইবেন। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওর মন বলছে, কাজ শেষ না করে

যাওয়া ঠিক হবে না।

'ঠিক আছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'আমরা স্যাম্পল জোগাড় করব। তবে খুব সাবধান, কোনও প্রমাণ যেন নষ্ট না হয়।' নিজ পায়ের দিকে চাইল। ওদের সবার পায়ে ট্রেড ছাড়া সোল। কোনও ছাপ পড়বে না। বিচ্ছিন্ন হাতের অনামিকায় আঙটি পরিয়ে দিল রানা, ঠিক আগের মত করে রেখে দিল ধুলোর ভিতর।

একাই ফিউজেলাজের কাছে চলে গেছে নবী, সব খুঁটিয়ে দেখছে। তার পাশে চলে গেল রানা-স্বর্ণা-নিশাত। ফিউজেলাজের এই অংশ ছিল ককপিটের ঠিক পিছনে। এটার শেষ অংশে যোগ হয়েছে ডানা। পোর্ট সাইডে জানালা থাকার কথা, কিন্তু সব ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যালুমিনিয়ামের পাত। জায়গাটা বিশ্রীভাবে প্রসারিত ঠোঁটের মত লাগছে। এয়ারক্রাফট থেকে ঝুলছে কাটা পড়া তার ও হাইড্রলিক লাইন। টপটপ করে ফ্লুইড পড়েছে পাথুরে জমির উপর।

অনেক সামনে গিয়ে পড়েছে ককপিট। পাথুরে জমির ভিতর দশ ফুট গেঁথে গেছে এয়ারক্রাফটের নাক। ধাতব চামড়া দেখে মনে হয় অ্যাকর্ডিয়ানের ট্যাণ্ডেম বাসের জয়েন্ট।

ফিউজেলাজের ভিতর ঢুকল রানা। চমৎকার কেবিন পুড়ে ছারখার হয়েছে। মেঝের উপর প্লাস্টিকের স্তূপ। কংকালের মত ইস্পাতের ফ্রেম বলছে ওখানে সিট ছিল।

চট্ করে গুণল রানা, সব মিলে এগারোটা লাশ। সাদাতের হাতের মতই পুড়ে বিকৃত সবাই। কাউকে চেনা যায় না। ছাই হয়েছে পোশাক। থেঁতলানো পোড়া মাংস ছাড়া কিছুই নেই। প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়বার ফলে দেহগুলো চারদিকে ছিটকে পড়েছে। পোড়া মাংসপচা দুর্গন্ধ হারিয়ে দিয়েছে এভিয়েশন ফিউয়েলকে। হাজির হয়েছে কয়েক হাজার মাছি। কোনও লাশের পাশে থামলে

ভনভন করে উড়াল দিচ্ছে।

হঠাৎ রানার মুখে জমে গেল লালা, বমি আসতে চাইছে। ঢোক গিলে অন্য দিকে চাইল।

একটু দূরে একটা ক্লাব চেয়ারের নীচে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝে দেখছে নবী, দাঁতে ধরা ফ্ল্যাশলাইট। চারদিকের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও লাশ থেকে মনোযোগ সরাতে গুনগুন করে গান গাইতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই। যেন গুঙিয়ে চলেছে অসুস্থ কেউ।

'নবী,' ডাকল রানা। 'তোমার কাজ শেষ হলে, চলো বেরিয়ে যাই।'

মনোযোগ দিয়ে কী যেন করছিল, রানার কণ্ঠ শুনে চমকে গেল। মুখ থেকে টর্চ সরিয়ে উপরে চাইল। 'মাসুদ ভাই, বহুত বুদ্ধি খাটিয়ে নকল দৃশ্য তৈরি করেছে কেউ।'

'কী বলতে চাইছ?'

'এই ক্র্যাশ সাইট বোগাস। এখানে এসে আগেই প্রমাণগুলো সরিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'বুঝলে কী করে? আমার কাছে তো সব স্বাভাবিক লাগছে।' রানার মনে পড়ল বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর এভিয়েশন অ্যাক্সিডেন্টের উপর একটা কোর্স করেছিল নবী।

'ক্র্যাশ ঠিক আছে। এটাই প্রধানমন্ত্রীর বিমান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একদল লোক এখানে সব ওলটপালট করেছে।'

হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে এল রানা। 'আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

ওর দিকে না চেয়ে স্বর্ণার দিকে চাইল নবী। 'আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'কী ধরব?' বলল স্বর্ণা। 'একটা বিমান ধ্বংস হয়েছে, মারা

গেছে সব ক'জন মানুষ—আল্লাহ্ জানেন, বাকি জীবন এই দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরবে কি না। আবার কী দেখব?'

'আপনার রুমালটা নাক থেকে সরান,' বলল নবী।

'মরতে?'

'যা বলছি করুন।'

'এর মাথা খারাপ,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা, তবে নাক থেকে সরাল রুমাল। খুব সাবধানে শ্বাস নিল। পরের মুহূর্তে বড় করে দম নিল। 'কিছুই তো বুঝলাম না?'

নিজের রুমাল সরাল রানা। দু'বার শ্বাস নেয়ার পর বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। ওর দিকে চেয়ে আছে নিশাতও।

'আমি যা পেয়েছি তা-ই কি পেলেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জেলিড গ্যাসোলিন।'

'নাপামের মত,' তথ্য জুগিয়ে দিল নবী।

নিশাতও বুঝতে পেরেছে।

'আপনি নেভিতে আছেন, কাজেই বুঝবেন না, স্বর্ণা,' বলল নবী। 'এ জিনিস ব্যবহার করে না নেভি।'

'জিনিসটা পুরনো আমলের ফ্লেমথ্রোয়ারের মত,' বলল রানা।

'ঠিক তাই, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আমার ধারণা একদল লোক এই বিমানকে নামতে বাধ্য করে। সে এলাকা এখান থেকে দূরে। নামিয়ে নেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। আবার আকাশে ওড়ে এয়ারবাস, তারপর এখানে এসে ক্র্যাশ করে পাহাড়ের উপর। হয়তো ব্যবহার করা হয় রিমোট কণ্ট্রোল্ড সিস্টেম। আবার হতে পারে, ক্র্যাশ করিয়েছে আত্মঘাতী পাইলটকে দিয়ে।

'বিমান পড়ে যাওয়ার পর একদল লোক আসে, মরা পাইলটকে সরিয়ে নেয়। তখনই বুঝেছে ঠিক ভাবে পোড়েনি কেবিন। বাধ্য হয়ে ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করেছে। আমরা যদি এই

গন্ধ না পেতাম, বাতাসে মিলিয়ে যেত। পরে কেউ বলতে পারত না প্রমাণ সরানো হয়েছে। বাংলাদেশি টিম স্যাম্পলগুলো অ্যানালাইয করবে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফে, কাজেই এভিয়েশন ফিউয়েল ছাড়া কিছুই ধরা পড়বে না।'

'আমাদের কোনও ভুল হচ্ছে না তো?' বলল স্বর্ণা।

'না,' জোর দিয়ে বলল নবী।

পরস্পরের দিকে চাইল ওরা সবাই।

মন বলছে রানার, আরেকটা সুযোগ পেয়েছে। এমন তো হতেই পারে প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

একটা কথা মনে পড়তেই নবীর দিকে চাইল স্বর্ণা। 'ক্যাপ্টেন নবী, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব বিমান আগে নামানো হয়েছে? বিমান এখানে পড়বার পরেও ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করতে পারে।'

'প্রমাণ থাকবে ল্যাণ্ডিং গিয়ারে,' বলল রানা। 'চলো, দেখি।'

ফিউজেলাজ ধরে এগুলো ওরা, নেমে এল অন্ধকারচ্ছন্ন কার্গো এরিয়ায়। বদ্ধ বাতাসে ভাসছে পোড়া ফিউয়েলের কটু গন্ধ। ওটা কয়েক দিনে পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি সহনীয়। মেঝের উপর বসানো অ্যাক্সেস প্যানেলের সামনে থামল নবী, খুলে ফেলল টগল। হ্যাচ তুলে দিতেই বেরিয়ে এল দীর্ঘ পিয়ানো হিঞ্জ। ফোকরের নীচে এয়ারবাসের প্রকাণ্ড চাকা ও পোর্ট সাইড ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একবার রানার দিকে চেয়ে গর্তের ভিতর নেমে পড়ল নবী, চাকার নীচের অংশে ফেলল ফ্ল্যাশলাইট। হামাগুড়ি দিয়ে এড়িয়ে গেল চাকা, নাক থাকল রাবার থেকে আধ ইঞ্চি দূরে। 'কিছুই নেই,' বলল। আরও নিচু হয়ে দেখতে চাইল অন্য চাকাগুলো।

এক মিনিট পেরুল, তারপর গর্ত থেকে উঠে এল। রানার দিকে মেলে ধরেছে ডান হাত। 'এই যে আমাদের প্রমাণ, মাসুদ ভাই।'

'একটা বিচ্ছিরি পাথর?' আপত্তির সুরে বলল স্বর্ণা।

'চাকার ট্রেডের ভিতর ছিল, নীচের হ্যাচে পাবেন বালি,' বলল নবী। 'এই বিমান রওনা হয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে। তারপর লিবিয়ার এই পাহাড়ে এসে ক্র্যাশ করেছে। তা হলে মাঝখান থেকে কোত্থেকে এল স্যাণ্ডস্টোন আর বালি? এই জিনিস নিউ ইয়র্কে মিলবে না। তবে আছে লিবিয়ায়।'

মাথা দোলাল রানা। 'প্রমাণ হয়েছে বিমান নামানো হয়েছে মরুভূমিতে।' পাথরের খণ্ড বাড়িয়ে দিল নবীর দিকে। 'এক্সপার্টরা এটা না-ও দেখতে পারে। তবে মার্ভেলে অ্যানালাইয করা যায়।'

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এল আওয়াজটা। অজান্তে মাথা নিচু করে নিল ওরা। এইমাত্র ফিউজেলাজের উপর দিয়ে গেছে প্রকাণ্ড এক হেলিকপ্টার। এত নীচ দিয়ে গেছে, শুরু হয়েছে বালিঝড়। শব্দ এসেছে উত্তর-পুব থেকে। ওদিকেই ত্রিপোলি শহর। শহরের বাইরের অংশে রয়েছে লিবিয়ান মিলিটারি বেস। আমেরিকান নেভির অ্যাওয়্যাক্স বিমানকে ফাঁকি দিতে কপ্টার মাটি ছুঁয়ে এসেছে।

আগে নড়ে উঠল রানা, তারপর অন্যরা। দেরি না করে কার্গো এরিয়া হয়ে কেবিনে ঢুকল ওরা, বেরিয়ে এল ফিউজেলাজ থেকে। দূর আকাশে স্থির হয়ে আছে রাশান এমআই-৮ কার্গো কপ্টার, বোধহয় নামবে। প্রকাণ্ড এই ফড়িং প্রায় পাঁচ টন ওজন নেয়। টারবাইনের আওয়াজ বদলে গেল, ভাঙা ফিউজেলাজ থেকে পাঁচ শ' গজ দূরে নামতে লাগল টিলার উপর।

'নতুন করে প্রমাণ হলো এরা জানত বিমান কোথায় ক্র্যাশ করেছে,' বলল স্বর্ণা। চেয়ে রইল খাকি রং করা কপ্টারের দিকে। 'পাইলট ভাল করেই জানে কোথায় নামতে হবে।'

'এসো, ধুলো নেমে যাওয়ার আগেই কাভার পেতে হবে,' পা বাড়াল রানা। সবাইকে নিয়ে চলেছে ফিউজেলাজের অপর পাশে।

ফিউজেলাজের আশপাশে কোনও আড়াল নেই। হালকা চালে দৌড়াতে শুরু করল বাংলাদেশি টিম, নেমে চলেছে টিলা বেয়ে। খানিক ছুটবার পর শীর্ণ এক ড্রাই ওয়াশ পড়ল। পাহাড়ে তুমুল বৃষ্টির সময় এটা হয়ে ওঠে গভীর এক ঝর্না। এখানে থামল ওরা, শুয়ে পড়ল রানার নির্দেশে। মুঠো মুঠো বালি ছড়িয়ে দেহগুলো আড়াল করে দিল রানা। যতটা পারে নিজেও লুকিয়ে পড়ল। খুব বেশি ভাবছে না। সরে এসেছে ওরা, তা ছাড়া কপ্টার থেকে এত দূরে কারও আসবার কথা নয়।

'মাসুদ ভাই, আপনার কী ধারণা? ওরা ওখানে কী করছে?' ফিসফিস করে বলল নবী।

'জানি না। আপা, স্বর্ণা, তোমাদের কী মনে হয়?'

'আল্লাহ মাবুদ জানেন,' বলল নিশাত।

'কেউ হয়তো ভেবেছে ঠিক করে স্টেজ সাজানো হয়নি,' বলল স্বর্ণা। 'কাজেই নতুন করে নিখুঁত করতে এসেছে।'

চূড়ার কাছে নেমেছে কপ্টার। থামছে টারবাইন। কমে এল রোটরের গতি। সিলিং ফ্যানের মত ছড়িয়ে দিল হাওয়া। তারপর লেজের বুম থেকে খানিক নীচে খুলে গেল শামুকের মত দরজা। একেকবারে নেমে এল তিনজন করে লোক, পরনে ডেজার্ট ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের মাথায় লাল-সাদা কাফিয়ে। মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জঙ্গিরা শখ করে ব্যবহার করে ওটা।

'রেগুলার আর্মি, না গেরিলা?' জানতে চাইল নিশাত।

প্রায় এক মিনিট চেয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'চারপাশে যেভাবে ঘুরছে, মনে হয় না রেগুলার আর্মি। এরা সৈনিক হলে প্যারেড ফরমেশনে নেয়া হতো। জানি না লিবিয়ান মিলিটারির মার্কিংওয়ালা কপ্টার এখানে কী করছে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে ওরা, ক' মুহূর্ত পর বিস্ফারিত হলো ওদের চোখ। দুই লোক পিছন হেঁটে বেরিয়ে এসেছে কপ্টার

থেকে, রাশ ধরে টেনে আনছে একটা উটকে! প্রাণপণে পিছিয়ে যেতে চাইছে প্রাণীটা, থরথর করে কাঁপছে চার পা। বিকট স্বরে আপত্তি তুলছে, গ্যাঁজলা ওঠা ফেনা পড়ছে লোক দুটোর মুখের উপর। তারপর ডানদিকের লোকটার উপর বমি করে দিল উট। আকাশ পথে আসবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দুই পশুচারকের দিকে চেয়ে হো-হো করে হাসছে অন্যরা। এত দূরেও পৌঁছে গেল সেই আওয়াজ।

'কী করছে ওরা?' আনমনে বলল নবী। 'দেখে তো মনে হয় ওই উট আধ-মরা।'

মনে মনে সায় দিল রানা। সুস্থ লাগছে না জন্তুটাকে। জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে লোমগুলো, কেমন ম্লান বর্ণের। এক দিকে কাত হয়ে গেছে কুঁজ, আকৃতি স্বাভাবিকের অর্ধেক। কী ঘটে চুপচাপ দেখছে রানা।

একুশজন লোক নেমে এসেছে কপ্টার থেকে, জঞ্জাল ভরা ঢালে ঘুরে দেখছে। উট নিয়ে যে দু'জন হাঁটছে, তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরছে কপ্টারের কাছে। পরে ছাপ দেখলে মনে হবে ওখানে একাধিক উট ছিল। রানা খেয়াল করল লোকগুলোর কারও কারও পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল। এবার নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

'স্বর্ণার কথা ঠিক। ওরা ভেবেছে ফরেনসিক টিম ক্র্যাশ সাইট দেখলে বহু কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। তাই এখন প্রমাণ নষ্ট করছে। এমন ভাব নিয়েছে, ওরা একদল যাযাবর।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল এসব। হাতের কাছে যা পেল, লোকগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। ছুঁড়ে ফেলে দিল এদিক ওদিক। দু'জনের হাতে স্লেজহ্যামার। ওগুলো দিয়ে বড় টুকরোগুলোকে পেটানো হলো। ককপিট ও ফিউজেলাজের তার এবং মাঝারি অংশগুলো নিয়ে ফেলা হলো দুই শ' গজ দূরে। বুঝবার উপায়

রইল না বিমান কীভাবে পড়েছে। ল্যাণ্ডিং গিয়ার ডোর খুলে বের করা হলো বিশাল চাকাগুলো। রাইফেলের গুলিতে ফুটো হলো সব। বিমানের কিছু অংশ টেনে নেয়া হলো কপ্টার পর্যন্ত, তুলে দেয়া হলো ফড়িঙের পেটে। জায়গা ভরে যেতেই রওনা হলো ওটা। সঙ্গে গেল চারজন। পঁচিশ মিনিট পর আবারও ফিরল কপ্টার। বিমানের টুকরো ফেলে আসা হয়েছে মরুভূমির ভিতর।

আগেই বিমানের ধ্বংসাবশেষ ছিল অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ও প্লাস্টিকের জঞ্জাল, কিন্তু এখন যে অবস্থা, ক্র্যাশ এক্সপার্টরা এসব থেকে কিছুই বুঝবে না। লাশগুলোকে খানিক দূরে নিয়ে পুঁতে ফেলা হলো। জ্বলে উঠল কয়েকটা আগুন। পরে কেউ এলে ভাববে এখানে ক্যাম্প করেছিল একদল যাযাবর, কমপক্ষে দু'দিন ছিল এখানে। উটের কাজ শেষ। ওটা যে লোকের উপর বমি করেছে, সে পিস্তল বের করে জন্তুটার দুই চোখের মাঝখানে গুলি করল।

এর কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো সবাই। কয়েকজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মনে হয় প্রকৃতির ডাকেই। কাজ শেষে কপ্টারে উঠে বেসে ফিরবে।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো, ট্রাক নিয়ে তিউনিশিয়া সীমান্তে পৌঁছবে তোমরা। তবে তখনই সাগরের দিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমি সোহেলের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ওকে জানিয়ে দিয়ো আমরা কী দেখেছি। ও যেন আমাকে ট্র্যাক করে।'

মার্ভেলের অপারেটিভদের ঊরুতে অপারেশন করে বসানো হয়েছে ট্র্যাকিং চিপস। ওটা দেহের নড়াচড়া থেকে শক্তি পায়। ছ' মাসে একবার ট্র্যান্সডারমাল রিচার্জ করলেই চলে। জিপিএস টেকনোলজিকে ব্যবহার করে জিনিসটা, ফলে অনায়াসে জানা যায় ওরা কে কোথায় আছে।

'আর আপনি কী করবেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওদের সঙ্গে যাব।'

'আমরা তো জানিই না এরা কারা।'

'তা-ই তো যেতে হবে।'

ওই দলের এক লোক এসেছে শ' খানেক গজ দূরে। উচ্চতা ও আকৃতি প্রায় রানার মতই। তাকে দেখেই বুদ্ধি এসেছে রানার মাথায়। ভাষা নিয়ে সমস্যা হবে না। আর মুখ-মাথা ঢেকে রাখবে কাফিয়ে দিয়ে। আশা করা যায় অনায়াসে এ দলের সঙ্গে যাওয়া যাবে।

সুন্দরীর চাবি নিশাতকে দিল রানা, গোপন অবস্থান থেকে খুঁড়ে তুলছে নিজেকে। ওর বাহু স্পর্শ করল স্বর্ণা। 'মাসুদ ভাই, যার বদলে যাবেন, তার কী করব?'

'ফেলে যাবে। আমার ধারণা আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর লিবিয়ান সরকার ঘোষণা দেবে: আমরা বিমান খুঁজে পেয়েছি। তারপর এখানে ছুটে আসবে তাদের লোক। ও-ই ভেবে বের করুক কী ব্যাখ্যা দেবে তাদের।'

ড্রাই ওয়াশ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, খানিক যাওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল লোকটার পিছনে। কিছুই সন্দেহ করেনি সে। ঘুরতে শুরু করেছে কপ্টারের টারবাইন। পায়ের আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়, আওয়াজটা এমনই তীক্ষ্ণ, দাঁতে দাঁত পিষতে হয়।

ছোট এক ঢিবির পিছনে অপেক্ষা করল রানা। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে লোকটা, গুলতির মার্বেলের মত পাথর তুলল পবিত্র হতে। দেরি করল না রানা, হাতে তুলে নিয়েছে ক্রিকেট বলের সমান একটা পাথর, পৌঁছে গেল শেষ দু'গজ। তখনই চট্ করে ঘুরে চাইল লোকটা। তার মাথার তালুর উপর জোরেসোরে নেমে

এল পাথর। রানার মনে পড়ল, ক'দিন আগে এক সোমালিয়ানকে এভাবে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। তবে এ রীতিমত ভদ্রলোক, ঘুরেই ধুপ করে পড়ল বালির উপর।

বসে পড়ে লোকটার ঘাড়ে পালস দেখল রানা, জ্ঞান ফিরলে ব্যথা ছাড়া আর কোনও সমস্যা থাকবে না এর। দ্রুতহাতে তার পোশাক ও বুট খুলল রানা। কাফিয়ে খুলতেই দেখা গেল লোকটার বয়স ত্রিশ মত। ইউনিফর্মের পকেটে কোনও আইডেণ্টিফিকেশন বা মানিব্যাগ নেই। কোনও ধরনের লেবেল রাখা হয়নি।

পোশাকগুলো নিজে পরে নিল রানা, অচেতন বন্দিকে ক্র্যাশ সাইট থেকে আরও খানিক সরিয়ে নিল। একবার পকেট থাবড়ে দেখল স্যাটালাইট ফোনটা আছে। ওটা না থাকলে এই পরিকল্পনা নিয়ে এগোত না। লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর আধ মিনিট পেরুনোর আগেই শুনল চিৎকার। কপ্টারের আওয়াজের উপর দিয়ে ডাকছে এক লোক।

'সোবহান! সোবহান! জলদি!'

এ লোকের নাম সোবহান, তার বদলে চলেছে নিজে, দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল রানা। কাফিয়ে দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে নিয়েছে মুখ। ঢিবির আড়াল থেকে বেরুল। বিশ জনের এ দলের নেতা দাঁড়িয়ে রয়েছে কপ্টার থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। হাতের ইশারা করল, এক্ষুণি এসো।

মাথা দোলাল রানা, হালকা চালে ছুটতে লাগল।

'আর এক মিনিট দেরি হলে তোমাকে ফেলে যেতাম কাঁকড়া বিছের পাহাড়ে,' রানা কাছাকাছি পৌঁছতেই বলল সে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'চাপ বেশি ছিল।'

'উঠে পড়ো।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা।

দু'জন পাশাপাশি উঠল কপ্টারে। কার্গো কম্পার্টমেণ্টে দু'

দিকের জানালার পাশে ফোল্ড করা সিট। অন্যদের চেয়ে খানিক পিছনে বসল রানা। খুশি, এরা মুখ থেকে সরায়নি কাফিয়ে। উষ্ণ অ্যালুমিনিয়ামের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজল।

ওর জানা নেই রেগুলার মিলিটারির সঙ্গে রয়েছে, না সন্ত্রাসী জঙ্গিদের সঙ্গে। এখন কী-ই বা যায় আসে? যদি শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে, মরতে হবে। কাদের হাতে মরছে, তা জেনে কী হবে?

এক মিনিট পেরুনোর আগেই আকাশে উঠল কপ্টার।

চোদ্দ

ক' দিন হলো পাথুরে সেলে বন্দি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ মুহূর্তে চুপ করে বসে আছেন মেঝেতে। কিছুই করবার নেই তাঁর, সঙ্গে কেউ নেই যে কথা বলে সময় কাটাবেন।

সেলে কোনও আসবাব নেই। বিছানা হিসাবে দেয়া হয়েছে চটের ছালা। একদিকে লোহার দরজা। ওদিক দিয়ে দেয়া হয় অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটি। খাবার অতি নিম্ন মানের। ছাতে দিনরাত জ্বলে নগ্ন বালব। প্রধানমন্ত্রীর ঘড়িটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। কাজেই জানার উপায় নেই এখন দিন না রাত। তবে আঁচ করেন, এখানে আছেন চারদিন ধরে।

মরুভূমিতে এয়ারবাস ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের আগে, ইন্টারকমে ব্যাখ্যা দেন পাইলট: তাঁরা পুরনো এক এয়ারফিল্ড দেখতে পেয়েছেন। বিমান অনেক নেমে এসেছে, তবে দুই মাইল যেতে পারবে।

রুক্ষ ধুলোময় স্ট্রিপে নামবার সময় খুব ঝাঁকি খেয়েছে বিমান, তবে পুরো আস্ত থেকেছে। চাকা থেমে যাওয়ার পর হৈ-হৈ করে পাইলটের প্রশংসা করেছে যাত্রীরা সবাই। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সবাই একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়েছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে খুশিতে। সবার চোখে ছিল আনন্দের অশ্রু।

তারপর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন পাইলট ও কো-পাইলট। তাঁদের পিঠ চাপড়ে বেগুনী বানিয়ে দেয়া হলো। সবার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেল তাঁদের হাত। মেইন ডোর খুলে ফেলল সিক্রেট ডিটেইল সাদাত হোসেন, মরুভূমি থেকে ধেয়ে এল তপ্ত হাওয়া। দূর করে দিল ভয়ের পরিবেশ।

আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো সাদাত হোসেনের মাথা! পিছনে ছিল স্টুয়ার্ডেস, ছিটকে তার চোখে-মুখে পড়ল তাজা রক্ত ও ছেঁড়া মগজ। রানওয়ের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে একদল লোক, প্রত্যেকে সশস্ত্র। বালি ও তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ফক্স হোলে লুকিয়ে ছিল। পরনে খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় পেঁচানো কাফিয়ে। কেউ দরজা বন্ধ করবার আগেই মই নিয়ে এল ক'জন, আটকে দিল নীচের সিলে। পাইলট চট্ করে দরজা বন্ধ করতে চাইলেন, যেন নিজের দুর্গ রক্ষা করছেন বীর সেনাপতি। যে স্নাইপার সাদাত হোসেনকে খুন করেছে, সেই একই লোক গুলি করল পাইলটের কাঁধে। একহাতে জখমটা ধরে কাত হয়ে পড়ে গেলেন পাইলট। পরক্ষণে কেবিনে উঠে এল তিনজন লোক, হাতে একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল।

প্রধানমন্ত্রীর এইডদের ভিতর সালাম বিন আশরাফ বাঘের মত ধমকে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী ভয় পেলেন, ভদ্রলোককে মেরে ফেলা হবে এখুনি। উঠে দাঁড়ালেন সিট ছেড়ে।

এরপর বড় দ্রুত ঘটে গেল সব। সবাইকে খোলা দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। আরও লোক উঠল বিমানে।

আরবিতে বারবার করে বলতে লাগল টেরোরিস্টরা, 'খবরদার, কেউ একচুল নড়বে না!'

প্রধানমন্ত্রী আরবিতে বললেন, 'আপনারা যা বলবেন আমরা তা মেনে নিচ্ছি। ভয় না দেখালেও চলবে।' বসে পড়লেন একটা চেয়ারে।

তাঁর দেখাদেখি সবাই চেয়ারে বসলেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল এক জঙ্গি, টেনে তুলল সিট থেকে। তাঁকে ঠেলে দেয়া হলো দরজার দিকে। এমনি সময়ে মই বেয়ে উঠল এক তরুণ। পরনে ইউনিফর্ম নেই। নীল প্যান্ট ও অক্সফোর্ড সাদা শার্টে তাকে কলেজের ছাত্র মনে হলো।

জীবনে ওই মুখ ভুলবেন না প্রধানমন্ত্রী। সে যেন কোনও দেবতা। দুধের মত ধবধবে ত্বক। ওয়্যায়ার ফ্রেমের চশমার ওপাশে দীর্ঘ পাপড়ি। ভাসা ভাসা মায়াবী চোখ। মনে হয় পড়ুয়া ধরনের। ছেলেটির বয়স বড়জোর বিশ। হালকা-পাতলা। তাকে এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছে না। হাতে একটা বই ও তসবি। বইয়ের মলাটের অক্ষর থেকে বোঝা গেল, ওটা কোরান শরীফ।

লাজুক হাসল তরুণ, চলে গেল ককপিটের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন, তাঁর সঙ্গীদের হাত সিটের হাতলের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, এরা কী করতে চাইছে। শিউরে উঠলেন। যে লোক তাঁর হাত ধরেছে, তাকে নরম স্বরে বললেন, 'দয়া করে এ কাজ করবেন না।'

জবাবে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে মইয়ের দিকে ঠেলল লোকটা। পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিলেন তিনি। লোকটার কাফিয়ে সরে গেছে। লিবিয়ানদের মত সেমিটিক চেহারা নয়

তার। হতে পারে পাকিস্তানি বা আফগান। আবারও ধাক্কা দিল লোকটা, এবার আর সামলাতে পারলেন না তিনি। পড়লেন একটা সিটের পাশে। হাতলে ঠাস্ করে লাগল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারালেন। কার্পেটে পড়লেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ফিরল জ্ঞান। দেখলেন তাঁকে মইয়ের দিকে বয়ে নেয়া হচ্ছে। একবার আশরাফ সাহেবের চোখে চোখ পড়ল, দেখলেন ভদ্রলোকের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। উনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন কী ঘটতে চলেছে।

'আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন,' ভারী গলায় বললেন।

'আপনাদেরও ভাল করুন,' জবাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর তাঁকে নামিয়ে নেয়া হলো বিমান থেকে।

তাঁর পিঠে ধাক্কা দিয়ে এক শ' ফুট দূরে নিয়ে গেল লোকগুলো, জোর করে বসিয়ে দিল মাটিতে। হাত দুটো পিছমোড়া করে আটকে দিয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। ককপিটের খুদে জানালা দিয়ে দেখলেন তরুণ ছেলেটা প্লেনের কন্ট্রোলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিমানের লেজে গোল একটা গর্ত। বোধহয় কোনও মিসাইল আঘাত হানে ওখানে, তবে বিস্ফোরিত হয়নি। আন্দাজ করলেন তাঁকে বন্দি করবার জন্যই ওরা এই কাজ করেছে। সবাই ধারণা করবে তিনি মারা গেছেন।

তাঁর লোকদেরকে কেবিনের ভিতর আটকে রেখে বেরিয়ে এল সন্ত্রাসীরা। ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার উপর দাঁড়াল ছেলেটা, জড়িয়ে ধরল শেষ লোকটিকে। ওর কানে কী যেন বলে নেমে এল লোকটা, সরিয়ে নেয়া হলো মই। সবাই হৈ-হৈ করে উৎসাহ দিল তরুণ পাইলটকে। হ্যাচ বন্ধ করে দিল ছেলেটা, বোধহয় ফিরল ককপিটে।

প্রধানমন্ত্রীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। জানালায় কয়েকজনকে দেখতে পেলেন। সবাই তাঁর লোক, বাংলাদেশের

মানুষ। এরা নিজ দেশকে ভালবাসে। বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। মুখ সরিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। না, তিনি কাঁদবেন না।

কয়েক মুহূর্ত পর চালু হলো বিমানের ইঞ্জিন। গর্জন বাড়তে লাগল। যেন ফেটে যাবে কানের পর্দা। ধুলোময় রানওয়ে থেকে দূরে ছিল ক্যামোফ্লাজ করা একটা ইউটিলিটি ট্রাক্টর। ওটার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তারপুলিন। এ ধরনের ট্রাক্টর সব এয়ারপোর্টেই থাকে। বিশাল বিমানের নাকের সামনে এসে থামল ওটা, সামনের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের সঙ্গে আটকে নেয়া হলো টো হুক।

কয়েক মিনিট ধরে বিমানের অবস্থান ঠিক করল ড্রাইভার। এয়ারবাস থামল রানওয়ের শুরুতে, সরে গেল ট্রাক্টর। বদলে গেল বিমানের ইঞ্জিনের গর্জন। রানওয়ের শুরু থেকে দৌড় দিল এয়ারবাস।

অন্তর থেকে প্রার্থনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, বিমান যেন উড়তে না পারে। হয়তো মিসাইলের কারণে বড় ক্ষতি হয়েছে, টেকঅফ করবে না।

কিন্তু বিমানে রয়েছে অতি সামান্য তেল, যাত্রীও অনেক কম, হালকা ওজনের কারণে দ্রুত বাড়তে লাগল গতি। বিদ্যুদ্বেগে প্রধানমন্ত্রীকে পাশ কাটাল বিমান। এগযস্টের তপ্ত হাওয়া নিঃশ্বাসের মত এসে লাগল। টেরোরিস্টরা আকাশে গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে চিৎকার করছে। বিমানের নাকের হুইল ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত আকাশে ঝুলে রইল, লেজের ক্ষতি এবং পাইলটের অদক্ষতার কারণে বিমানের শেষ অংশ বাড়ি খেল ধুলোময় রানওয়ের উপর।

এয়ারবাসের নাক নেমে আসতে লাগল মাটির দিকে। প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতে চলেছেন। এদিকে ফুরিয়ে এল রানওয়ে। আর বোধহয় উঠবে না বিমান।

কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে উঠে গেল এয়ারবাস। একটু কাত হয়ে উঠছে। জঙ্গিদের চিৎকার দ্বিগুণ হলো। শত শত গুলি ছুটল আকাশের দিকে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। দেখতে না দেখতে অনেক উপরে উঠে গেল বিমান। দ্রুত গতিতে চলেছে। চেয়ে রইলেন তিনি, জানেন না তাঁর সঙ্গীদের কোথায় নিয়ে চলেছে তরুণ। ওদিকে কোথাও রয়েছে ত্রিপোলি শহর। বলা যায় না, হয়তো শান্তি মহাসম্মেলনের হলঘরে আছড়ে পড়তে চলেছে। এখন পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করছে না সন্ত্রাসীরা। আকাশের দিকে চেয়ে আছে সবাই। বহু দূরে চলে গেছে এয়ারবাস। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু পারলেন না।

কাত হয়ে গেল এয়ারবাস, নাক তাক করল দূরের এক পাহাড়ের দিকে। নতুন করে উচ্চতা বজায় রাখতে চাইল পাইলট, আবার সোজা হলো বিমান। কিন্তু পরক্ষণে চিত হয়ে গেল, সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল টিলার উপর! ওই ভয়ঙ্কর পতনে থরথর করে কেঁপে উঠল এত দূরের জমিনও। বিভিন্ন টুকরো নানাদিকে ছিটকে গেল। ফিউজেলাজ থেকে ছিঁড়ে গেল ডানা, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে থামল টিলার চূড়ার কাছে। ওখান থেকে প্রচুর ধুলো উঠছে, হারিয়ে গেল দৃশ্যটা। অনেকক্ষণ পর সরে গেল ধূলিকণা। এবার দেখা গেল দাউ-দাউ করে জ্বলছে দুই ডানা। তবে আগুনের আওতা থেকে গড়িয়ে সরে গেছে ফিউজেলাজের সাদা একটা অংশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। চারপাশে উল্লসিত চিৎকার, ওই তরুণ পাইলটের প্রশংসা করছে সবাই। চূড়ান্ত ফ্যানটিসিজম বোধহয় একেই বলে। বাংলাদেশে তিনি কঠোর হাতে দমন করেছেন এদের, আজকের ঘটনা কি তারই

প্রতিক্রিয়া?

এত দূর থেকে দেখেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গের মানুষগুলো আগুনে পুড়ে মরেনি, তবে ওই ক্র্যাশের পর কারও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। একটু দূরে নিচু কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ক'জন আপত্তির সুরে বলছে বিমান আরও বেশি পোড়া উচিত ছিল। আলাপ শুরু হলো এরপর কী করবে।

তিনি যেখানে বসেছেন তার খানিক দূরে কী যেন। তারপুলিন সরে যেতে দেখা গেল ওটা মাটি সরানোর মেশিন। এক লোক গিয়ে উঠল ক্যাবে, চালু হলো ইঞ্জিন। মেশিনটা চলে গেল রানওয়ের গোড়ায়, কাজ শুরু করল। এই এয়ারফিল্ড দিয়ে এয়ারবাসকে আকর্ষণ করা হয়েছে। যে গতিতে কাজ চলছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভিতর হারিয়ে যাবে রানওয়ে ও চারপাশের সব চিহ্ন।

হঠাৎ লোকগুলোর আলাপে ছেদ পড়ল। প্রধানমন্ত্রী যাকে নেতা মনে করেছেন, সে একের পর এক নির্দেশ দিল। বেশিরভাগ শুনতে পেলেন না তিনি, তবে এটা কানে এল: 'এখান থেকে মুছে ফেলো প্লেনের ছাপ। পাহাড়ে গিয়ে খেয়াল রাখবে মিসাইলের চিহ্ন যেন না থাকে। আর লাশগুলো থেকে খুলে আনবে হ্যাণ্ডকাফ।' এরপর প্রধানমন্ত্রীর দিকে এল সে।

'কেন এ কাজ করলেন?' আরবিতে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝুঁকে এল লোকটা, কাফিয়ের ভিতর থেকে দেখা গেল সরু দুটো চোখ। তাতে ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। 'কারণ, আল্লাহ্ এটাই চেয়েছেন।' নিজের এক লোককে ডাকল সে। 'একে নিয়ে যাও। ইউনুস আল-কবির তাঁর প্রাইজ দেখতে চাইবেন।'

মাথা ঢেকে দেয়া হলো কালো কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে, আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ধরাধরি করে তুলে দেয়া হলো ট্রাকের

পিছনে। আবার যখন থলে সরিয়ে নেয়া হলো, দেখলেন তিনি আছেন এই সেলে। তাঁকে আগেই পরিয়ে দেয়া হয়েছে বোরখা। জিনিসটা আফগানি ছাদ্রি। দুই চোখ ছাড়া সব ঢাকা পড়েছে। চোখের সামনে ঝুলছে নাইলনের নেট।

তারপর থেকে শুধু অপেক্ষা। কার জন্য, কীসের জন্য, তিনি জানেন না। এরা বোধহয় মেরে ফেলবে তাঁকে। তার আগে মানসিক কষ্ট দিতে চাইছে। বড় ধীরে পেরুচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনলেন। ধম করে বাড়ি খেল দরজা। বোধহয় খাবার আসছে। দূর থেকে এল পায়ের শব্দ। খটাং শব্দে খুলল বোল্ট, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। এখন পর্যন্ত সেই তরুণ পাইলট এবং যে-লোক বিমানে তাঁকে ধাক্কা দেয়, তারা ছাড়া আর কাউকে খেয়াল করেননি। এবার দেখলেন দু'জন লোক ভিতরে ঢুকেছে। পরনে খাকি ইউনিফর্ম। তবে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। মাথা পেঁচিয়ে রেখেছে কাফিয়ে দিয়ে।

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

বামদিকের লোকটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাল। তাদের বন্দির হাতে হ্যাণ্ডকাফ, তবে ছিঁড়ে ফেলেছেন ছাদ্রি। ওটা ব্যবহার করেছেন বালিশ হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে চাইল না লোকটা, বোরখা তুলে মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল। 'তুমি এখন থেকে পুরুষকে সম্মান দেখাবে! চলো, তোমাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মুঠো করে হাত উঁচু করল লোকটা। 'কোনও প্রশ্ন নয়। আর একটা কথা বললে দাঁত ভেঙে দেব।'

প্রধানমন্ত্রীকে দু'পাশ থেকে ধরে সেল থেকে বেরুল ওরা, করিডোর ধরে এগিয়ে পেরুল চারটে ঘর, তারপর বেরিয়ে গেল দালান থেকে। জীবনে প্রথমবার বোরখার কারণে খুশি হলেন

তিনি। সামনে নেটের কাপড় না থাকলে ঝলসে যেত দুই চোখ। জ্বলজ্বলে সূর্য পোড়াচ্ছে মরুভূমিকে। সোনালী গোলকের অবস্থান থেকে আন্দাজ করলেন, এখন মাঝ-সকাল। গরম আরও বাড়বার কথা, তবে তাঁরা রয়েছেন পাহাড়ের অনেক উপরে।

ছবিতে এ ধরনের টেরোরিস্ট ক্যাম্প দেখেছেন তিনি। একটা টিলার গোড়ায় কয়েকটা পুরনো তাঁবু। টিলার খানিক উপরে অসংখ্য গুহা। যদি এই ক্যাম্পে হামলা হয়, এই লোকগুলো আশ্রয় নেবে ওখানে। সন্দেহ নেই, গুহার ভিতর রয়েছে প্রচুর গোলাবারুদ, বিস্ফোরক। প্রয়োজনে অর্ধেক পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

বামে প্যারেড গ্রাউণ্ড। একদল লোককে ক্যালিসথেনিকস করাচ্ছে ড্রিল ইন্সট্রাকটার। লোকগুলোর নড়াচড়া থেকে বোঝা যায়, শেষ হয়ে এসেছে ট্রেইনিং। বিশাল টিলা ঝুঁকে এসেছে ক্যাম্পের দিকে। ওখানে একদল লোক টার্গেট টাঙিয়ে গুলি ছুঁড়ছে একে-৪৭ দিয়ে। জায়গাটা এত দূরে যে প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন না ঠিক ভাবে টার্গেটে গুলি লাগছে কি না। তবে বড় কথা: এই টেরোরিস্ট দলের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এখানে নতুন রিক্রুটও ব্যবহার করে তাজা কার্তুজ।

শুটিং রেঞ্জ থেকে আধ মাইল দূরে উঁচু উপত্যকা। ওটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে বিশাল উঁচু পাহাড়। বোধহয় উপত্যকার নীচের অংশ খনি, সেখানে খনন চলছে। একপাশ দিয়ে গেছে রেললাইন। একটা সাইডিঙে বেশ কয়েকটা বক্স-কার। পাশে কাঠের জীর্ণ দালান। খানিক দূরে প্রকাণ্ড ডিজেল লোকোমোটিভ, চারদিকের ছোট ইঞ্জিনগুলোকে বামন করে দিয়েছে। যে ট্রাক তাঁকে এখানে এনেছে, সেটার সমান হবে ছোট ইঞ্জিনগুলো। োরখার নেটিঙের ফলে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখা হলো না।

প্রকাণ্ড এক গুহার পাশে ছোট আরেকটা গুহা। তাঁকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই জঙ্গি। ছাতে ইলেকট্রিক তার। প্রতি তিরিশ ফুট

পর পর জ্বলছে একটা করে বালব। বাইরের তুলনায় গুহার ভিতর অংশ কিছুটা শীতল। তবে চারপাশ এত বদ্ধ, আঁকড়ে আসতে চায় বুক। পুরনো বাড়িতে বাসি একটা গন্ধ থাকে, এখানেও ঠিক তেমন। কিছুদূর যাওয়ার পর থামতে হলো। সামনে পুরু দেয়াল আটকে দিয়েছে পথ। দেয়ালে বড়সড় দরজা, কাঠের। হাত বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিল একজন, দরজা খোলার চেষ্টা না করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। ভিতর থেকে আদেশ পেলে নড়বে, তার আগে নয়।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক এল।

দরজা খুলে প্রধানমন্ত্রীকে ভিতরে ঠেলে দিল প্রহরী। পিছনে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইল দুজন। বোধহয় গুহার শেষ অংশ এদিক। তিনদিকে রুক্ষ পাথুরে দেয়াল। মেঝের উপর পাঁচ ইঞ্চি পুরু পারশিয়ান কার্পেট। চতুর্থ কোণে জ্বলছে কয়লার আগুন। বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে স্টিলের চিমনি, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ধোঁয়া।

ঘরের মাঝে নামাজের ভঙ্গিতে বসে আছে এক লোক। পরনে ধবধবে সাদা আলখেল্লা। মাথার উপর কালো-সাদা কাফিয়ে। বাতির মৃদু আলোয় কিছু পড়ছে। ওটা কোরান শরীফ। মুখ তুলে চাইল না। যেন জানেই না কেউ এসেছে।

দেখবার মত দৃশ্য। ঋষিদের মত খাড়া হয়ে বসে কিতাব পড়ছে সে। আধ মিনিট পেরুল, মুখ তুলল না। বিরক্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকটা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

আরও দু' মিনিট পেরুনোর পর কোরান বন্ধ করল সে, যত্ন করে সরিয়ে রাখল। শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি কি জানেন আমি কে?'

'আলী বাবার চল্লিশ চোরের একজন,' বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'সঠিক বলেননি আপনি।'

'তা হলে আপনি কে?'

মনে মনে বললেন প্রধানমন্ত্রীঃ তুমি নৃশংস খুনি দানব, আর কেউ নও। লোকটা কিছুই বলছে না। তিনি আবার বললেন, 'কেউ জানে না তুমি কে। বোধহয় নিজের নাম নিজেই দিয়েছ ইউনুস আল-কবির। ঘোষণা দিয়েছ ইজরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বকে ধ্বংস করবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরোক্কো পর্যন্ত এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র গড়বে। ...আর সন্দেহ নেই, ওই দেশের সুলতান হতে চাও তুমি।'

'আমি এখনও ঠিক করিনি কোন খেতাব নেব,' বলল নব্য আল-কবির। 'সুলতান হওয়া ঠিক আছে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয় খেতাব। তা ছাড়া, আমি কাউকে নকল করা ভালবাসি না। হারেম, প্রাসাদ ইত্যাদি আমার জন্য নয়।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, যেন নড়ছে সাদা বাদুড়। পাশে রাখা টেবিল থেকে পিতলের কেতলি তুলল, গ্লাসে ঢেলে নিল চা। চিতার মত মসৃণ হাঁটা-চলা।

লোকটা অন্তত ছ' ফুট, আন্দাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। চওড়া কাঁধ। কব্জি বলছে শক্তপোক্ত দেহ। মৃদু আলোয় দেখা গেল না কাফিয়ে ঢাকা চেহারা। বোরখার নেট সরালে একটু ভাল দেখা যেত।

'না, বিলাসিতা আমার জন্য নয়। আমি এসেছি মানুষকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য। আর আপনাদের মত একদল ভ্রষ্ট মানুষ আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আপনি তাদের অন্যতম। আপনি কি মনে করেন আপনাকে মাফ করবেন আল্লাহ?'

'কাকে তিনি মাফ করবেন, আর করবেন না, তা তাঁর ইচ্ছে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'তবে যারা শান্তি চায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াশীল হন। যারা বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে,

তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল ঘৃণা।'

'ভাল বলেছেন। কিন্তু কেন? কেন শান্তি চাইছেন? কেন চাইছেন সম্মেলন?'

'তা জেনে কী করবেন?' চুপ থাকতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু টের পেলেন তর্কের ভিতর জড়িয়ে পড়েছেন। বুঝছেন এই কালের ইউনুস আল-কবিরও শিক্ষিত লোক। তাঁর জানতে ইচ্ছে হলো গণহত্যাকে কীভাবে জায়েজ করবে এ লোক। যত বর্বর জঙ্গি আজ পর্যন্ত নিরীহ মানুষ হত্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ছিল নানা ধরনের যুক্তি। আসলে ভেবে নেয়া সোজা: আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানব হত্যা করলে কিছুই হবে না, বরং পাবে বেহেস্ত।

'আপনি ইসলামের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন,' বলল আল-কবীর। 'হাতে রেখেছেন পশ্চিমা বিশ্বকে। ...ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন? বড় গলা করে বলছেন পৃথিবীতে শান্তি আসুক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, শুনে রাখুন, শান্তি আসবার অর্থ উন্নতি থেমে যাওয়া। মানুষ যখন শান্তিতে থাকে, তার মন থেকে উধাও হয় সৃষ্টিশীলতা। আল্লাহ বিবাদ সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন মানুষকে। প্রাণপণ যুদ্ধে প্রকাশ পায় কার বুকে কত সাহস, আমরা আত্মবিসর্জন করি। শান্তি আমাদের কী দেবে? কিছুই না।'

'তুমি ভুল বললে। শান্তি এনে দেয় সুখ, সমৃদ্ধি।'

'এগুলো তো শারীরিক আনন্দ। আত্মা কী পাবে? আপনাদের মত মানুষ ভাল কোনও টেলিভিশন সেট বা সুন্দর গাড়ি পেলে মনে করেন সুখী হয়েছেন। কিন্তু সুখ এত সহজ বিষয় নয়।'

'তোমাদের তৈরি যুদ্ধ আনে কষ্ট ও অসহায়তা,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মনে পড়ল আফগানিস্তানের পরিণতি। আর ঠিক এর মত একদল লোক বাংলাদেশে বোমা ফাটিয়ে, মানুষ হত্যা করে দখল করতে চায় ক্ষমতা।

'ঠিকই বলেছেন, যুদ্ধ কষ্ট ও অসহায়তা এনে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ করলে আত্মা পবিত্র হয়, দেহের নোংরামি থেকে দূরে থাকা যায়। আমরা চাই স্বর্গীয় অনুভূতির পরশ। আমরা বড় কোনও বাড়ি চাই না, একসঙ্গে লড়াই করে পাশাপাশি টিকতে চাই। এই কষ্ট আমাদেরকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর খুব কাছে। বলুন, আপনাদের গণতন্ত্র কী দেবে? আমরা খুঁজি মানবের সত্যিকারের অস্তিত্ব। পৃথিবীতে এসে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর কাছে আত্মবিসর্জন দেয়া।'

'আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন এসব খুন-খারাবি করতে হবে?' তিক্ত হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। 'তোমরা কী করে ধরে নিলে তিনি কী চান? কোরানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন আত্মহত্যা না করে। অথচ তোমার মত ক্ষমতালোভী একদল মানুষ বিপথে নিয়ে গেছ তরুণ-তরুণীদের। যেমন তুমি, ওই বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে ক্র্যাশ করিয়েছ বিমান।'

'সে শহীদ হয়েছে।'

'আল্লাহ তাকে শহীদ হতে বলেননি,' তীক্ষ্ণ শোনাল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ। 'কিন্তু তুমি তাকে বুঝিয়েছ মরলেই সে শহীদ হবে। আর তা হলেই মিলবে বেহেস্ত। খুশিতে থাকবে অসংখ্য হুর পরীকে নিয়ে। আল্লাহ ছাড়া কে বলতে পারে একজন মানুষ বেহেস্তে যাবে, না দোজখে? আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। আমার মত বহু মানুষ বিশ্বাস রাখেন তাঁর উপর। কিন্তু অন্তর থেকে বলতে পারি, তুমি নিজে তাঁকে বিশ্বাস করো না। আমার ধারণা, তুমি সস্তা এক প্রতারক। খারাপ বুদ্ধি দিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাও। তোমার মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা অর্জন করা।'

দু'বার হাত তালি দিল আল-কবির, হাসছে। প্রথমবারের মত ইংরেজিতে বলল, 'ভাল, ভাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী।'

চুপ রইলেন প্রধানমন্ত্রী।

'একটা বিষয় ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ার মস্ত মঞ্চে ক্ষমতা অর্জনই সবসময় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দুই শ' বছর আগে শক্তিশালী নেভি দিয়ে দুনিয়া দখল করে নেয় ইংল্যাণ্ড। আর এখন বিত্ত ও নিউক্লিয়ার আর্সেনালের কারণে দুনিয়া শাসন ও শোষণ করছে আমেরিকা। আর ওই দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছে আপনাদের মত পাতি নেতা-নেত্রীরা। সে-লোক যা বলছে, মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের কিছু মানুষ তা মানতে রাজি নয়। তারা পা চাটার বদলে বোমা দিয়ে নিজেদেরকে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, খুব নৃশংস অস্ত্র। কিন্তু তাতে কী? নিশ্চিত থাকুন আমরা আবারও ইসলাম কায়েম করব। তখন মাথার উপর আর ছড়ি ঘোরাবে না খ্রিস্টানরা।

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার আগে শহীদ হওয়ার জন্য তৈরি ছিল পাঁচ লাখ মুসলিম ভাই-বোন। এখন সংখ্যাটা হয়েছে তার দ্বিগুণ। শুধু আপনাদের দেশে দশ হাজার ছেলে-মেয়ে তৈরি আছে শহীদ হওয়ার জন্য—আপনারা তাদের বলেন সন্ত্রাসী। তারা যখন একের পর এক বোমা ফাটাবে, আপনাদের ক্ষমতা বাতাসে মিলিয়ে যাবে। আমরা জানি এই জিহাদীরা সামান্য ঘুঁটি ছাড়া কিছুই নয়। ওদের বোর্ডে বসিয়ে খেলছি আমরা। ওরা মারা গেলে আরও আসবে। লোকবলের অভাব নেই আমাদের। বিশেষ করে আপনাদের দেশে। দু'মুঠো খাবারের জন্য, চাকরি পাওয়ার জন্য, ওরা সব করতে পারে। আমরা যখন সত্যিই ওদেরকে যুদ্ধে নামাব, এশিয়ার কোনও সরকার টিকবে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারবে না কেউ। তখন আমি নতুন করে পৃথিবীর সীমানা নির্ধারণ করব।'

লোকটাকে উন্মাদ মনে হলো না প্রধানমন্ত্রীর। এ যেন শক্তিশালী কোনও করপোরেট প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে বলছে অদূর ভবিষ্যতে কী করবে।

'কারও সাধ্য নেই আমাদেরকে ঠেকায়। ভবিষ্যতে শান্তির নামে পশ্চিমাদের পা চাটা চলবে না।' থুতনির নীচ থেকে কাফিয়ে সরিয়ে দিল ইউনুস আল-কবির। চমকে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। 'আর ওই সম্মেলনের শুরুতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন আপনি!'

পনেরো

পাহাড় পেরিয়ে চলে গেল কপ্টার। আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে এল নিশাত, নবী ও স্বর্ণা, রওনা হয়ে গেল সরু ফাটলের দিকে।

বিশ মিনিট লাগল পাথুরে ফাটলে পৌঁছতে। ট্রাকের স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসল নিশাত, চালু করল ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে বের করে আনল ট্রাক।

ট্রাকের ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড কমিউনিকেশন সিস্টেমে বলে উঠল নবী, 'সোহেল কাবাব-ঘর?'

অফরোড ট্রাকের ভিতর স্পিকারের মৃদু আওয়াজ। এ গাড়ি এতই যত্নে বানানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ ভিতরে ঢুকছে না বললেই চলে। সুন্দরীর ভোঁতা নাক তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে তাক করল নিশাত।

চেনা যায় না এমন এক কণ্ঠ জবাব দিল, 'সোহেল কাবাব-ঘর। কিছু পিকআপ করতে হবে, না ডেলিভারি দিতে হবে?'

'ডেলিভারি না পিকআপ জানি না, আমি চার প্লেট খাসির

কাবাব চাই,' বলল নবী।

'দুঃখিত, আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন।'

লাইন কেটে দিল নবী। আবারও ডায়াল করল, তবে ফোন এখন সিকিউর লাইনে।

সোহেলের কণ্ঠ ভেসে এলঃ 'হ্যালো, নবী।'

'সোহেল ভাই, আমার সঙ্গে নিশাত আপা আর স্বর্ণা।'

'রানা কোথায়?'

সংক্ষেপে বলল নবী। তারপর জানাল, 'মাসুদ ভাই চান তাঁর বায়ো ট্র্যাকিং চিপস ফলো করা হোক। আপনি অপারেশন্স সেণ্টারে, সোহেল ভাই?'

'হ্যাঁ। এক মিনিট।' নীরবতা নেমে এল।

এ সুযোগে সুন্দরীর কমপিউটারে জ্যাক লাগাল নবী। এবার মার্ভেলের ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সিস্টেম থেকে ইমেজ এল। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে অপারেশন্স সেণ্টার। কমিউনিকেশন স্টেশনে ডিউটি অফিসারের কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়েছে সোহেল। নিচু স্বরে বলল, 'ইণ্টারেস্টিং। তোমরা তিনজন চলেছ পশ্চিমে। এদিকে রানা চলেছে উত্তর-পুবে। গতিবেগ এক শ' মাইল। ব্যাপার কী, তোমাদের ভিতর ঝগড়া হয়েছে?'

'একরকম তাই,' জবাব দিল নিশাত। 'কারও কথা শুনলেন না মাসুদ ভাই, কপ্টারে উঠে চলে গেলেন।'

এবার বলল নবী, 'যারা প্রধানমন্ত্রীর বিমান ভূ-পাতিত করেছে, তাদের সঙ্গে চলেছেন। তাঁর ধারণা, প্রধানমন্ত্রী মারা যাননি। এদিকে আমরা চলেছি তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে।'

'তোমাদের ধারণা ওই বিমান ভূ-পাতিত করা হয়?'

'জী। বিমান যখন ধ্বংস করে দেয়া হয়, ভিতরে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না।'

'তা কী করে সম্ভব? সংক্ষেপে খুলে বলো। বিশ মিনিট আগে

লিবিয়ানরা ঘোষণা দিয়েছেঃ ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। লিবিয়ান সরকার জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার চাইলে নিজেদের এভিয়েশন এক্সপার্টদের পাঠাতে পারে তদন্ত করতে। এ দল আছে এখন কায়রো এয়ারপোর্টে। বিকেলের আগে পৌঁছবে। কিন্তু তার আগেই ওই এলাকায় পৌঁছবে লিবিয়ান অফিসাররা।'

'কিন্তু ওখানে কিছুই পাবে না,' বলল নবী। 'একদল লোক কপ্টারে করে এসে ধ্বংসাবশেষ বিকৃত করেছে। ভাঙা টুকরোগুলো এদিক ওদিক সরিয়েছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে। কপ্টারে করে সরিয়ে নিয়েছে অনেক কিছু। কীভাবে বিমান ক্র্যাশ করে তা আর জানার উপায় নেই। এদের সঙ্গে ছিল খোঁড়া এক উট, ওটা দিয়ে চারপাশে ছাপ ফেলেছে।'

'খোঁড়া উট?'

'যাতে মনে হয় ওখানে গিয়ে মূল্যবান সবকিছু সরিয়ে নিয়েছে যাযাবররা।'

'তা হলে আমাদের কয়েক পা আগে হাঁটছে কেউ,' বলল সোহেল।

'মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে যে বাংলাদেশি এভিয়েশন টিম আসছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'না। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন, এ-তথ্য জানে শুধু উপর পর্যায়ের লিবিয়ান অফিসাররা। কিছুই ফাঁস করা হয়নি।'

'তার মানে শত্রুপক্ষ নিজের লোক রেখেছে সরকারের ভিতর,' বলল স্বর্ণা। 'এজন্যেই ওরা আবার ফিরে এসে ধ্বংসাবশেষ ঘাঁটাঘাটি করেছে।'

'এ-ও হতে পারে লিবিয়ান সরকারই এসব করছে,' বলল সোহেল। 'তোমাদের কি ধারণা বিমানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না?'

'আমরা যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে মনে হয় ওই বিমানকে

আগেই মরুভূমিতে নামানো হয়। এরপর আবার ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় পাহাড়ের উপর।'

'তার আগেই প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়?'

'তাই তো মনে হয়। যারা একাজ করেছে, তারা চাইছে মানুষ মনে করুক তিনি মারা গেছেন।'

'সবাই তাই ধারণা করলে কী ফায়দা পাবে ওরা?' জানতে চাইল সোহেল।

'জানি না, সোহেল ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'তবে তিনি শান্তি মহাসম্মেলনের বিষয়ে খুব তৎপর ছিলেন। বারবার বলেছেন এই মহাসম্মেলন শতাব্দির সেরা সুযোগ। তিনি প্রধান বক্তাদের ভিতর অন্যতম ছিলেন। হয়তো তাঁকে সরিয়ে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে টেরোরিস্টরা। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলে অনেকেরই উৎসাহ দমে যাবে।'

নীরবতা নেমে এল। স্বর্ণার বক্তব্য নিয়ে ভাবছে ওরা। টেরোরিস্টরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে হাতে পেলে বিশ্ব নেতাদের উপর একহাত নিতে পারবে। এদিকে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে জঙ্গিবাদ। আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মত শুরু হবে বোমা হামলা। কে ঠেকাবে তখন জঙ্গি সন্ত্রাসীদের?

'প্রধানমন্ত্রী বেঁচে থাকলে তাঁকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে,' নীরবতা ভাঙল সোহেল।

'আমাদের দেবার মত নতুন কোনও তথ্য আছে, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'হ্যাঁ, আছে। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন তিউনিশিয়ায় বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম কাজ করছে। জায়গাটা লিবিয়ান বর্ডারের পাশে। এদের সঙ্গে রয়েছে বিসিআই-এর এজেন্ট সবুর রহমান। ওই মিশনকে মিডিয়াম প্রায়োরিটি দেয়া হয়। ধারণা করা হয় তারা সফল না-ও হতে পারে।'

‘ওরা ওখানে কী করছে?’ জানতে চাইল স্বর্ণা।

বুঝিয়ে বলল সোহেল।

কয়েক মাস আগে আহমেদ শরীফ নামের এক বাংলাদেশি গুরুত্বপুর্ণ কিছু চিঠি হাতে পান। তার ভিতর ছিল ঐতিহাসিক জলদস্যু ইউনুস আল-কবিরের বিষয়। বিখ্যাত এই দস্যু এক নদীর তীরে অবস্থিত গোপন গুহায় বসে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। পরে শুকিয়ে যায় নদীটা, হারিয়ে যায় সেই গুহা। বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম চাইছে ওই প্রবন্ধগুলো উদ্ধার করতে। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন ওগুলো মহাসম্মেলনে পাঠ করবেন। এসব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় কীভাবে পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। মূল কথা: একে অপরের উপর হামলা না করে, সবাই মিলে শান্তিতে বাস করা সম্ভব।

‘এসব প্রবন্ধ পেলে ভাল, কিন্তু আগে তো পেতে হবে ওই গুহা,’ বলল স্বর্ণা। ‘এসবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে প্লেন ক্র্যাশের?’

‘কো-ইনসিডেন্টাল হতে পারে, একই এলাকায় দুটো ঘটনা ঘটেছে। জানি না দুটোর ভিতর কোনও সংযোগ আছে কি না। প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়ে ওই এক্সপিডিশনের অনুমোদন দেন। আর্কিওলজিস্টদের ফাণ্ড দেয়া হয় সরকার থেকে। আশা করা হয় ওই ধর্মীয় নেতার লেখাগুলো মিলবে। এ ধরনের লেখার মূল্য অনেক। কোটি কোটি লোক এসব মানবে। যেমন মেনে নিয়েছে আয়াতোল্লাহ খোমেনির ফতোয়া। তিনি ঘোষণা করেন আত্মঘাতী হামলা জায়েজ। কিন্তু কোরানে...’

‘পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয় আত্মহত্যা চলবে না,’ কথা শেষ করল স্বর্ণা।

‘যা হোক, চার আর্কিওলজিস্টকে পাঠানো হয় তিউনিশিয়ায়,’ বলল সোহেল। ‘কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে তাদের তিনজন।

স্থানীয় সরকার থেকে এক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে আর্কিওলজিস্টদের অনুমতি দেয়, বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর একবার করে ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে গেছে।'

'এ ঘটনা এবং প্রধানমন্ত্রী হারিয়ে যাওয়ার ভিতর কোনও সংযোগ থাকতে পারে?' সন্দেহ নিয়ে বলল নবী।

'থাকতে পারে, বিসিআই চিফ তাই ধারণা করছেন,' বলল সোহেল। 'তিনি চান তোমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখবে।'

'তদন্ত করব?' একটু থমকে গিয়ে বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু... মাসুদ ভাই গেছেন টেরোরিস্টদের সঙ্গে। তারা সন্ত্রাসী না লিবিয়ার স্পেশাল ফোর্স, আমরা জানি না। এরা যে প্লেন ক্র্যাশের সঙ্গে জড়িত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় যখন তখন আমাদেরকে লাগতে পারে মাসুদ ভাইয়ের। আর...'

'অথচ মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে হচ্ছে আর্কিওলজিস্টদের পিছনে?' বলল সোহেল। 'এখন তোমাদের কাজ...'

কী ভেবে যেন বাধা দিল নবী। 'এক সেকেণ্ড, সোহেল ভাই। ... রায়হান কোথায়, বলবেন?'

'নিজের কেবিনে। অফ ডিউটি।'

'ওই কেবিনে একটু লাইন দেবেন? খুব জরুরি।'

আধ মিনিট পেরুল, তারপর লাইনে এল রায়হান। 'কী বিষয়, কচি বালক?'

'রায়হান, আমরা যখন স্যাটালাইট ইমেজ দেখি, মনে পড়ে পরিত্যক্ত একটা ট্রাক দেখতে পাই মরুভূমিতে? ওটা আমাদের তৈরি ফ্লাইট পাথ থেকে বেশি দূরে ছিল না?'

'মনে আছে।'

'ওটার ক্লোজ-আপ ছবি আর জিপিএস কোঅর্ডিনেটস পাঠা।'

ওয়েবক্যামের সামনে থেকে সরে গেল রায়হান। কি-বোর্ডে টাইপ করছে। 'পাওয়া গেছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'ই-মেইল

করে দিলাম জিপিএস নম্বর। এবার পাঠাব ট্রাকের জুম করা ছবি। ট্র্যাকিং তথ্য দেখছি। তোরা ওখান থেকে মাত্র এক শ' চার মাইল দূরে। বড়জোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে।'

'অত সোজা নয়, আমরা কি কাক যে সোজা উড়ে যাব?' বলল নবী। 'এঁকেবেঁকে যেতে হবে। ছবিটা মেইন স্ক্রিনে তুলে সোহেল ভাইকে ফোন দে।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর এল সোহেলের কণ্ঠ। 'এটাই ওই ট্রাক?'

'জী।'

'বস্ জানিয়েছেন ট্রাকের সঙ্গে ড্রিল রিগ থাকবে। এটা দেখে তো সেরকমই লাগছে। এত তাড়াতাড়ি ছবি পেলে কোথা থেকে?'

'আগেই রায়হানের কমপিউটারে ছিল।' ব্যাখ্যা দিল না নবী। ওটা থাকল রায়হানের জন্য।

'তা হলে খানিক অন্যদিকে যেতে হবে তোমাদেরকে,' বলল সোহেল। 'ওই ট্রাক তল্লাসী করবে। আরেকটা কথা, ইণ্টারভিউ নেবে আর্কিওলজিস্টদের চতুর্থ সদস্যের। লোকটার নাম ব্রাম ট্যাগার্ট। সে আছে রোমান খনন এলাকায়। সে এরইমধ্যে এক প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে। তবে বিসিআই চিফ বলেছেন লোকটা কোনও কাজে গা নড়াতে চায় না। তবে মুখোমুখি কথা বললে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'

'কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের কী হবে?' আগের প্রসঙ্গে ফিরল স্বর্ণা। 'আমার মন বলছে তাঁকে পরিত্যাগ করছি আমরা।'

'রানার জন্য ভেবো না,' বলল সোহেল। 'ওর যা কপাল, ওই কপ্টার উড়িয়ে নিয়ে নামবে সাত-তারা হোটেলে। সঙ্গে সঙ্গে পাবে রাজকীয় ডিনার।' আর কিছু বলল না, তবে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে সোহেল।

আট ঘণ্টার বেশি মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে সুন্দরী। আরও খানিক

সামনে সেই ড্রিল ট্রাক। জমি এখানে উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে টিলা। কোথাও কোথাও শুকিয়ে যাওয়া ঝর্নার খাত। নবী ও স্বর্ণার ধারণা হয়েছে হাজার ঝাঁকি খেয়ে মোরব্বা হয়ে গেছে শরীর, থলথল করছে মাংস, চুরচুর হয়ে গেছে হাড়। এবার ত্বক ফেটে গেলেই হালুয়া হয়ে যাবে ওরা।

ওরা দু'জন বারকয়েক জায়গা বদল করেছে। এখন নিশাতের পাশে শটগান হাতে স্বর্ণা। গম্ভীর চেহারায় ট্রাক নিয়ে চলেছে নিশাত, যেন কখনও ক্লান্ত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে সূর্য। রায়হানের দেয়া জিপিএস কো-অর্ডিনেটস দেখে চলেছে তিনজনের দলটি। কোনও সমস্যা না করেই চলছে সুন্দরী। এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ফিউয়েল রয়েছে, অনায়াসে তিউনিশিয়া সীমান্ত পেরুতে পারবে। একবার ওখানে পৌঁছলে ডিজেল জোগাড় করতে হবে। নবীর ধারণা আর্কিওলজিকাল সাইটে টাকার বিনিময়ে সবই মিলবে। তা যদি না হয়, মার্ভেল থেকে ম্যাকডোনেল ডগলাস এমডি-৫২০এন কপ্টার নিয়ে রওনা হবেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, পৌঁছে দেবেন ব্ল্যাডার ভরা ডিজেল। ওই কপ্টার সহজে এক টন ওজন নিতে সক্ষম।

আবারও সামনে পড়েছে ধূ-ধূ মরুভূমি। বহুদূরে দেখা যায় টিলাসারি। হঠাৎ বামে কী যেন চোখে পড়ল। জিনিসটা সিকি মাইল দূরে। আবছা আলোয় ভাল দেখা গেল না। আরও কিছু দূর যাওয়ার পর আঙুল তুলে ওদিক দেখাল নিশাত। মাত্র এক মাইল গেলে পড়বে পরিত্যক্ত ট্রাক। তবে বাঁ দিকের জিনিসটার দিকে সুন্দরীকে নিয়ে চলল সে। ওটা না দেখে যাবে না। একটা নিচু টিবির পিছনে রাখল ট্রাক, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

'ক্যাপ্টেন নবী, আমার আরইসি৭টা দেবেন?' বলল নিশাত।

পাশেই স্বর্ণা, সিটের পাশের পকেট থেকে বের করল গ্লক ১৯ পিস্তল।

রিয়ার কমপার্টমেন্ট ডোর খুলল নবী, ওখান থেকে অস্ত্র নিয়ে বাড়িয়ে দিল নিশাতের দিকে। ওর নিজের হাতে গ্লক ১৯ পিস্তল।

ট্রাক থেকে নেমে এল ওরা। কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ। সামনের ওই জিনিসটা মরুভূমির মেঝে থেকে উঁচু হয়ে আছে। পঞ্চাশ গজ যেতেই শুনতে পেল বিশ্রী চিৎকার। কোনও মানুষ এ আওয়াজ ছাড়তে পারে না। তবে মিল আছে শিশুদের কান্নার সঙ্গে।

'ওটা কী?' চমকে গেল স্বর্ণা।

অন্য দু'জনের চেয়ে দু'ফুট সামনে হাঁটছে নিশাত। কাঁধে তুলে ফেলেছে রাইফেলের বাঁট। তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল জিনিসটা কী। মনে হলো ওটা উল্টো করে পোঁতা একটা ক্রস। ক্রসের দু'পাশে কালো দুটো আকৃতি নড়ছে।

তারপর বিস্তারিত হলো কালো দুটো ডানা। এবার বুঝতে পারল নিশাত, এক লোককে ক্রুসিফাই করা হয়েছে। পা দুটো আকাশের দিকে তাক করা, জমিনের দিকে মাথা। মানুষটার দুই হাতের পাশে বসেছে দুটো গলা ছেলা শকুন। বুকে ও ডানায় থকথকে রক্ত। লাশ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটা শকুনের ঠোঁট থেকে ঝুলছে এক খণ্ড মাংস। দ্রুত ক'বার মাথা নাড়ল, গলা দিয়ে নামিয়ে দিল সুস্বাদু খাবার।

আগেও আফ্রিকায় জাতিসংঘের কাজে এসেছে নিশাত। ওর জানা আছে, গুলি ছুঁড়লেও সরবে না এই বিশ্রী পাখিগুলো। এরা সরে না লাশ থেকে। দু'বার গুলি করল নিশাত। লাশের পাশ থেকে ধুপ করে পড়ল দুটো শকুন। হালকা হাওয়ায় অলস ভঙ্গিতে উড়ে গেল কয়েকটা পালক।

'হায় আল্লাহ্!' বিড়বিড় করল স্বর্ণা।

দ্রুত পায়ে ক্রসের সামনে পৌঁছল ওরা। শকুনগুলো ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে লাশটাকে। কয়েক দিন ধরে খুবলে খাচ্ছে।

এ লোক এশিয়ান ছিল। হতে পারে উপমহাদেশীয়। কপালে গুলি খেয়ে মারা যায়। ক্রসের পায়ের কাছে যে পরিমাণ রক্ত, এ থেকে বুঝবার উপায় নেই লোকটাকে গুলি করে ঝুলিয়ে দিয়েছে, না কি ঝুলিয়ে পরে গুলি করেছে।

ওরা নিশ্চিত হয়ে গেল, এ আর্কিওলজিকাল টিমেরই কেউ।

মানুষটাকে খুন করেছে টেরোরিস্টরা। হয়তো প্রয়োজন বোধ করেছে। কিন্তু তার দেহকে অমানবিক ভাবে বিকৃত করা সম্ভব শুধু পশুর পক্ষেই।

কোনও কথা বলল না ওরা। সুন্দরীর ক্যাবে ফিরল নবী, নিয়ে এল বেলচা।

পঁচিশ মিনিট লাগল নরম বালিতে লাশ কবর দিতে। ততক্ষণ ট্রাকের চাকার দাগ খুঁজতে এগিয়ে গেল স্বর্ণা ও নিশাত। চাকার চিহ্ন গেছে পশ্চিম দিকে। তবে ট্রাক একটা নয়, ছিল দুটো। শেষেরটা ড্রিল ট্রাকের চেয়ে অনেক হালকা। কিছুদূর যেতেই দুই ধরনের দাগের মাঝে পাওয়া গেল একটা গুলির খোসা। পাশের জমিতে লালচে রঙের দাগ। এক এক করে বালি কণা সরাচ্ছে পিঁপড়ার দল।

ফিরে এসে কী পেয়েছে নবীকে বলল ওরা। আলাপ ছাড়াই সবাই বুঝল, অজান্তে সীমান্ত পেরিয়েছে আর্কিওলজিকাল টিম। এখানে এসে ধরা পড়েছে লিবিয়ান প্যাট্রলের হাতে। যে কারণেই হোক, তাদের একজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। বন্দি হিসাবে অন্যদেরকে নিয়েছে। মৃত মানুষটার লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছে ক্রসে।

'হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর বিমান দেখে ফেলেছিল,' বলল নবী। 'বিমানটা বিপদে পড়েছে বুঝেই দেখতে আসে।'

'এদিকে আসার পর বন্দি হয় প্যাট্রলের হাতে,' মন্তব্যের সুরে বলল স্বর্ণা।

‘তবে ওরা সীমান্ত-রক্ষী ছিল না,’ বলল নিশাত। ‘চারপাশে নজর রাখতে দল পাঠায় টেরোরিস্টরা। যাতে পরিষ্কার থাকে ফ্লাইট পাথ। লোকগুলোকে নির্দেশ দেয়, কেউ বিমান দেখে ফেললে তাকে মেরে ফেলতে হবে।’

‘খুবই সম্ভব,’ বলল স্বর্ণা। ‘তবে এ-ও হতে পারে বাকি দু’জনকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।’

‘আর্কিওলজিকাল টিম যেখানে অ্যাম্বুশে পড়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় ওরা বেস ক্যাম্প থেকে অনেক দক্ষিণে সরে এসেছিল,’ বলল নবী। ‘ভুল জায়গায় হাজির হয়, ভুল সময়ে।’

‘এবার কী করতে বলেন, আপা?’ জানতে চাইল স্বর্ণা।

সবার ভিতর সিনিয়র নিশাত সুলতানা। তা ছাড়া, তাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাসুদ স্যর। এরপরও একবার ভাবল সোহেল আহমেদের সঙ্গে আলাপ করবে কি না। তবে ওই লাশের পচন দেখেননি তিনি। উনি বুঝবেন না ওই দৃশ্য কেমন লেগেছে ওদের তিনজনের। ট্যাকটিকাল বিষয়ে কখনও আবেগ থাকে না নিশাতের মনে। জানে, সত্যিকারের কোনও নেতা কখনও আবেগের বশে চলে না। কিন্তু সব জেনেও সঙ্গীদের মনের অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। ওই কসাইগুলোকে খুঁজে বের করবে। কপাল যদি ভাল থাকে, জীবিত পাবে দু’একজনকে। তাদের জানা থাকতে পারে কোথায় নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এ মুহূর্তে যে-কোনও তথ্য পাওয়াই গুরুত্বপূর্ণ।

‘আমরা ওদের পিছু নিতে পারি,’ বলল নিশাত। ‘আপনাদের কী মনে হয়?’

‘চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না,’ বলল স্বর্ণা।

‘শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়েছে ওরা,’ বলল নবী। ‘এখন তারা বন্দি।’

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল নিশাত। ‘ট্রাকে উঠুন, আমরা পিছু

নেব।'

সুন্দরীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। ভারী ধরনের যান ড্রিল ট্রাক, গভীর দাগ ফেলে গেছে। মরুভূমিতে সর্বক্ষণ বইছে হাওয়া, তার পরেও বালির বুক থেকে মুছতে পারেনি গভীর চিহ্ন। সূর্যটা বহু দূরের পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যেতেই এফএলআইআর সিস্টেম চালু করল নবী। জিনিসটা হেলিকপ্টারকে হামলা করবার জন্য। সামনের দিকে নজর রাখে ইনফ্রারেড সিস্টেম, কয়েক মাইল দূর থেকে পাওয়া যায় হিট সোর্স। সহজে ধরা পড়ে উত্তপ্ত ইঞ্জিন।

নাইট ভিশন গগলস পরে নিল নিশাত। ধরা পড়বে প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো। ওদের পিছনে মুখ তুলেছে আধ-খাওয়া চাঁদ। ওটা ভৌতিক আলো ফেলছে মরুভূমির উপর। তবে চারপাশ দেখা যায়।

মরুভূমির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে সুন্দরী। কেউ কথা বলছে না। তবে একই বিষয় নিয়ে ভাবছে—প্রতিশোধ নিতে হবে ওই মৃতের হয়ে। একের পর এক ঝাঁকি লাগছে। তবে সে নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই ওদের। শক অ্যাবযর্ভার যদি সামলাতে না পারে, কী আর করা, নীরবে সহ্য করবে ওরা।

'আমরা তিউনিশিয়া সীমান্ত থেকে কতটা দূরে?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল স্বর্ণা।

কমপিউটারে পজিশন দেখল নবী। 'আট মাইল।'

'মনে করি না লোকগুলো সীমান্ত পেরুবে,' বলল নিশাত।

ধূসর বালির উপর আধিভৌতিক আলো ফেলছে চাঁদ। মনে হয় ওটার সামনে উড়ছে বালির পর্দা। নিশাতের নাইট ভিশন গগলস পরিমিত আলো পেল না। কাজেই চালু করল অ্যাক্টিভ ইলিউমিনেটরগুলো। ওই আলো দেখবে না কেউ, তবে গগলস ওটা ধরবে।

আরও এক মাইল পেরুল সুন্দরী। নবী ভাল করেই জানে আপার গগলস সব দেখবে, নিজে এফএলআইআর থেকে চোখ সরাল না। এখন পর্যন্ত সামনের মরুভূমি ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্ক্যানে ধরা পড়ছে না কোনও থার্মাল ইমেজ।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট ব্লিপ। এতই খুদে, কোনও মানুষ হতে পারে না। ব্লিপ নিয়ে ভাবল না নবী, ওটা খুব ছোট কোনও প্রাণী।

কিন্তু ক' সেকেণ্ড পর আলোর বিস্ফোরণ হলো প্রতিটি ওয়েভলেন্থ-এ। কমপিউটার স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে উঠল ধবধবে সাদা কিছু! পরক্ষণে নবী বুঝল, একযস্টের দীর্ঘ লেজ নিয়ে ছুটে আসছে আরপিজি!

রকেট মোটরের উজ্জ্বল প্রভা অন্ধ করে দিল নিশাতকে। চমকে গিয়ে খুলতে গেল গগলস। টের পেল, নিখুঁত অ্যাম্বুশের ভিতর পড়েছে! প্রতিপক্ষ এক সেকেণ্ড আগে গ্রেনেড লঞ্চ করলে হাজার টুকরো হয়ে যেত ওরা।

ষোলো

মাঝারি ঢিবির উপর দিয়ে চলেছে সুন্দরী, কিন্তু কাভার না পেলে এ সুবিধা কোনও কাজে আসবে না। গতির কারণে ব্যাক গিয়ার ফেলতে পারল না নিশাত। একমাত্র উপায় রইল এগিয়ে চলা। তীরের মত এল আনগাইডেড রকেট। নিশাত মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল, দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে ঢাল

বেয়ে। ড্যাশ বোর্ডের বাটন টিপে নামিয়ে দিল সাসপেনশন। প্রসারিত হলো চাকাগুলো, ফেণ্ডারের আড়াল থেকে অনেকটা বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে।

বাম্পার নেমে গেল, .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান ব্যবহারের উপায় রইল না। অবশ্য দু' দিকে চাকা প্রসারিত হওয়ায় ভারসাম্য বেড়ে গেল ট্রাকের, ঝড়ের গতিতে নেমে যেতে লাগল ঢিবি থেকে। সহজে উল্টে পড়বে না। আরেকটা সুইচ টিপল নিশাত, পিছন বাম্পার থেকে নেমে গেল শেকলের পর্দা। ঝোড়ো গতিতে ছুটছে সুন্দরী, বালির ঘন মেঘ তৈরি করছে শেকলগুলো। তার ভিতর কিছুই দেখবে না গ্রেনেডিয়ারের নাইট ভিশন গগলস। কিন্তু সবই দেখবে এফএলআইআর।

ট্রাক তীরের মত ছুটছে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে বিস্ফোরিত হলো রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড। তৈরি হলো বালির ফোয়ারা। আঁধার চিরে ছুটে এল ট্রেসার বুলেট। একেকটা অতি দীর্ঘ আগুনের ছুরি। খটাখট লাগছে বডিতে।

'স্বর্ণা...' থেমে গেল নিশাত।

'কাজে নেমে পড়েছি, আপা।'

পিছনের কার্গো দরজা খুলে ফেলেছে স্বর্ণা, পা দুটো সামনে রেখে বেরুল। পাশের সুইচ টিপতে খুলতে লাগল উপরের হ্যাচ। কবাট সরে যেতেই উপরের দিকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় মেশিনগান, বসিয়ে নিল ক্যাবের ছাতের মাউন্টে। হ্যাচ কাভার দুটো দু'দিক থেকে কাভার দেবে। সরাসরি সামনে থেকে এল ট্রেসার। লোকটার অবস্থান বুঝে নিল স্বর্ণা, ওর দু'হাতের ভিতর গর্জন ছাড়ল .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। বিদ্যুদ্বেগে ব্রিচ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ব্রাসের খোসা। দূরে এক জায়গায় আগুনের ফুলকি বেশি, ওদিকে বাড়তি মনোযোগ দিল স্বর্ণা। জানে না আঁধারে কী ঘটছে, তবে ক' সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে গুলি আসা

বন্ধ হলো।

এঁকেবেঁকে ছুটছে নিশাত, বাধ্য হয়ে স্বর্ণার ঘোরাতে হচ্ছে মেশিনগান। সামনে পড়ল শত্রুদের আরেকটা লাইন। এদের সঙ্গে রয়েছে আরেক গ্রেনেডিয়ার। মেশিনগানের গুলি লাগল তার হাতের লঞ্চারে। বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, ঝলসানির ভিতর দেখা গেল ছিটকে আকাশে উঠল কয়েকটা দেহ।

অন্ধকারে রওনা হয়েছে আরেকটা আরপিজি। তবে এত দূর দিয়ে, দ্বিতীয়বার ভাবল না নিশাত। দীর্ঘ এক ঢিবির দিকে চলেছে। ওখানে কাভার নিয়েছে আততায়ী দল। ত্যাড়চা ভাবে ঢিবির উপর উঠছে সুন্দরী। চূড়ায় উঠেই ফোর হুইল চালু করল নিশাত, কাত হয়ে আবার নেমে চলেছে। এক পাশে রইল লোকগুলো। সহজে তাদেরকে ক্রসহেয়ারে পেল স্বর্ণা। তারা যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু করবার সময় পেল না, যেন কাস্তের সামনে পড়েছে গমের খেত। পিছনে ছিটকে পড়ল লাশগুলো।

'সামনে বিশাল থার্মাল ইমেজ,' কমপিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না নবী।

'রেঞ্জ?'

'পাঁচ শ' গজ। টপোগ্রাফির কারণে চোখে পড়ছে না। তবে বড় কিছু। ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে উঠছে।'

'মিসাইল?' জানতে চাইল নিশাত।

এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে ছুটছে সুন্দরী, কিন্তু একবারের জন্যও কি-বোর্ড টিপতে ভুল করছে না নবীর আঙুলগুলো। ট্রাকের দু' পাশ থেকে খুলল হাইড্রোলিকালি অপারেটেড প্যানেল, বেরিয়ে এল ভোঁতা মুখের চারটে এফজিএম-১৪৯ জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। কাঁধের উপর লঞ্চার রেখে ব্যবহার করতে হয়। জ্যাভেলিনের ওয়ারহেড সতেরো পাউণ্ডের। অনায়াসে ধ্বংস করে যে-কোনও আর্মার্ড

ভেহিকেল।

জ্যাভেলিন ইনফ্রারেড গাইডেড মিসাইল, একবার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে ওটাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। না দেখা উত্তাপের উপর কমপিউটারের টার্গেটিং রেটিকল লক করল নবী, প্রস্তুত রইল মিসাইল।

'মিসাইল!' স্বর্ণার জন্য এক সেকেণ্ড দেরি করল নবী, তারপর লঞ্চ করল রকেট।

টিউব থেকে বেরিয়ে গেল মিসাইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত একযস্ট পিছনে ফেলে মরুভূমি পেরুতে লাগল। একদল লোক একপাশ থেকে গুলি ছুঁড়ছে সুন্দরীর দিকে। বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল নিশাত, সুযোগ করে দিল স্বর্ণাকে। বিশ্রী আওয়াজে আবার চালু হলো মেশিনগান। কারও কোনও আর্তচিৎকার নেই, তবে ক' সেকেণ্ড পর থেমে গেল গুলি।

চারপাশের গোলাগুলি যেন কিছুই নয়, সগর্জনে উড়ে চলেছে জ্যাভেলিন, জানে, কোনটা তার টার্গেট। প্রতিপক্ষের কয়েকজন গুলি করে থামাতে চাইল একগুঁয়ে মিসাইলটাকে, কোনও ফলাফল পেল না। টার্গেটের পঞ্চাশ ফুটের ভিতর পৌঁছে গেল জ্যাভেলিন, তারপর হঠাৎ হারিয়ে বসল সিগনাল। পরক্ষণে আরেকটা সিগনাল পেল, তবে ওটা অনেক কম উষ্ণ। জিনিসটাও কাছে। তবে ওদিকে মনোযোগ দিল না জ্যাভেলিন, ছুটতে লাগল নির্ধারিত কোর্সেই।

মিসাইলের ইলেকট্রনিক মগজ জানে না, সঠিক টার্গেট ও তার মাঝে হাজির হয়েছে একটি ফিউয়েল ট্রাক। ওটার চলন্ত ইঞ্জিনকে কম উষ্ণ ইমেজ ভাবছে জ্যাভেলিন। তবে গতিপথ পরিবর্তন হলো না, ক্যাবের পিছনে ট্যাঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল মিসাইল। প্রচণ্ড তাপ ও আগুনে বিস্ফোরিত হলো ফিউয়েল, মুহূর্তে মরল ড্রাইভার। কমলা আগুনের প্রকাণ্ড গোলক উঠে গেল আকাশে।

খানিক দূরে ছিল ন'টা তাঁবু, বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হলো সব। ফিতার মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাই রোপ। ভেঙে পড়ল খুঁটিগুলো। এ কম্পাউণ্ডকে স্যাটালাইটের হাত থেকে রক্ষা করতে কার্গো নেটিং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তার উপর ছিল খেজুর পাতার আচ্ছাদন—আগুনে ছাই হয়ে গেল এক পলকে। টুকরো টুকরো হলো ট্রাক, চারপাশে ছড়িয়ে গেল শ্র্যাপনেল। আশপাশে যত গ্রাউণ্ড ক্রু ছিল, কিমা হয়ে গেল। তবে তারা যে মেশিন সার্ভিসিং করছিল, ওটার কিছুই হলো না।

বিধ্বস্ত ট্রাকের বিশাল আগুনে একই সঙ্গে দুটো বিষয় দেখল নিশাত-নবী-স্বর্ণা। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলে কাত হয়ে পড়েছে আর্কিওলজিস্টদের ড্রিল ট্রাক, আগুন ধরে গেছে আণ্ডার ক্যারিজে। আর, দ্বিতীয় জিনিসটা ভয়ঙ্কর। প্রহরীরা ওটাকে আড়াল দিয়েছিল। বালির বস্তা দিয়ে তৈরি বাঙ্কারের ভিতর বসে আছে রাশান এমআই-২৪ হেলিকপ্টার গানশিপ। ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটলফিল্ড কপ্টার, বলা হয় ফ্লাইং ট্যাঙ্ক। যে উষ্ণতা টের পেয়েছে নবীর এফএলআইআর, ওটা এসেছে ইসোতভ টারবাইন থেকে। দ্রুত ঘুরছে পাখা। শিকার ধরতে উড়াল দিতে চলেছে পাইলট!

'হায় আল্লাহ্!' বলে উঠল নবী। 'ওটা যদি ওড়ে, আমরা শেষ!'

ওটার মিলিটারি কোড নেম হিন্দ। নবী কথা শেষ করবার আগেই মাটি ছাড়ল গানশিপ, ঘুরল। ওটার এক পাশ এখনও বালির বস্তার আড়ালে। পরক্ষণে উপরে উঠল হিন্দ, নাকের নীচের গ্যাটলিং গানের চারটে ব্যারেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ।

তার দু' সেকেণ্ড আগে হ্যাচ দিয়ে নেমে পড়েছে স্বর্ণা। সুন্দরীর চারপাশের মরুভূমি বলকে উঠল .৫০ ক্যালিবারের গুলিতে। বুলেটপ্রুফ উইণ্ডশিল্ডে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য খুদে নক্ষত্র।

এভাবে গুলি চললে আগামী কয়েক সেকেণ্ডেই চুরচুর হয়ে খসে পড়বে কাঁচ।

গিয়ার ফেলল নিশাত, চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। লাফ দিয়ে রওনা হলো সুন্দরী, পিছনে তৈরি হলো বালি-ঝড়। বামদিকের জমি বিস্ফোরিত হলো, ট্রাকের পিছু নিয়েছে বুলেট সারি। পরক্ষণে হিন্দের খাটো ডানার নীচের পড থেকে লঞ্চ করা হলো আধ ডজন রকেট। সুন্দরীর ভিতর ওদের মনে হলো যেন মরুঝড়ের ভিতর পড়েছে। ওসব মিসাইল গাইডেড নয়, চারপাশের ঢিবির উপর নেমে এল। প্রতিটি বিস্ফোরণের মাঝে এঁকেবেঁকে সরতে চাইল নিশাত, আশা করল খানিক বাড়তি সময় পাবে। একটা রকেট লাগল পিছনের বাম্পারে, ঝাঁকি খেল ট্রাক। তবে কঠিন স্টিলের বড় কোনও ক্ষতি হলো না।

নবীর দিকে চাইল নিশাত। 'আপনি তৈরি?'

'হ্যাঁ!'

স্টিয়ারিং হুইল বামদিকে ঘুরিয়ে দিল নিশাত, পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ দিল ব্রেক প্যাডেলে। বালির উপর পুরো ঘুরে গেল সুন্দরী, কাত হয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। হিন্দের পিছন দিকে চলে এসেছে ট্রাকের নাক। দুটো জ্যাভেলিন ছুঁড়ল নবী। হাতে সময় কই যে লক্ষ্য-স্থির করবে, প্রার্থনা করল মিসাইলের হিট সিকার খুঁজে নেবে গানশিপকে।

বালি-ঝড়ের ভিতর টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে পাইলট, আপাতত ছুঁড়ল না গুলি বা রকেট। নীচে চেয়ে খুঁজছে ট্রাক। জানা কথা, বালি-কণা সরলেই হাতের মুঠোর ভিতর পাবে শত্রুকে। কিন্তু নীচের ওই মরুঝড়ের ভিতর থেকে ছিটকে উঠল দুটো মিসাইল। মরুভূমির বালি এখনও যথেষ্ট তপ্ত, দুই মিসাইলের একটার ক্রায়োনিক কুলিং সিস্টেম পরিমিত তাপমাত্রা নির্ধারণে ব্যর্থ হলো—দিক হারাল ক্ষেপনাস্ত্র, খানিক দূরের ঢিবির

উপর বিস্ফোরিত হলো।

ইনকামিং রকেটের দিকে নাক তাক করল হিন্দ। ওটার দেহ আড়াল দেবে টারবাইনের একযস্টকে, ফলে থার্মাল ইমেজ কম হবে। পাইলট এটা ভাল করেই জানে, কিছুই করল না সে। আশা করছে, চুপচাপ অপেক্ষা করলে এমনিতেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে জ্যাভেলিন। জানে না, টার্গেট লক-ইন করেছে মিসাইল। কমপিউটার মগজ দেখছে হেলিকপ্টারের থুতনির নীচে চারটে জ্বলজ্বলে টিউব। খুব উত্তপ্ত ওগুলো!

মিসাইলের ফিনগুলোকে সামান্য কারেকশান দিল হিট সিকার, হিন্দের গ্যাটলিং গানের তপ্ত ব্যারেলগুলোকে সরাসরি নিশানা করল। শেষ দু' সেকেণ্ডে সরে যেতে চাইল পাইলট, ফলে গ্যাটলিঙের ব্যারেল পেল না জ্যাভেলিন, বিস্ফোরিত হলো ঠিক ককপিটের নীচে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দু' টুকরো হয়ে গেল হিন্দ। সামনের অংশ গুঁড়ো হলো। এদিকে হাল ও টেইল বুম ছিটকে পিছনে সরল। মেইন রোটর দ্রুত ঘুরছে, সব ভারসাম্য হারিয়ে বসল কপ্টার—চরকির মত ঘুরতে লাগল। যেটা ককপিট ছিল সেই গর্তের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ঘন কালো ধোঁয়া। নব্বুই ডিগ্রি কাত হয়ে উপরের দিকে উঠল হিন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাটার ক্ষমতা হারাল পাখাগুলো। মরুভূমির উপর জগদ্দল পাথরের মত নেমে এল দশ টনি কপ্টার। বালির ভিতর গাঁথল অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। পরক্ষণে ছিঁড়েখুঁড়ে নানা দিকে ছুটল। শ্র্যাপনেলের গতি হলো প্রায় সুপারসনিক। একগাদা বালি ঢুকল ইসোতভ টারবাইনের ভিতর, সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হলো ওটা।

কপ্টারের সেলফ-সিলিং ফিউয়েল ট্যাঙ্ক তার কাজ সঠিক ভাবেই করল, বিস্ফোরিত হলো না। ফিউয়েলের অভাবে দ্রুত নিভে গেল ইঞ্জিনের একযস্ট।

বড় করে শ্বাস ফেলল নবী।

'ভাল দেখিয়েছেন, ক্যাপ্টেন নবী,' বলল নিশাত। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'স্বর্ণা? তোমার কী অবস্থা?'

'ভয় কাটিয়ে উঠছি।'

'ভয় পাওয়ার মেয়ে তুমি নও।'

ক্যাবের ভিতর মাথা ঢোকাল স্বর্ণা। 'নিজ চোখে দেখলাম আপনারা একটা হিন্দ ফেলে দিলেন। এটা কী করে সম্ভব হলো? তার চেয়ে বড় কথা, এ এলাকা কোথায়? এটা কোনও সীমান্ত ফাঁড়ি?'

'হতে পারে,' বলল নিশাত।

'আপা, হিন্দের কাছে চলুন,' বলল নবী। এফএলআইআর-এর মাধ্যমে ভূ-পাতিত কপ্টার দেখছে সে।

'কাজটা ঠিক হবে না,' বলল নিশাত। 'এবার লেজ তুলে ভেগে যাওয়া উচিত।'

'মনে করি না এটা সীমান্ত ফাঁড়ি,' বলল নবী। 'কাছ থেকে হিন্দ দেখলে বুঝব এরা কারা। তা ছাড়া, নিশ্চিত হতে হবে চারপাশে কমিউনিকেশন গিয়ার আছে কি না। জীবিত কেউ থাকলে নিজেদের লোক ডেকে আনবে। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ব।'

গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল নিশাত। সিকি মাইল দূরে পড়েছে গানশিপ। তিন মিনিটে পৌঁছে গেল সুন্দরী। তখনও থামেনি, তার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল নবী। নিজের অজান্তেই কুঁজো হয়ে গেছে। শিকারী যেমন হাজারো বছর আগে বিপজ্জনক শিকারের দিকে চাইত আর ভাবত, ওটা এখনও বেঁচে থাকতে পারে; সেভাবে চাইল হিন্দের দিকে। সাবধানী পায়ে পৌঁছে গেল ওটার পাশে। এদিকে হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেছে স্বর্ণা, মেশিনগান হাতে চেয়ে রইল ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষ ও ক্যাম্পের দিকে।

'কী খুঁজছেন?' জানতে চাইল।

'খুঁজছি না, দেখছি,' বলল নবী।

'সেটা কী তা-ই না হয় বলুন?'

'এয়ার ইনটেক সাধারণ নয়। ওগুলো আকারে বেশ বড়। তা ছাড়া, রোটর ব্লেডের স্টাব দেখবার মত।'

'তাতে?' ট্রাকের ক্যাব থেকে জানতে চাইল নিশাত।

ঘুরে চাইল নবী। 'আপা, এই কপ্টার মডিফাই করা হয়েছে অল্টিচ্যুড পেতে। বাজি ধরতে পারি, টারবাইনের লাইনগুলো চেক করলে দেখব স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। আর এটার...' গানশিপের ডানায় হার্ড-পয়েন্ট মাউন্টে চাপড় দিল। 'এখানে রাখত এএ-৭ অ্যাপেক্স মিসাইল।'

'তাতে কী?'

'অ্যাপেক্স হিন্দের টিপিকাল লোড-আউট নয়। এসব গানশিপ আসলে গ্রাউণ্ড-অ্যাটাক কপ্টার। কিন্তু অ্যাপেক্স ডিজাইন করা হয় এয়ার-টু-এয়ার কমব্যাটের জন্য। বিশেষ করে এমআইজি-২৩ ফ্লগারের কারণে।'

'আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওয়েপন্স ডিজাইনের উপর ট্রেইনিং নিয়েছি। আপনারা যেমন দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করতে পারেন, তেমনি করে বলতে পারি, এই গানশিপে অ্যাপেক্স ছিল।'

'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, হাই অল্টিচ্যুড গানশিপ...' যেন আনমনে বলছে নিশাত। কথাগুলোকে তুলা দণ্ডে তুলে ধরছে। 'খুব রহস্যজনক কিছু নয় যে শার্লক হোমসকে লাগবে। গানশিপের মিসাইল দিয়েই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমানকে নামানো হয়েছে।'

জানতে চাইল স্বর্ণা, 'এ এলাকা কি লিবিয়ান আর্মির, না ভোগ-দখল করছে টেরোরিস্টরা?'

'লাখ টাকার প্রশ্ন করেছেন,' বলল নবী। ফিরল সুন্দরীর

ক্যাবে। 'চলুন দেখি এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় কি না।'

মরু-ক্যাম্পের দিকে ফিরছে সুন্দরী। প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁবুগুলো, পুড়ে ছাই হয়েছে খেজুর পাতা। এক পাশে খোলা মরুভূমি, আরেক দিকে লণ্ডভণ্ড ক্যাম্প। হিন্দের এক মেকানিকের লাশের পাশে থামল সুন্দরী। নেমে গেল নবী, চিত করল লাশটা। দূরের আগুন থেকে আসছে লালচে আভা। লোকটা গুলি খেয়ে মরেনি। ফিউয়েল ট্রাকের ট্যাঙ্ক থেকে এক টুকরো লোহা গেঁথেছে বুকে। ইউনিফর্মে কোনও ইনসিগনিয়া নেই, আইডেণ্টিফিকেশনও নেই। এমন কী ডগ ট্যাগও অনুপস্থিত।

আরও কয়েকটা লাশ পরীক্ষা করল নবী, তবে সুন্দরীর আড়াল থেকে বেশি দূরে গেল না। কারও র‍্যাঙ্ক বা আইডি নেই। বিধ্বস্ত তাঁবুর ভিতর খুঁজল। একটা স্যাটালাইট ফোন পাওয়া গেল। ওটা পকেটে রেখে দিল। পাশের তাঁবুর ভিতর মিলল বড়সড় ট্র্যান্সিভার, তবে ভয়ানক বিস্ফোরণে বিকল। এসব তাঁবুর ভিতর এমন কিছু নেই যা দেখে বুঝবে এরা কারা, বা কাদের হয়ে কাজ করত।

'কী বুঝলেন?' নবী ক্যাবে উঠতেই জানতে চাইল নিশাত।

'আমরা জানি এয়ারবাসকে কীভাবে নামানো হয়েছে, কিন্তু বোঝা গেল না এই গোপন ঘাঁটি কাদের,' হতাশ স্বরে বলল নবী।

'এ নিয়ে ভাবছি না,' বলল নিশাত। রওনা হয়ে গেল তিউনিশিয়া সীমান্ত লক্ষ্য করে। 'এসব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করছেন মাসুদ স্যর। কপ্টার নামলে পাঁচ মিনিটের ভিতর জেনে যাবেন ওরা কারা।'

সতেরো

হেলিকপ্টারের শামুক দরজা খুলে যেতেই ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। বাইরে অত্যুজ্জ্বল রোদ। খর দাবদাহের ভিতর বইছে লূ-হাওয়া। মনে মনে বলল, *পৌঁছে গেলাম। এবার চারপাশ দেখে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।*

লিবিয়ান এয়ার বেসে হারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। ক্যাম্পে বোধহয় থাকবে হাজারখানেক লোক। মিলিটারি পারসোনেল যে যার ডিউটি করবে। নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে যাবে, আবার ফিরবে নিজ ব্যারাকে। বারো-চোদ্দটা দালান চোখে পড়ছে। সেগুলোর ভিতর লুকাতে পারবে। এত লোকের ভিতর উধাও হওয়া সোজা।

কিন্তু এমআই-৮ কোনও এয়ার ফোর্স ফ্যাসিলিটিতে নামেনি। এ জায়গা উঁচু মালভূমি। বহু নীচে একের পর এক সবুজ উপত্যকা। দেখতে অপূর্ব লাগছে। দুরমুজ করা শক্ত মাটিতে নেমেছে কপ্টার, নীচে ট্রেইনিং ক্যাম্প। সবার সঙ্গে কপ্টার থেকে নামতে হবে, একটু দ্বিধা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা কয়েক তাঁবু। পাশেই প্যারেড ফিল্ড, অবস্ট্যাকল কোর্স ও শুটিং রেঞ্জ।

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না রানা। মন বলছে, এটা লিবিয়ার জমিতে কোনও টেরোরিস্ট ক্যাম্প। অনুদান নেই সরকার থেকে।

কমপাউণ্ডের একদিকে লোহার কলাম ও বিম দিয়ে তৈরি তিনতলা দালান বোধহয় বড়সড় অফিস ব্লক। সামনে গোলাকার ড্রাইভওয়ে। দূর দিয়ে ঘেরা উঁচু দেয়াল। দালানের পিছন জমিতে

গাছ নেই, বদলে কারুকাজ করা তারকাঁটার বেড়া, হঠাৎ দেখলে মনে হয় হেজব্রাশের ঝোপঝাড়।

থামছে কপ্টারের টারবাইন। দূর থেকে এল জেনারেটারের কর্কশ আওয়াজ। আযান শুরু করেছেন মুয়াজ্জিন। দালানগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই, হাতে জায়নামাজ। প্যারেড গ্রাউণ্ডে জড় হচ্ছে, মক্কা শহরের দিকে জায়নামাজ পেতে নেয়া হচ্ছে। আন্দাজ করল রানা, এখানে রয়েছে দু' শ'র মত লোক। কিন্তু এত কম মানুষের ভিতর অচেনা থাকা অসম্ভব। এখন হোক বা খানিক পর, সত্যিকারের সোবহানকে খুঁজবে কেউ। দল বেঁধে খুঁজতে বেরুবে সবাই।

যত দ্রুত সম্ভব এদের সম্পর্কে তথ্য দরকার। কিন্তু এখানে লুকাতে পারবে না। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, তারপর ফিরবে রিকনেসেন্স করতে।

'পা বাড়াও,' সামনে থেকে নির্দেশ এল।

সবার শেষে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। চোখ পড়ল নীচের উপত্যকার উপর। ওখানে কনস্ট্রাকশন বা মাইনিং চলছে। ভাল করে পেঁচিয়ে নিল কাফিয়ে, সরু মেটো পথ ধরে নামতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। শেষ জনের পিছু নিয়েছে। আশা করছে, কেউ চট্ করে সন্দেহ করবে না।

ভূ-পাতিত বিমানকে যারা স্যাবোটাজ করল, তারা একই ব্যারাকের কি না, জানা নেই। নিজেদের ভিতর খুব একটা কথা বলেনি। তবে আন্দাজ করা যায়, একই ব্যারাকের। একইসঙ্গে ট্রেইনিং নিয়েছে, শৃঙ্খলা শিখেছে। পরস্পরকে ভাল করেই চেনে, নিজ ব্যারাকে ফিরলে শুরু হবে আলাপ। তার মানে, সন্দেহ নেই, কিছুক্ষণের ভিতর ধরা পড়ছে ও। যেভাবে হোক, পালাতে হবে।

মনে মনে হিসাব কষছে রানা। গিরিখাদের পাশে মেটো পথ, বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে একপাশ। এ-পথে নামলে ড্রেনের মত সরু

নালা, ফস্কা বালি, নুড়ি-পাথর ও বড়সড় বোল্ডার এড়িয়ে নামতে হবে। পা পিছলালে পড়বে গিয়ে অনেক নীচে পাথুরে জমিনের উপর। টিলার মাঝে কার্নিশ আছে তবে সেখানে নামা খুব কঠিন। নামতে যদি পারেও, তারপর বাকি তিরিশ ফুট দেয়ালের মত খাড়া। নীচের পাথরে আছড়ে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

দলটি পিঁপড়ার মত নেমে চলেছে, সামনে তাদের নেতা। হঠাৎ থমকে গিয়ে নির্দেশ দিল সে। সবার কাফিয়ে জমা নেবে।

রানা ছাড়া সবাই জানে এটাই ক্যাম্পের নিয়ম। লোকগুলো আগেই মাথা থেকে কাফিয়ে খুলতে শুরু করেছে। একবার চট্ করে বামদিকে ক্যাম্পের দিকে চাইল রানা। ওদিকে কারও মাথায় কাফিয়ে নেই। ওর মনে পড়ল, এ জিনিস দেয়া হয় নিজেদের ভিতর আন্তরিকতা বাড়ানোর জন্য। আরেকটি কারণ, বাইরের কেউ চট্ করে চিনবে না। এখন ক্যাম্পের ভাইদের ভিতর তারা নিরাপদ। নিশ্চিন্তে নিজেদের মুখ দেখাবে!

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভাগ্যদেবী!

হাতের তালুর পাশ দিয়ে সামনের লোকটার পিঠে জোর ধাক্কা দিল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'অ্যাই, সাবধানে চলবে!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। 'এটা করলে কেন?'

'আমার পেটে গুঁতো দিলে কেন!' ধমকে উঠল রানা। 'এই অপমানের জবাব তোমাকে খুন করা।'

'পিছনে কী হচ্ছে?' ধমক দিল নেতা।

'এই শুয়োরের বাচ্চা আমাকে অপমান করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'তুমি কে বলছ?' জানতে চাইল নেতা। 'চেহারা দেখাও।'

'আগে এই শুয়োরের বাচ্চার মাফ চাইতে হবে।'

'কক্ষনো না। প্রথমে তুমি আমার পিঠে গুঁতো দিয়েছ।'

অলস ভঙ্গিতে আরবের মুখে হাত ঘুরিয়ে একটা বিরাশি সিক্কা বসানোর ভঙ্গি করল রানা। পুরো শক্তির দশ ভাগের এক ভাগ খরচ করেছে। লোকটা অনেক আগেই ঘুসিটা আসতে দেখেছে, উবু হয়ে এড়িয়ে গেল। জবাবে দুটো মাঝারি ঘুসি বসিয়ে দিল রানার পেটে। নিজের জন্য কৈফিয়ত দরকার ছিল রানার। হ্যাঁচকা টানে লোকটার কাফিয়ে খুলল, দুই হাতে তাকে ঘুরিয়ে দিল। এখন ওর নিজের পিঠ অন্যদের দিকে। কেউ দেখবে না মুখ।

'আমি তো তোমাকে চিনি না!' বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'এই লোক নকল! গোপনে আমাদের দলে ঢুকেছে!'

'তুমি পাগল না কি! আমি এখানে আট মাস ধরে আছি!'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল রানা।

ধাক্কা দিয়ে ওকে সরাতে চাইল আরব। বাধা দিল না রানা, তবে তাল সামলানোর ভান করে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল প্রতিপক্ষের একটা বাহু, পথ থেকে সরে গেল। টের পেয়েছে হড়কে গেছে দুই পা। জঙ্গিকে নিয়ে পড়ছে। মালভূমির প্রান্তে পৌঁছেই মাথার উপর দিয়ে লোকটাকে থ্রো করল। নিজেও দড়াবাজের মত ঘুরে গেছে। খাড়া নালার ভিতর পড়েছে আরব। তবে তার উপর আসীন হয়েছে রানা, চোখা পাথর এড়াতে শুয়ে পড়ল লোকটার বুকের উপর।

নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল দুজন, সঙ্গে চলেছে নুড়ি-পাথরের ঢল। ওই আওয়াজ ছাপিয়ে একটা মুটমুট শব্দ পেল রানা। হাড় ভাঙছে জঙ্গির। কানের কাছে বিকট চিৎকার জুড়েছে। নালা বেয়ে নেমে যাওয়ার গতি বাড়ল। ওরা যেন ববস্লেডে চড়েছে, তবে তফাৎ, স্লেড হয়েছে আরব টেরোরিস্ট। উপর থেকে ও দু'পাশ থেকে খসে পড়ছে অসংখ্য পাথর। দ্রুত গতিতে নামছে ওরা। উড়ছে প্রচুর ধুলো। উপর থেকে ওদেরকে দেখবে না কেউ। উঠে বসবার চেষ্টা করছে দু'জনই। তবে পড়বার গতি অস্বাভাবিক

বেশি। এ মুহূর্তে থামা অসম্ভব। লোকটার বুকে চেপে বসে একবার এপাশ একবার ওপাশ কাত হয়ে নালা বেয়ে বিদ্যুদ্বেগে নামছে রানা। দু'হাতে ভারসাম্য রাখতে চাইছে, যেন নালার মাঝখানে থাকতে পারে।

উপর থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পাথর, আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ রানা টের পেল, ওরা আছে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর। ওর চোখের সামনে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে নুড়ির নীচে চাপা পড়ছে আরব। পতনের গতি আরও বাড়ল। চোখের পলকে বামে বাঁক নিল নালা, তারপর আর বাড়তি পাথর বইতে পারল না। পাড় ছাপিয়ে উঠল পাথরের ঢেউ। যেন বন্যা শুরু হয়েছে নদীতে। নীচে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল রানার। ওদের নীচে শুধু শূন্যতা!

আর কোনও আওয়াজ করছে না আরব টেরোরিস্ট। লোকটার সঙ্গে শূন্যে ভেসে উঠল রানাও, তারপর শুরু হলো পতন। পিছু নিল পাথরের অ্যাভালাঞ্চ। নতুন এক নালার ভিতর ধপ করে পড়ল ওরা। এই নর্দমা আগের চেয়ে চওড়া ও গভীর, তবে একটু পর পরই বাঁক। অ্যাভালাঞ্চ আবারও ধরে ফেলল ওদেরকে। মানুষ যেভাবে নদীতে গাছের গুঁড়ির উপর বসে, সেভাবে আরবের উপর চেপে বসেছে রানা। নীচের কার্নিশ পেরিয়ে পাথর ঝরছে জলপ্রপাতের মত। মালভূমির উপর থেকে ওই কার্নিশ দেখেছে রানা। একবার সাহস করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার তেড়ে আসছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। বোল্ডারগুলো পড়বার সময় পরস্পরের ভিতর ঠোকাঠুকিও করছে।

আবার নীচে চাইল রানা। কিনারা পেরিয়ে ছিটকে পড়ছে বোল্ডার, তারপর সোজা নীচে পাথুরে জমি। এই প্রস্তর-প্রপাত যদি জলপ্রপাত হতো, ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপ দিত রানা। সম্ভাবনা ছিল প্রাণ নিয়ে সাঁতরে বেরুতে পারবে। কিন্তু এখানে বাঁচবার কোনও সুযোগ নেই।

নুড়িপাথরের চলমান স্রোতের ভিতর হাত গাঁথতে চাইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড পর টের পেল, নীচে কঠিন জমিন। আর কয়েক মুহূর্ত পর কিনারা থেকে খসে পড়তে হবে। খাদের পনেরো ফুট বাকি থাকতে শেষ চেষ্টা করল রানা। টেরোরিস্টের লাশের উপর উঠে দাঁড়াল, বেকায়দা লাফ দিয়ে নামল অ্যাভালাঞ্চের উপরের দিকে। চার হাত-পা দিয়ে পড়ল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে চাইছে। পায়ের নীচে সরসর করে সরছে পাথরের প্রবাহ। যতই চেষ্টা করুক, এক ইঞ্চি এগুতে পারল না রানা। অ্যাভালাঞ্চের গতি ঢের বেশি।

পাথরের সঙ্গে নীচে গিয়ে পড়লে?

বাঁচবার একমাত্র উপায় এখন নালার পাড়ে ওঠা। সেক্ষেত্রে সরতে পারবে পাথর-ধস্ থেকে।

পাথর ও বালির প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিক্ষত লাশকে।

কিনারা থেকে দশ ফুট বাকি থাকতে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর দুই হাত ভরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হলো আঙুলগুলো। প্রাণপণে পিছনে ছুঁড়ছে দুই পা। বেরুতে হবে পাথরের স্রোত থেকে। তবে দেহে এত শক্তি নেই যে জিতবে। হুড়মুড় করে নেমে আসছে পাথর, তার ওপাশে যেতে পারছে না শত চেষ্টা করেও।

হাল না ছেড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেল রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইল জমিন। তারপর নুড়ি পাথরগুলোর ভিতর দিয়ে জমির ছোঁয়া পেল। শক্ত কী যেন ঠেকল হাতে। ডান হাতে খপ করে ধরল ওটা, বাম হাতে সরতে চাইল অ্যাভালাঞ্চ থেকে।

হাতে ওটা কিশোর বট গাছ। নীচে পড়বার সময় ওটাকে দেখেনি রানা। আবারও পিছলে যাওয়ার আগেই দুই হাতে শক্ত করে ধরল। ডানে সরতে চাইছে। কিন্তু দু'ফুট যেতেই মটকে গেল কাণ্ড। বাধ্য হয়ে মোটা একটা শিকড় ধরল রানা। ওটা অনেক জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

রক ক্লাইম্বিঙের প্রথম শর্ত: কোনও গাছকে বিশ্বাস করবে না।

ওটা যে কোনও সময় উপড়ে আসবে।

তবে এ মুহূর্তে রানার সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

প্রাণপণে ধরল শিকড়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে জমি থেকে উঠে আসতে চাইল ওটা। এদিকে অ্যাভালাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর ঊর্ধ্বাঙ্গ, বাকি রইল দুই পা। ভরসা রাখতে পারছে না শিকড়ের উপর। মূল শিকড়ের চারপাশের শিরাগুলো চড় চড় করে উঠে আসছে, দীর্ঘ হচ্ছে শিকড়। বারবার ঝাঁকি খেয়ে নীচের দিকে নামছে রানা।

কার্নিশটাকে পেরিয়ে গেল দুই পা। তারপর কোমর। শক্ত করে ধরে রইল শিকড়। মাত্র এক ফুট পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ছে নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার। ক' সেকেণ্ডের জন্য পতন থামল। আঙুলের সমান মোটা শিকড়, বেয়ে উঠতে চাইল রানা, কিন্তু তাতে পড়পড় করে উপড়ে আসতে চাইল। একবার নীচের দিকে চাইল। পরক্ষণে কিনারা পেরিয়ে সড়াৎ করে নেমে এল। আগেই দেখেছে, এবার বালি-নুড়ি-বোল্ডার এদিকে পড়বে।

টিলার দেয়াল থেকে আধ ইঞ্চি দূরে ওর নাক। স্থির হওয়ার সময় নিল না রানা, এক সেকেণ্ড পর দোলা দিয়ে ডানদিকে সরতে চাইল। মাথা ও কাঁধে পড়ছে ছোট নুড়ি-পাথর ও বালি। তিন সেকেণ্ড পর পাশে নামল বড় পাথরের ধস। মাঝারি এক পাথর কাঁধে পড়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। শিকড় থেকে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে রানা। কোনও ফাটল বা ফুলে থাকা পাথর খুঁজছে। খাড়া টিলার গা থেকে বেরিয়েছে মুঠো সমান এক পাথর। বার তিনেক দুলে ওখানে পৌঁছল রানা, ডান হাতে খপ করে ধরল পাথর।

বেশি দুলতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে। উপরের ক্ষুরধার কিনারা লেগে ছিঁড়ছে শিকড়। বেলে-পাথরটা ঠিক ভাবেই ধরেছে, কিন্তু পট করে ছিঁড়ে গেল শিকড়। টিলার বুকে আছড়ে পড়ল রানা। বালি ও পাথরের সঙ্গে দ্রুত নেমে গেল শিকড়ের টুকরো।

ডান হাতে পাথর ধরে ঝুলছে মরিয়া রানা। অসহায় ভাবে নীচের দিকে চাইল। প্রথমে ভাবল টিলার দেয়াল কাঁচের মত মসৃণ, একদম দেয়ালের মত খাড়া—কিন্তু না, পায়ের দু' ইঞ্চি নীচেই সরু তাক। হয়তো ওখানে দাঁড়াতে পারবে।

এদিকে হাত থেকে ফস্কে যেতে চলেছে পাথরটা!

বারকয়েক শ্বাস নিল রানা, তারপর আস্তে করে নেমে গেল তাকে। জুতোর হিল দুটো বেরিয়ে রইল। এই দীর্ঘ পতনে প্যান্টের পকেট থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে স্যাটালাইট ফোন, এবার ওটা খসে পড়ল। রানা সবই টের পেল, তবে খপ করে ধরবার উপায় নেই। সব জঞ্জালের সঙ্গে পাথুরে জমিতে গিয়ে পড়ল জিনিসটা। বুঝতে দেরি হলো না ওর, ওটার আয়ু শেষ। দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উষ্ণ পাথরের স্পর্শ লাগছে কপালে।

পাশেই ধুলোর চাদর উড়ছে। পাথর ও বালি পড়ছে উপর থেকে। তবে ধস কমে এসেছে। বইছে জোরালো হাওয়া, কিছুক্ষণের ভিতর সরে যাবে ধুলো। জঙ্গিরা উপর থেকে দেখতে পাবে রানাকে। পাথরের দেয়াল নেমে গেছে তিরিশ ফুট নীচে, সেখানে এবড়োখেবড়ো জমিন। ওখান থেকে এক শ' ফুট নামলে উপত্যকার জমিন।

ডানদিকে চাইল রানা, প্রায় থেমে এসেছে অ্যাভালাঞ্চ। বড় বোল্ডারগুলো পড়েছে নীচের জমিতে। এখন টিলার উপর থেকে পড়ছে বালির সরু রেখা।

ক্লাইম্বিঙের দ্বিতীয় নিয়মঃ নেমে যাওয়ার পথ না জানলে খাড়া দেয়াল থেকে সরতে যেয়ো না।

রানার জানা নেই নীচে কী থাকতে পারে। হয়তো কোনও পাথর ধরতে পারবে, গর্তে রাখতে পারবে পা—কিন্তু উপর থেকে চেয়ে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র লোক! নিশ্চয়ই জানতে চাইছে কোথায় গেছে তাদের সঙ্গীরা!

খুব ধীরে ভারসাম্য রেখে বসতে শুরু করল রানা, দু'হাত রেখেছে টিলার বুকে। অর্ধেক বসা অবস্থায় তাক থেকে নামিয়ে দিল ডান পা। গর্ত খুঁজতে শুরু করেছে। পাথরের দেয়ালে সামান্য একটা খোঁড়ল পেল। ওখানে রাখা যাবে শুধু বুটের তিন ভাগের একভাগ। গর্তটা ওর ওজন নেবে? ঝুঁকি নিল রানা, জুতোর ডগা ভরে দিল খোঁড়লে, এবার ধীরে নামাল অন্য পা। দু' মিনিট পর ভাঁজ করা দুই কনুই রাখল তাকের উপর। ডান পা গর্তের ভিতর থাকল, কিন্তু বাম পা সরিয়ে নিল, অন্ধের মত খুঁজছে বেড়ে থাকা পাথর বা গর্ত। এক মিনিট পেরুল, পায়ে কিছুই ঠেকল না। টিলার বুক দেয়ালের মত খাড়া।

ঠিক তখনই ওর মুখের পাশে নামল কুণ্ডলি পাকানো দড়ি। উপরে চাইল রানা। কেউ উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে না ওকে। টিলা আড়াল দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, ওকে বাঁচানোর জন্য দড়ি ফেলেনি টেরোরিস্টরা। নীচে কী ঘটেছে জানার জন্য লোক নামবে এখন। সৌভাগ্যক্রমে এখান দিয়েই ফেলা হয়েছে দড়ি।

আবার হাঁচড়েপাঁচড়ে তাকের উপর উঠে এল রানা, দ্রুত হাতে শার্টের কয়েকটা বোতাম খুলল। খুব সাবধানে খুলে নিল বাম পায়ের বুট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরল ওটা। বুটের সঙ্গে বার তিনেক জড়িয়ে নিল দড়িটা। চলনসই পুলি হলো। উপর থেকে দড়িতে ঝাঁকি শুরু হয়েছে। নামছে কেউ। জুতোর দুই পাশ দু'হাতে শক্ত করে ধরল রানা, তারপর টিলার বুকে পা রেখে নামতে লাগল। প্রতি বারে পাঁচ ইঞ্চির বেশি নামতে পারছে না। তবে উপরের লোকটা সহজে বুঝবে না নীচে কেউ আছে। সবার অজান্তে নেমে যাবে রানা, কোথাও লুকিয়ে থাকবে, রাতের আঁধারে চলে যাবে খনি এলাকায়। দেখতে হবে ওখানেই প্রধানমন্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কি না।

তিন মিনিট পেরুনোর আগেই টিলার গোড়ায় নেমে এল রানা।

উপর থেকে ভেসে এল চিৎকার, 'কাইয়ুম, একটু অপেক্ষা করো, আমরাও আসছি!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝপাৎ করে রশি নামল আরও কয়েকটা।

দ্রুত হাতে বুট পরে নিল রানা, নামছে ঢাল বেয়ে। যে-কোনও সময়ে কার্নিশে পৌঁছে যাবে উপরের লোকগুলো। সামনে একটা ঢিবি পেয়ে তার পিছনে লুকিয়ে পড়ল রানা। হাঁপাচ্ছে। ঢিবির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। টের পেল, শরীর চলতে চাইছে না, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছে, শরীরের একটা হাড়ও ভাঙেনি, কিন্তু সারা শরীরের সবখানে টনটনে ব্যথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শরীরে ফুটে উঠবে বেগুনি ও নীল দাগ।

মাত্র দশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল রানা, তারপর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে সরে বড়সড় একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল আবার।

এদিকে চাতালে নেমে এসেছে লোকগুলো। গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। নেমে এসে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। পালাও, পালাও, রানা!

কাছেই পরিচিত জিনিসটা দেখতে পেল রানা। বালির নীচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে ওর কাফিয়ের একাংশ। কাপড়টা তুলে নিল ও, আবার পরে নিল মাথায়, ভাবছে, দৌড় শুরু করবে।

ওই যে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কার্নিশে পৌঁছে গেছে ওরা! নৈঃশব্দ্যের ভিতর জোরালো একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'গেল কোথায়? নীচে তো খালি পাথরের স্তূপ। মনে হয় চাপা পড়েই মরেছে।'

'দাঁড়াও,' মোটা গলা ভেসে এল উপর থেকে, 'চারপাশ ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।'

অন্তরের গভীরে টের পেল রানা: এবার আর রক্ষা নেই, ধরা পড়ে যাচ্ছে ও। ভাগ্যের সহায়তা বারবার পাওয়া যায় না!

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

সূর্য-সৈনিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্দিশিবির থেকে অসহায় একদল মানুষকে নিয়ে ফিরছে রানা। ওদেরকে ধাওয়া করছে জঙ্গিদের ট্রাক, হেলিকপ্টার। তেড়ে আসছে সশস্ত্র বাহিনী। একের পর এক বাধা ডিঙাতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল রানার। উদ্ধার করা তো দূরের কথা, এখনও জানে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় বন্দি করে রেখেছে ওরা। ওদিকে সোহেল খুঁজছে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে প্রাচীন সেই কাঠের জাহাজ। খুঁজছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সেই গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া যেটা পাঠ করে শোনানো হবে সম্মেলনে। বিপদের পর বিপদ। অথচ হাতে সময় নেই। রানার মনে হলো, আর বুঝি সম্ভব হলো না প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করা! প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি আজই ঘোষণা দেবেন শান্তি মহাসম্মেলনের! চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে এনেছে জঙ্গিরা! টিভিতে এখুনি দেখানো হবে: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মাথা কাটা পড়ার দৃশ্য! তা হলে কি পারল না রানা, হেরে গেল জঙ্গিদের কাছে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

সূর্য-সৈনিক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মুক্তিপণ আদায় করবে বলে মালবাহী এক ফ্রেইটার দখল করেই বোকা বনে গেল সোমালি জলদস্যুরা। জাহাজে ভূত আছে। হলভর্তি লোক গায়েব হয়ে যাচ্ছে চোখের পলকে। এই আছে, এই নেই।

ভৌতিক জাহাজ মার্ভেলকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল ওরা ওদের ঘাঁটিতে।

তারপর?...

একটা কাজ শেষ হতে না হতেই রানার কাঁধে চাপল আরেক মহা দায়িত্ব। এখুনি জাহাজ নিয়ে ছুটতে হবে ত্রিপোলির পথে। শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে লিবিয়ার মরুভূমিতে ক্র্যাশ করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্লেন।

ক্র্যাশ, না স্যাবোটাজ, না কি হাইজ্যাক?

প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন তো?

এটা লিবিয়ার অস্থির সময়ের কাহিনি। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির সময়।

চলুন, রানার সঙ্গে গিয়ে দেখি আসলে কী ব্যাপার।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET